জানুয়ারি ১৯৯৫

ISSN 0971-5800

উৎস মানুষ

ওর মৃত্যু কেন হলো

বাংলা না ইংলিশ

শিক্ষালয়ে স্বৈরতন্ত্র

হরধনু ভঙ্গের নাট্য

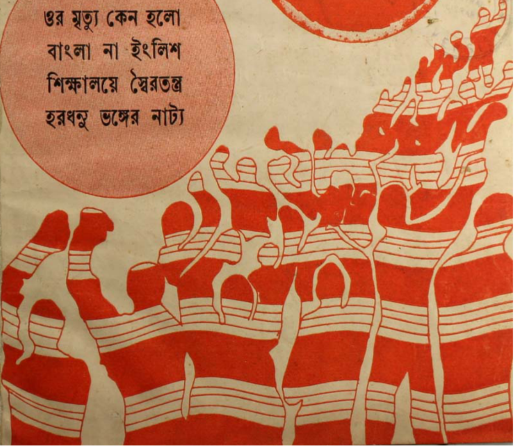

B
059.9144
UI7

আমাদের কথা

ষোড়শ বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ জানুয়ারি ১৯৯৫

সূচীপত্র

আমাদের কথা □ ১

[illegible]
স্বাস্থ্যের অনীতি □ ২

সাপের কথা : ছড়ার ছবিতে □ ৫

গান-ছেলে : আমরা আর ওরা □ ৭

নাটক
হযবরল কাহিনী □ ১০

একটি অভিজ্ঞতার আখ্যান
এক অসহায় মৃত্যুর কাহিনী □ ১৬

[illegible]
ওরা লড়াই করে □ ১৭

[illegible]
মানবীর অধিকার নিয়ে □ ১৯

আপনার প্রশ্ন/আপনার মতামত □ ২২

চিঠিপত্র □ ২৩

প্রশ্ন-উত্তর □ ২৫

রকমারি খবর □ ২৭

উৎস মানুষ
ISSN 0971-5800
বি ডি ৪২৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

দীর্ঘ পনের বছর ধরে একটানা অ-নিয়মিত আত্মপ্রকাশ। একটি অ-বাণিজ্যিক আদর্শনিষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে বিরল এক নিদর্শন নিঃসন্দেহে, এবং তাতে উৎস মানুষ-এর আত্মশ্লাঘার যথেষ্ট সুযোগও হয়তো থাকে – তবু আমরা কিন্তু আত্মসন্তুষ্ট নই এতে। কারণ এত বছর ধরে এই পত্রিকার 'সার্কুলেশন' না কমলেও বাড়ে নি বিশেষ, ফলে আরো বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছা ও লক্ষ্য আমাদের পূরণ হয় নি। এর কারণটা অবশ্য কেবলমাত্র পত্রিকার মূল্যমান বা আকর্ষণী চরিত্রের ভালো-মন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাম্প্রতিক কালে পারিপার্শ্বিক ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, নিস্পৃহতা ও পত্র-পত্রিকা বিক্রিতে ভাটার টান অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে উৎস মানুষ-এর প্রচারমাধ্যমেও। তবে এই সুদীর্ঘ দেড় দশক অতিক্রান্ত পথ হেঁটে যাওয়ার সুবাদে উৎস মানুষ এক সুনির্দিষ্ট স্বকীয়তা পেয়েছে, বিশ্বাস-চেতনায় একটা জায়গা করে নিতে পেরেছে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের অন্তরে – এটা আমরা টের পাই। এবং সীমাবদ্ধতার সন্তুষ্টি আমাদের এখানেই।

নতুন বছর এল। এইসঙ্গে উৎস মানুষ-এর আয়োজন-সূত্রের কথকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগও এসে গেল আবার কলকাতা বইমেলা আর 'আড্ডা'য়। বইমেলা শুরু হচ্ছে এ-মাসের শেষ থেকে। আর 'আড্ডা' নিয়ে আমরা বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছি, বিভিন্ন জনের নানা প্রতিক্রিয়া নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। উৎস মানুষ-এর 'আড্ডা' একটি পরীক্ষামূলক সম্মিলনী হিসেবে শুরু করা হয় আট বছর আগে। এর অভিনব পাঠক-সমাবেশকে সাড়া দিয়েছিল : প্রতি বছর 'আড্ডা'র কথকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এক অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল। আমরা চেয়েছিলাম 'আড্ডা'-নামক নব-আঙ্গিকের এই সূত্রে আলোচনাসভা বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে যাক। আমাদের প্রত্যাশা কিছু ক্ষেত্রে পূরণ হয়েছে, আবার অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, কলকাতার আমাদের নিজস্ব বাৎসরিক 'আড্ডা'র জনসমাগম গত দু-বছর ধরে তেমন বেশি হচ্ছে না। এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কারণ যে-কোনো পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মধ্যে এক গতিশীলতা, এক পরিবর্তনশীলতা থাকবেই। …এছাড়া সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের আর্থিক সমস্যার ঘাটতি – গত দু-তিন বছরে 'আড্ডা'র খরচে বেশ কিছু ভর্তুকি দিতে হয়েছে।

তাই সব মিলিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে যে, '৯৫ সালের 'আড্ডা' সারাদিনের বদলে দুপুর থেকে সন্ধ্যে অবধি বসানো হবে। 'আড্ডা'-র উপযুক্ত আলোচনার বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকবৃন্দের সুচিন্তিত পরামর্শ আমরা চাইছি।
উৎস মানুষ-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমস্ত সক্রিয় পাঠকবর্গের সহায়তায় সম্পন্ন হবে এটাই আমাদের বর্ষ শুরুর প্রত্যাশা।

সম্পাদকমণ্ডলী

স্ত্রীজাতির অবনতি

বেগম রোকেয়া

'চিরকাল আমি কী পাঠাবার জন্য কিছু করতে পেরেছি?' ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে একটি চিঠিতে, মৃত্যুর (৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২) মাত্র কয়েক মাস আগে, একথা লিখেছিলেন বেগম রোকেয়া। [illegible] স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী সেই মহীয়সী নারী শিক্ষা বঞ্চিত নারী-র [illegible] স্কুলের মান পরিবর্তন করতেও চেয়েছিলেন, [illegible] — [illegible] — স্ত্রী শিক্ষার জন্য [illegible] সেই সময়ে যে কঠিন কাজ সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন রোকেয়া তা [illegible]। বাকি [illegible]।
সেই রোকেয়ার অবশ্য একটি লেখার অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল [illegible] (ডিসেম্বর '৯০) সংখ্যায় [illegible]। এ সংখ্যায় তারই [illegible]। — [illegible]

...

বিপৎসঙ্কুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিত আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্তনাদে রোদন করিয়া থাকি!! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকি কান্নার" কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।*

ব্যাঘ্র ভল্লুক তো দূরে থাকুক, আরশোলা জলৌকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই। এমনকি অনেকে মূর্ছিতা হন। একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়িসুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চিৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি হাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি—আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় আমি আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room-এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখন বেহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামক জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইঁহাকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum-এ) বসাইয়া রাখিলে স্ত্রীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পর্দার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ ঘরটিতে পর্যঙ্কের পার্শ্বে যে স্বর্ণ খানাট মণ্ডিত তক্তপোশ তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, এবং জড় পুত্তলিকা শোভিতেছেন, উনিই দুলারিবেগম (অর্থাৎ: বেগমের পুত্রবধূ)। ইঁহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন অংশে কত ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।...

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাসার্ধ চারি ইঞ্চি।* পরিহিত পাজামা জোরা সলমা চুমকির কারুকার্য ও বিবিধ প্রকারের (গোটা পাট্টায়) ভারে অবনত! আর পাজামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারী বধূ শ্রান্ত!

বধূরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? সর্বদাই ইঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ—১. সূক্ষ্ম সিঁথি পাটি বসাইয়া বাঁধিয়া কেশবিন্যাস, ২. বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, ৩. অর্ধেক মাথায় আটা-সংযোগে আফশাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুমকি বসান হইয়াছে, চন্দন চুয়া কি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা-সংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়। এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে ইঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ ইঁহার চির সহচর। শরীরে স্ফূর্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। সুতরাং ইঁহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চির রোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চির রোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া

শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষা লাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাদ্রি-পাদ্রি হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আপেল পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোন পুস্তকে ছিল না। ঐ বন্ধুকেদের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম! যাহা হউক, আমি উক্ত বন্ধুকেদের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, "অভাগীর ইহলোক-পরলোক — উভয়ই নষ্ট।" যদি ঈশ্বর হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে কেহ কি বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ির একটি মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে রোজ পথ হাঁটা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি কৈফিয়ৎ (explanation) দিবে?" সে বলিল, "আপকা কহনা ঠিক হ্যায়" — এখন সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলাফেরা করে, আমাকে হঠাৎ জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু হাওয়াখোরী করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।" দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে বালিকা একটা গম্ভীরা উঠিল। আমি কিন্তু বাধিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝলি রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার প্রবৃত্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহু দূরে — ভরসা কেবল পতিত পাবন।

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল-কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন — কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্রজনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্রজনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোকরশ্মি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রী-শিক্ষাকে নমস্কার।"

আজিকালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব; সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

যাঁহারা তর্কের অনুরোধে স্বীকার করেন যে, যদি কোন নেটিভ খ্রীস্টিয়ান হয় ত মনে করিবেন যে, রমণীর জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির অধঃপতনের কারণ। যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis-এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাওয়া (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন।"

যাহা হউক "শিক্ষার" অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের "অন্ধ অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি — তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তির বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি: যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম মনোহর বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা — বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনী! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক্য দেখে!...

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার ঘরকে বাড়ি পরিষ্কার রাখিস্।" দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া যাঁহা হয় করিয়া আদরে তাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল — কোন কালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ি ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল! অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ির দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কি হইবে? সম্মার্জনী ব্যবহার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশি হইবেন, না আদরে তাহা তুলিয়া রাখিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে — এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন"; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধহয়, স্ত্রীজাতি

প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।[৮] ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই — এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই:

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী!"

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে, জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি।[৯] (এবং ভগিনীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত, কোনো ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ["but neverthelcss it (Earth) does move"]!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সি নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি এক বঙ্গ উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইল:

এই শতাব্দী বর্ষের মধ্যে পার্সি মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় উঁহারাও পর্দার (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ির ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পার্সি মহিলাগণ পর্দা ছাড়িয়াছেন; খোলা গাড়িতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক ইঁহাদের পর্দা (পর্দা) রহিত করিয়াছেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। বেজানেন বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইল।" কই পৃথিবী ত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, — সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা[১০] লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ — সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?[১১]

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে দুই টাকা বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোক এক টাকা পায়। চাকরের খোরাকি মাসিক তিন টাকা আর চাকরানির খোরাকি দুই টাকা। অবশ্য কখন কখন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করিয়া দুর্বল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা — উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে — সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন — আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন? তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

সাপের কথা

ছবি আর ছড়ায়

আছে অনেক সাপই
যাদের বিষই নাই
সে সাপ দেখেও কিন্তে
আমরা ভয়ে পালাই।

যে-সব সাপের বিষ নেই ভাই
এক ফোঁটাও কারো
তবু কেন মিছিমিছি
এসব সাপে মারো?

স্ত্রীজাতির অবনতি [৪ পাতার পর]

আশা করি আমাদের সুযোগ্যা পাঠিকা এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

পাদটীকা

৫. এদেশের যে সমাজ-বিদগ্ধ "লেডী কেরানী" কথাটা শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন) — তাঁহারা [illegible] পুরুষ [illegible] আর কোন [illegible] করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ [illegible] কথাটা শুনিলে কি করিবেন? মূর্ছা যাবেন না ত?

৬. কোন কোন [illegible] [illegible] এক [illegible]।

৭. [illegible] Eve [illegible], কিন্তু [illegible]। [illegible] বলেন, "Through woman came curse and sin; and through woman came blessing and salvation also." অর্থাৎ—নারীর [illegible] অভিশাপ ও পাপ আনিয়াছে এবং নারীর [illegible] আশীর্বাদ এবং মুক্তি আনিয়াছে। [illegible]

৮. [illegible] বলিয়া থাকেন, তাহা [illegible]।

৯. [illegible] (reasonable) পুরুষ [illegible] দিতে পারেন, কিন্তু "unreasonable" [illegible] থাকেন না,

তাহারা [illegible]।

১০. [illegible] একটি [illegible]। [illegible] বলি না যে, "[illegible]" এবং [illegible]।

১১. কিন্তু [illegible] কেন? [illegible] কি আমরা করিতে পারি না? [illegible] Shocking বোধ হয়, [illegible] স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-[illegible], স্ত্রী-[illegible], স্ত্রী-[illegible], স্ত্রী-[illegible] প্রভৃতি [illegible] ছিল না। [illegible] আছে।

জীবনদায়ী অ্যান্টিভেনিন
বিষের থেকেই হয়
সাপ-কামড়ে এই ওষুধই
প্রাণ বাঁচিয়ে দেয়।

সাপেরা সব ইঁদুর খেয়ে নির্বংশ করে
তারই জন্য চাষীর ফসল ঘরে যে তোলা ধরে।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছোটো ছোটো বহু দাঁত
চিহ্ন থাকলে সাপ বিষহীন নির্ঘাৎ।

রোগীর মনে সাহস দিতে
বাঁধন দিয়ে দাও
(দ্রুত) ডাক্তার এনে সুঁই ফুটিয়ে
অ্যান্টিভেনাম দাও।

সবাই মিলে জোট বেঁধে আজ দাবি তোল ভাই
(সব) হেলথ-সেন্টার হাসপাতালে অ্যান্টিভেনাম চাই।

ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

পাশ-ফেল : আমরা আর ওরা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর গত অনেক বছর ধরে একই দৃশ্য দেখে আসছি :

সেইসব ছাত্র, যাদের বাড়ির অবস্থা ভালো, একাধিক প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে এবং পরীক্ষায় বেশ ভালো ফল করেছে—মার্কশিটটা হাতে নিয়ে কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়েই তারা স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। শিক্ষকদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ার কোনো তাগিদ তারা অনুভব করে না : কারণ তারা জানে, তাদের এই ফল করার পিছনে স্কুলের তেমন ভূমিকা নেই : হাই ফার্স্ট ডিভিশন বা 'স্টার' তারা কিনতে পেরেছে বাপের টাকার জোরে।

আর-একদল ছাত্র, যাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা মাঝারি ধরনের, পড়াশোনায় কিছুটা আগ্রহ আছে, আর তার চেয়েও বেশি আছে লেগে থাকার ধৈর্য—তারা মার্কশীট হাতে নিয়ে শিক্ষকদের কাছে আসে, ভক্তিভরে একটি প্রণাম করে, তারপর সলজ্জ হেসে বিদায় নেয়। যদিও এই ছাত্ররা পাশ করেছে প্রধানত নিজেদের অধ্যবসায়ের জোরে, তবু স্কুলের প্রতি একটা আনুগত্য তাদের মনে থেকেই যায়।

তৃতীয় দলে আছে সেই ছাত্রো, যাদের পাশ করার কথা ছিল না এবং করেও নি : কেউ কেউ হয়তো বড় জোর 'পি ডিভিশন' পেয়েছে। তারাও মার্কশীটটা নিয়েই খুব তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। দশটা বছর যে-প্রতিষ্ঠান তাদের আশ্রয় দিয়েছে, এখন সেই প্রতিষ্ঠানই যে তাদের অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করছে, এর জন্যে কোনোরকম ক্ষোভ বা ক্ষোভের প্রকাশ তাদের ভেতর দেখা যায় না।

শিক্ষক হিসেবে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, এই তৃতীয় দলের ছাত্রো যদি মার্কশীট হাতে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং জানতে চায়, কেন তারা ফেল করল—কী জবাব দেব আমরা !

এক হিসেবে আমার এই ভাবনার কোনো মানে নেই : কারণ এ-রকম প্রশ্ন ছাত্রো শিক্ষকদের কখনোই করে না। টেস্ট পরীক্ষার শেষ দিনে যাবার আগে ছাত্রো স্কুলের কোনো জিনিস ভেঙে দিয়ে গেল, এমন দেখেছি। বুঝতে পারি, 'বিদ্যালয়' নামের প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে যে-রাগ তাদের মনে জমা হয়ে থাকে, এটা তারই প্রকাশ হলো। কিন্তু সরাসরি শিক্ষককে চ্যালেঞ্জ করার কথা তারা ভাবতে পারে না। স্কুল সমাজের সেই রকম এক বৈধ প্রতিষ্ঠান, যেখানে জবাবদিহি করার প্রায় কোনো দায়ই পরিচালকদের নেই। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ফেল-করা ছাত্রদের যে-কাল্পনিক প্রশ্নের কথা একটু আগেই তুললাম, প্রায় সেই রকম বিষয় নিয়ে লেখা একটি ইংরেজি নাটক কিছুদিন আগেও একাদশ শ্রেণীতে পড়ানো হতো। সেখানে ঘটনাটা ছিল : চাকরিবাকরি না পেয়ে প্রাক্তন ছাত্রো তাদের ডিগ্রির বোঝা বাক্সবন্দী ফেরত দিতে এসেছে। পাঠক্রম থেকে নাটকটি কেন তুলে নেওয়া হলো জানি না। কর্তারা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, যে-ডালের ওপর তাঁরা বসে, এটা প্রায় সেই ডালেই কুড়ুল মারা হয়ে যাচ্ছে।

□□

অস্বীকার করা যাবে না যে, এই মান স্থির করা হয়েছে একতরফাভাবে, ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নয়। গ্রাম-শহরে একই পাঠক্রম, একই প্রশ্ন। যে-পরিবারে প্রথম প্রজন্ম বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তার জন্যে যে-মান, আর যে-পরিবারে অন্তত এক-শ বছর ধরে বিদ্যাচর্চার ধারা চলে আসছে, তার জন্যেও সেই একই মান। দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত আর মানসিকভাবে একটু পিছিয়ে-থাকা (রিটার্ডেড)—দুই ধরনের ছাত্র/ছাত্রীর জন্যেই একই পাশ মার্কস।

□□

কিসের আলয় — বিদ্যালয় ?

প্রথাটিকে একটু বাইরে নিয়ে আমরা বরং দেখার চেষ্টা করি, এই সমাজে স্কুলের অবস্থানটা কেমন। শিক্ষাবিজ্ঞানে একটা কথা চালু আছে যে, স্কুল হলো 'সমাজের ভেতর সমাজ'। একটা সমাজের স্বীকৃত নিয়মকানুনের থেকে স্কুলের নিজস্ব বিধিবিধান কিছু আলাদা। যেমন শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন শব্দটি বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের ভেতর একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। একটি সভায় বক্তা আসতে দেরি করলেন আর এই দিকে শ্রোতারা একটু গল্পগুজব, হৈ-হল্লা করে নিলে সেটাকে অপরাধ মনে করা হয় না। কিন্তু স্কুলের ক্লাসে শিক্ষক / শিক্ষিকা আসতে দেরি করলেও ছাত্র/ছাত্রীদের গল্পগুজব করাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। ছাত্রের অধিকার নিয়ে কয়েকটি মামলা ইদানিং আদালতে আসছে : কিন্তু সাধারণভাবে এখনও ছাত্র/ছাত্রীকে তার পরীক্ষার খাতা দেখানো হবে কি-না, সেটা অনেকটাই নির্ভর করে বিদ্যালয়ের মর্জি-মেজাজের ওপর। আবার ধরা যাক, ক্লাসে একটি চেয়ার ভাঙা হয়েছে, কে ভেঙেছে জানা যাচ্ছে না : এ-অবস্থায় বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ গোটা ক্লাসটাকে ছুটির পর কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারেন। সেখানে হেবিয়াস কর্পাসের মামলা চলে না। আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আমাদের সংবিধানে

আছে। কিন্তু যাঁরা-যাঁরা এ-অধিকার প্রয়োগ করতে চাইবেন সেটাকে ঔদ্ধত্য মনে করা হয়। ধ্বংসাত্মক কাজ করলে, যদি জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট হলে রাষ্ট্র জনসাধারণের ওপর পিটুনি কর বসাতে পারে : এ-ব্যবস্থা স্কুলেও চালু আছে। স্কুল এখানে রাষ্ট্রের একটি কঠোর নিয়মই মেনে চলে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে স্কুলের সম্পর্কটা কেমন ? আমাদের দেশে শিক্ষা বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে এখন 'মানবসম্পদ বিভাগ'। ঘোষণা করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। শিক্ষার জন্যে রাষ্ট্র ভরতুকি দেয় ; শিক্ষাখাতে বাজেটের কত শতাংশ কে খরচ করে, তাই নিয়ে মাঝে মাঝেই কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের টক্কর দেওয়ার খেলা চলে। এই সব মিলে একটা ধারণা গড়ে ওঠে : জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়াটা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। এই ধারণাটা অবশ্য গড়ে উঠেছে শ-দুয়েক বছর ধরে—ইতিহাসে যাকে 'জ্ঞানদীপ্তির যুগ' বলা হয়, প্রধানত সেই সময় থেকে। তার আগে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে এই দায়িত্ব স্বীকার করত না। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে রাষ্ট্র শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে মোটামুটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, ঠিকমতো তাও শুরু হয় ১৮৩৩ থেকে, তার মানে পলাশীর যুদ্ধের আটাত্তর বছর পরে।

আধুনিক পৃথিবীতে আজ কোনো রাষ্ট্রই শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র যেখানে টাকা ঢালবে, কিংবা সেখান থেকে কিছু আদায়ও করে নেবে। স্কুলের কাছ থেকেও রাষ্ট্র তার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়। ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে রাষ্ট্রের কয়েকটা যন্ত্র আছে—আইন-আদালত, পুলিশ-মিলিটারি। আমার মনে হয়, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও এ-রকম একটি যন্ত্র গড়ে উঠেছে। একটা রাষ্ট্র—একনায়কতন্ত্রী বা গণতন্ত্রী যাই হোক না কেন—তার চরিত্রটা সবক্ষেত্রেই একতরফা - 'আমলাতান্ত্রিক' ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও তাই। রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ একটি ছোটো আকারে স্কুল ; বড় ধরনের দুর্নীতি-অনাচার রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় আছে, তার প্রায় সবগুলিই ছোটো আকারে পাওয়া যাবে স্কুলে। সমাজে বড় ধরনের স্বৈরাচারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অনুমোদন নিয়ে বসে আছে, স্কুল তাদের অন্যতম।

আবার সেই কাল্পনিক ছাত্রটির কাছেই আবার ফিরে যাই। যাকে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, সে ঠিকমতো পড়ে নি, বা তাই ফেল করেছে। এই কথাতে ভুল কিছু নেই ; কিন্তু এরপরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, যার জবাব আমরা কখনও দিই না।

ওরা ফেল করে

একটি ছেলে বা মেয়ে সম্পর্কে যখন বলা হয়, সে ফেল করেছে—তখন ঠিক কী বোঝায় ? আমরা সহজে বলতে চাই, তার কাছ থেকে যা আশা করা হয়েছিল, সে তা দিতে পারে নি ; যে-মান বা উচ্চতায় তার পৌঁছনোর কথা ছিল, সেখানে সে পৌঁছতে পারে নি। আর আমার প্রশ্ন এই মানের ধারণাটা নিয়ে।

অস্বীকার করা যাবে না যে, এই মান স্থির করা হয়েছে একতরফাভাবে, ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নয়। গ্রাম-শহরে একই পাঠক্রম, একই প্রশ্ন। যে-পরিবারে প্রথম প্রজন্ম বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তার জন্যে যে-মান, আর যে-পরিবারে অন্তত একশ বছর ধরে বিদ্যাচর্চার ধারা চলে আসছে, তার জন্যেও সেই একই মান। শারীরিক প্রতিবন্ধী আর মানসিকভাবে একটু পিছিয়ে-থাকা (রিটার্ডেড)—দুই ধরনের ছাত্র ছাত্রীর জন্যেই একই পাস মার্ক। সমস্ত ধরনের প্রভেদ-বৈষম্যকে অস্বীকার করে এই মান : অথচ বাস্তবে এই প্রভেদটা যে কত তীব্র, তা আমরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝি। বানান ভুল করেছে বলে ছাত্রকে তিরস্কার করি, উপদেশ দিয়ে বলি—ডিক্সনারি দেখে নিতে পারো না। পরে কথাপ্রসঙ্গে একদিন জানতে পারি, 'অভিধান' শব্দটির মানেই ছেলেটি জানে না। তার বাবা ভ্যান চালায়, মা ঝিয়ের কাজ করে। যে-ছেলেটির চৌহদ্দিতে অন্তত দুটি অভিধান, তার ভুলটাও ভুল ; আবার ঝিয়ের ছেলে আমার এই ছাত্রটির ভুলকেও বলে করি ভুল। দুজনের জন্যেই একই তিরস্কার, একই উপদেশ। এই উদ্ভট স্বৈরাচার আমরা শিক্ষকরা প্রতিদিন চালিয়ে আসছি।

নবম শ্রেণীতে নতুন একটি ছাত্র ভর্তি হয়েছে দেখে রোল নাম্বার জানতে চাই ; ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ফরটি থিরি। নাইনের ছাত্র থি উচ্চারণ করতে জানে না। প্রচণ্ড ধমক দিই। পরে জানতে পারি, ছেলেটির বাড়ি দক্ষিণবঙ্গের কোনো-এক গ্রামে। কলকাতায় কাকার কাছে থেকে পড়বে বলে এইট পাস করে চলে এসেছে। ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় চোদ্দ বছর আগের। এখনও মনে হয়, ছেলেটির কাছে অপরাধী হয়ে গেলাম।

পাল্টা যুক্তি তুলে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন : আমি কি তাহলে মান নামিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করছি ? এর ফলে কি ভালো ছেলেদের প্রতি অবিচার করা হবে না ?

আমি এইসব প্রশ্নের গুরুত্ব স্বীকার করি, আর সবার জন্যে এক নিচু মানের সুপারিশও আমি করছি না। আসলে মান উঁচু না নিচু এই ধারণাটাই আমার কাছে অবান্তর। আসল প্রশ্ন হলো : মানটা কে ঠিক করেছে এবং কীভাবে তা করা হয়েছে ? মানটা কি স্থির হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে, অন্তত বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী যে-উচ্চতায় আছে, সেটাকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে ?

অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ফেল করার একটা প্রধান কারণ, যে-উচ্চতা ছাত্রটিকে ছুঁতে বলা হচ্ছে, তা সে পারছে না। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিতে খুব সাধারণ বিষয়ের ওপর ছ-আট লাইনের প্যারাগ্রাফ বা দুটির প্রশ্নোত্তর-জাতীয় চিঠি হয়তো ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু শিক্ষা পর্ষদ মানটিকে যে-উচ্চতায় বেঁধেছেন সেখানে পরীক্ষার্থীকে 'সুচিন্তিত মতামত' দিতে বলা হয় উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের ওপর : প্যারাগ্রাফ লিখতে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ সংকট বা বোর্ডিনযানের বিজ্ঞানের ভূমিকা বিষয়ে। মানুষ যে প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতে দেওয়া হয়েছে, এমন নজিরও আছে।[১]

বাঙলায় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' কি নজরুল ইসলামের 'কুলিমজুর'

১. সূত্র : মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত মাধ্যমিক ইংরেজির 'প্যানেল রেকমেন্ডেশন'।

কবিতা পড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে যথাযথ লিখিয়ে নেওয়া সম্ভব, আর সে-লেখায় তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার কিছু ছাপও থাকতে পারে। কিন্তু তাদের যখন পড়তে দেওয়া হয় দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল থেকে 'ভাঁড়ুদত্তের কীর্তি' কিংবা মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' থেকে 'শোকাকুলা চিত্রাঙ্গদা', তখন সেটা আর তাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না।[1] 'আভরণহীন দেহ হিমানীতে যথা / কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী লতা' — এই ভাষাটাই তাদের কাছে বিদেশী হয়ে যায়। সমালোচকরা হয়ত বলবেন, দ্বিজ মাধব বা মধুসূদনের রচনা নেওয়া হয়েছে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারাটা বোঝাবার জন্যে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এই ধারাটা বোঝাতে হবে — এই চিন্তাটাই হলো ওপর থেকে আনা এবং একতরফা।

পাঠক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে যখন কোনো পরিবর্তন আনা হয়, তখন তার আগে কী আদৌ কোনো সমীক্ষা করা হয়? ১৯৮৪ সাল থেকে ইংরেজির নতুন পাঠক্রম যখন চালু হলো, তখন একটি সেমিনারে কর্তাব্যক্তিদের কাছে এই প্রশ্নটা তুলেছিলাম। জবাব পেয়েছিলাম, সমীক্ষার পরই এই পাঠক্রম স্থির হয়েছে। ধরে নিচ্ছি তথ্যটা ভুল নয়; কিন্তু কী ধরনের সমীক্ষা করা হয়েছিল? বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের পরিবেশ, পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শোনার এবং পড়ার স্বচ্ছলতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামর্থ্য — এইসব জরুরি বিষয়গুলি কি হিসেবের মধ্যে রাখা হয়েছিল? সমীক্ষাটা যে ঠিকভাবে করা হয় নি, তার প্রমাণ আজ হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। দশ বছর ধস্তাধস্তির পর সাম্প্রতিক মিত্র কমিশনও স্বীকার করেছেন, ইংরেজির সিলেবাসটা ঠিক কাজ করছে না।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা প্রায় একই রকম বলে শুনেছি। পর্ষদ যে সীমা বেঁধে দিয়েছেন, গ্রন্থকর্তারা চমক আনার জন্যে তা ডিঙিয়ে যান; আর প্রকাশকরা দাম বাড়ানোর জন্যে বইয়ের ওজন বাড়িয়ে আরও ওপরে তুলে দেন সীমানাটা। বইয়ের সংখ্যা বাড়ে, বোঝা ভারী হয়, তার চাপে ছেলেমেয়েদের পিঠ বেঁকে যায়। তারা পাগলের মতো প্রাইভেট টিউটর খোঁজে, স্কুলে ক্লাস করার সময় থাকে না, ক্লাসরুম ক্রমশ ফাঁকা হতে থাকে আর কোচিং সেন্টারে ভিড় উপচে পড়ে, সেখানে: 'পাঠশালাটি দোকানঘরে, গুরুমশাই দোকান করে।'

এই গুরুমশায়ের দোকানে যাওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই, তারা চোখে হলুদ দেখে; একটা সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আমরা লিখে দিই — 'নট প্রোমোটেড'; সমাজ আঙুল দেখিয়ে বলে, ও ফেল করেছে।

☐ বইয়ের সংখ্যা বাড়ে, বোঝা ভারী হয়, তার চাপে ছেলেমেয়েদের পিঠ বেঁকে যায়। তারা পাগলের মতো প্রাইভেট টিউটর খোঁজে, স্কুলে ক্লাস করার সময় থাকে না, ক্লাসরুম ক্রমশ ফাঁকা হতে থাকে আর কোচিং সেন্টারে ভিড় উপচে পড়ে, সেখানে: 'পাঠশালাটি দোকানঘরে, গুরুমশাই দোকান করে'। এই গুরুমশায়ের দোকানে যাওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই, তারা চোখে হলুদ দেখে; একটা সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আমরা লিখে দিই — 'নট প্রোমোটেড'; সমাজ আঙুল দেখিয়ে বলে, ও ফেল করেছে।

এই দুর্ভাগাদের কথা ভেবে মানের ধারণায় একটু রদবদল করলে কি ভালো ছেলেদের প্রতি অবিচার করা হয়? ভালো ছেলেরা যদিও সংখ্যালঘু, তবু মৌলিক অধিকারের দিক থেকে দেখলে তাদের দাবিটাও ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু তাদের তো পছন্দের স্বাধীনতা আছে। তারা ইচ্ছে করলে সাধারণ স্কুলে আসতে পারে, অথবা বেছে নিতে পারে 'বিশেষ' স্কুল। তাদের কথা ভেবে, তাদের সামর্থ্যটাকে কেন আমরা 'স্ট্যান্ডার্ড' করতে যাব? আমার এই শেষ কথাটা খুবই বিতর্কমূলক। একেবারে উল্টো দিক থেকে কেউ কেউ যেমন মনে করেন, বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান এখন খুবই নেমে গেছে। প্রশ্ন করলে দেখা যাবে, এক-একজন কথা বলছেন এক-একটি পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা থেকে। যেমন কেউ মনে করছেন, বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস এখন খুব সোজা হয়ে গেছে: কারণ ইংল্যান্ডের ইতিহাস আর আলাদা করে পড়ানো হয় না। তিনি ভুলে গেছেন, তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছিল ব্রিটিশ ভারতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। আবার কারো মতে, স্কুলে এখন ইংরেজি কিছুই পড়ানো হয় না; দুশো নম্বরের পরীক্ষাও নেই, আর বড় বড় 'এসে'ও লিখতে হয় না। এই ব্যক্তিটির চোখে বিদ্যালয়-শিক্ষার মান নেমে গেছে। তিনি অবশ্যই মনে রাখেন না যে, তাঁর আমলে ইন্টারমিডিয়েট স্তরে বিজ্ঞানে যা পড়ানো হতো, তার অনেকটাই এখন সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়িয়ে দেওয়া হয়।

শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তাঁরাও এইসব অদ্ভুত ধারণা থেকে মুক্ত নন। এমনকি শিক্ষাবিদদের কাছেও খুব স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। এতগুলো শিক্ষা কমিশনের পরও এখনও পর্যন্ত আমরা যেন ঠিক করে উঠতে পারি নি — স্কুলটা নিয়ে আমরা কী করব। আমরা এইটুকু ধরে নিয়েছি, সকলের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই গণতন্ত্রীকরণ বা সবার জন্যে এক শিক্ষার নামে আমরা যা করছি, সেটাও কম স্ববিরোধিতা নয়। আমাদের পছন্দমতো একটা মান আমরা ওপর থেকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, আর গড়পড়তা ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করছি সেই উচ্চতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতে। তারা পারছে না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, নাকমুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাচ্ছে, আমরা দেখছি না।

শুনেছি আগেকার দিনে বিচারকরা নাকি ফাঁসির আদেশ লেখার পর কলমের নিব ভেঙে ফেলতেন। প্রতি বছর পরীক্ষার খাতা দেখার পর আমারও সেই ইচ্ছে হয়েছে, যখন দেখেছি লালে-লালে ক্ষতবিক্ষত খাতায় আমারই হাতের, আমারই সন্তানের রক্ত।

---

১. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রকাশিত অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সংকলন — '[illegible]'।

হরধনু কাহিনী

নাট্যরূপ : [illegible]

[illegible — small-print introductory note, ending "— স. স."]

[স্কুল ঘরের মধ্যে বাচ্চাদের সম্মিলিত কোলাহল। এখানে কোলাহল তৈরির জন্য টুকরো টুকরো কথা ব্যবহার করা হলো।]

ঘুনেধ কি পালোয়ান নিচিয়ান যায়

কি গ্রীষ্ম কি শীতে

বাচ্চাদের পাঁচিলে

কেঁদো কেঁদো মাছেদের সাঁতার দেখায়

হাসি গো হাসি, পাকের হাসি/নিম গাছেতে হচ্ছে সিম্

হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা/কাগের বাসায় বগের ডিম

[স্কুলের ঘন্টা বাজে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ক্লাসরুমে-এ বসেছে। শিক্ষক আসে। বাংলা বই থেকে 'বিভীষণ ও রাবণ' কবিতাটি পড়াচ্ছেন।]

শিক্ষক ॥ বিভীষণ কপবান কহি বিভেন।

পুনর্বার রাবণে কহেন এ বচন ॥

মহারাণে বাঁধিলে যে ধর্ম আচরণ।

হিমতে দুর্নীতি কিছু নয় মোর মন ॥

প্রশ্ন ॥ কবিতার কাহিনীটি কোন্ মহাকাব্য হইতে নেওয়া এবং মহাকাব্যের রচয়িতা কে? উত্তর হবে —

উত্তর ॥ রামায়ণ নামক মহাকাব্য হইতে নেওয়া এবং রচয়িতা কবি বাল্মীকি।

[স্কুলের পিয়ন একটি খাতা নিয়ে আসে। শিক্ষক খাতায় লেখা নোটিশটি পড়ে ফেরত দেন, পিয়ন প্রস্থান করে।]

শিক্ষক ॥ (ছাত্র / ছাত্রীদের) আগামীকাল জেলার পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। বাংলা যে পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে, ভালো করে দেখে আসবে।

[শিক্ষক প্রস্থানোদ্যত। ঘন্টা বাজে। দৃশ্য পরিবর্তন।]

[ঘরের দৃশ্যপট। ঘরে আছে মা, বড় মেয়ে, ছোটো ছেলে।]

মা ॥ (বড় মেয়েকে) রমা, রাজুর বইগুলো মলাট দিয়ে ভালো করে নাম লিখে দে।

রমা ॥ আমি এখন পারব না।

মা ॥ পারব না কি? কাজ করতে বললেই — পারব না, যা বলছি শোন।

রাজু বইগুলো নিয়ে রমার কাছে বসে।

রাজু ॥ এই তো স্কুল থেকে এলাম। আমি এখন পড়ব না। খেলব।

মা ॥ সারাদিন শুধু খেলা খেলা আর খেলা। বোস বই নিয়ে।

[মা ঘরের পাকঘরের-এ ঢুকে যায়। রমা আর রাজু মুখোমুখি। রমা রাজুর বই মলাট করেছে। তারপর নাম লিখছে।]

রমা ॥ তোর রোল নাম্বার কত?

রাজু ॥ দুই।

রমা ॥ (জোরে জোরে উচ্চারণ করে স্কুলের নাম লিখল) রামমোহন শিক্ষায়তন।

রাজু ॥ জানিস দিদি, কাল না আমাদের স্কুলে ইনস্পেকটর আসবে।

রমা ॥ তোদের স্কুলে এত ঘন ঘন ইনস্পেকটর আসে কেন রে?

রাজু ॥ আমাদের স্কুল খুব ভালো তো, তাই।

রমা ॥ ভালো না ছাই।

রাজু ॥ তুই হিংসুটে।

রমা ॥ বইয়ে মলাট দেব না কিন্তু।

রাজু ॥ মা-কে বলে দেব।

রমা ॥ যা বল গে যা (রাজুকে মৃদু ধাক্কা দেয়, রাজু উঠে মা-কে বলতে যাবে, রমা উঠে রাজুর হাত ধরে ফেলে)।

রমা ॥ এই না-না না। তোদের ইস্কুল খুব ভালো।

রাজু ॥ খুব নামী।

রমা ॥ হুঁঃ, খুব নামী।

রাজু ॥ প্রাইজ পায়।

রমা ॥ প্রাইজ পায়। খুব পায়। সোনা — সোনা চাঁদগোলা।

রাজু ॥ ভোঁদ্।

[ঘন্টা বেজে ওঠে, খেলা শেষ। দৃশ্য পরিবর্তন। ক্লাসঘর। কোলাহল আস্তে আস্তে নিঃশব্দ। মাস্টারমশাই আসেন। আগের দিনের সেই 'বিভীষণ ও রাবণ' কবিতাটি পড়াতে শুরু করেন। এর পর স্কুল ইনস্পেকটর, পিয়ন দরজায় প্রবেশ করতেই মাস্টারমশাই উঠে দাঁড়ান, সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও।]

ক্লাসটিচার ॥ (পত্রিকা বাড়িয়ে দেবার ভঙ্গিমায় ছাত্রদের) আমাদের স্কুল পরিদর্শক শ্রীঅমৃত কুমার ঘোষ।

ইনস্পেকটর ॥ (ক্লাসটিচারকে হেসে হেসে) কুমার নেই। (ছাত্রদের) বোসো তোমরা। (ক্লাসটিচারকে) কি পড়াচ্ছিলেন ? (টেবিলের বইটা উল্টে নিজেই দেখেন) 'বিক্রমিক ও হালদ'। বাঃ – (একজন ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে) তোমার নাম কী ?

ছাত্রটি ॥ (উঠে দাঁড়ায়) সুবোধ ঘোষ।

হেডস্যার ॥ সুবোধ ক্লাসে ফার্স্ট বয়।

ইনস্ ॥ বাঃ, সুন্দর। বলো তো হরচন্দ্ কে ছেড়েছিল ?

[প্রশ্ন শুনে সুবোধ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সময় চলে যায়। ইনস্পেকটর রুমাল দিয়ে মুখ মোছেন।]

ইনস্ ॥ (মোলায়েম সুরে) বলো, কে ছেড়েছিল বলো।

[সুবোধের মুখ শুকিয়ে আমসি। ছলছল দু-চোখ, গম্ভীর থমথমে মুখে হেডমাস্টার দেখছেন সুবোধকে। ক্লাসটিচার হাত কচলাচ্ছেন।]

ইনস্ ॥ বলো। ভয় কি, বলো।

[ইনস্পেকটরের স্নেহ ঝরাতে কান্না জড়ানো গলায় সুবোধ বলল –]

সুবোধ ॥ আমি ভাঙি নি স্যার। সত্যি বলছি, আমি ভাঙি নি।

[জবাব শুনে ইনস্পেকটর অবাক। তাকালেন হেডস্যারের দিকে। ক্লাসটিচার কাঁপা গলায় বলেন –]

ক্লাসটিচার ॥ (ইনস্পেকটরকে) স্যার যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি, সুবোধ খুব ভালো ছেলে। হরধনু ভাঙার মতো কাজ সে করতে পারে না।

হেডস্যার ॥ (ক্লাসটিচারকে থামিয়ে) ও কিছু ভুল বলে নি। ভাঙচুর করা বখাটেদের কাজ, আমাদের এলাকায় তারা নেই।

[ইনস্পেকটরের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। দূরে ঘণ্টার ধ্বনি। ধীরে, খুব ধীরে আলো অন্ধকারে এগোয়। ইনস্পেকটরও ধীর পায়ে এরেনার মাঝ বরাবর আসতে থাকে। ক্লাসটিচার ও হেডস্যারের কথা শোনা যায় –]

ক্লাসটিচার ॥ স্যার, সুবোধ খুব ভালো ছেলে। সে নির্দোষ। হরধনু ভাঙতেই পারে না।

হেডস্যার ॥ আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন। ভাঙচুর করা বখাটেদের কাজ, তারা নেই।

[একটা ক্লিনিক্যাল মেটালিক শব্দ। দূরে আলো, দূরে হরধনু ভঙ্গের গান। ঝিকমিকিতে জনকের কন্যা সীতার বিয়ে। রামায়ণ গান।]

দোহারদের গলা ॥ হরধনু ভাঙে যে ধা ধা ধিনি ধা –

গায়ক ॥ এতেক বলিয়া রাম সহাস্য বদনে
ধনুকে ধারণ করে দেখে সর্বজনে।

দোহার ॥ হরধনু···

গায়ক ॥ রামের দৌরাত্ম্য ধনুর গুণে পড়ে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান ॥

দোহার ॥ ··· ···

গায়ক ॥ জনক তুষ্ট হইলেন হরষিত।

দোহার ॥ হরষিত – ও – ও – ও –

গায়ক ॥ বাদ্য বাজে মিথিলা-নগরে অগণিত –

দোহার ॥ হরষিত সকলে – এ – ধা ধা তিন ধা –

[ছাত্রের দল অন্ধকারের সম্মুখ থেকে ঘুরে গুনগুন করবে। ইনস্পেকটর মধ্য এরেনায়। সেন রামায়ণ গানের আসর বসেছে। দোহারের শেষে একটা composition ছোট টেবিল বা উঁচু টেবিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে ইনস্পেকটর একটি রিপোর্ট লিখছেন –]

মাননীয় জেলা শিক্ষা আধিকারিক,

রামমোহন শিক্ষাভবন একটি নামী প্রতিষ্ঠান স্কুল। সুবোধের স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে স্কুল দেখে, ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে, আমি খুশি হয়েছি। এই বিদ্যালয়ে বাট সত্তরজন ছাত্র প্রতি বছর প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে এবং পাঁচ-সাতজন বৃত্তিও পায়। আজ এক ঘটনায় আমার সকল ধারণা ভেঙে যেতে এক গভীর অস্বস্তি থেকে এই রিপোর্ট লিখছি। গত পনের বছর যাবৎ গণমুখী শিক্ষানীতির প্রবর্তন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বামপন্থীর ফলে নানা উন্নতি দৃষ্টিগোচর হলেও অন্তরালে কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। সামান্য একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গুরু শিষ্য উভয়েই ভুল করছে। এই দুর্গতি রোধ করতে হলে এখুনি জরুরি ভিত্তিতে এমন কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার···

[শেষের কথা শোনা যায় না। কাঁসর বেজে থাকে। মিলন আসে –]

ইনস্ ॥ তাড়াতাড়ি কাল অফিসে এসে এই চিঠিটা দিয়ে বলবে, উনি যেন এটা নিয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরে চলে যান।

[ঘণ্টা বাজে। দৃশ্য পরিবর্তন। অনেক কচি-কাঁচার কোলাহল। একজন হবে বুড়ো বা বুড়ি। লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে।]

১ম জন ॥ ও বুড়িমা কই যাও ?

বুড়ি ॥ এই পুকুরে।

২য় জন ॥ ও পুকুরে দু-দুটো আছে। এ পুকুরে আম।

বুড়ি ॥ এই পুকুর তো ছোটো।

৩য় জন ॥ একটা কিছু ফেল, বড় হয়ে যাবে।

[বাকি সবাই হাত ধরাধরি করে একটা ছোটো পুকুর বানায়। বুড়িমা একটা ঢিল ফেলে মাঝখানে। পুকুরটা বড় হয়ে যায়।]

ধরিয়ে হাতের ভোঁর বড় বেড়-এ ঢোকে। অন্যেকের হাতগুলো কেটে দেয়।]

বুড়ি ॥ দাব ভাত ডালো দই —

তোমরা কেউ খাবে না, আমি চান করে আসি।

[বুড়ি বেড় থেকে বেরিয়ে গেলে সবাই বুড়ির ভাত খাবার হাপুস হুপুস করে খেয়ে নেয়। বুড়ি ফিরে এসে হাতের লাঠি নিয়ে তাড়া করে। সবাই ছুটতে থাকে, পালাতে থাকে, ইনস্পেক্টর এই অবস্থায় এসে পড়ে। একজন বাচ্চা ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ও'র গায়ে। ইনস্পেক্টর ক্ষেপে না গিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে। বাকিরা দৌড়ের ভঙ্গিমায় স্থির। যে বাচ্চাটা ও'র গায়ে পড়েছিল তাকে ইনস্পেক্টর বলেন —]

ইনস্ ॥ তোমার নাম কি?

বাচ্চা ॥ সৌম্যজিৎ।

ইনস্ ॥ বাঃ সুন্দর নাম। কে রেখেছে? মা না বাবা?

বাচ্চা ॥ মামী।

ইনস্ ॥ কোন্ ক্লাসে পড়?

বাচ্চা ॥ ক্লাস থ্রি।

ইনস্ ॥ আমাকে চেনো?

বাচ্চা ॥ বাবা জানে, মানে চেনে।

[ইনস্পেক্টর একটা লজেন্স বার করে ওকে দেয়।]

ইনস্ ॥ আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। যদি ঠিক ঠিক বলতে পার তাহলে তোমায় (পকেট থেকে বার করে) এই লজেন্স আর এই চকোলেটটা দেব।

বাচ্চা ॥ কি প্রশ্ন?

ইনস্ ॥ বল তো হরধনু কে ভেঙেছিল?

বাচ্চা ॥ আমার বন্ধু ইন্দ্রজিৎ, ভাস্কর দত্ত, ও ভাঙতে পারে।

ইনস্ ॥ (মুখটা কালো হয়ে যায়) ও আচ্ছা। তুমি যাও।

[আবার খেলা শুরু হয়। অর্ধেক বাচ্চা পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বাকিরা পেছন করে করে ছড়ানো পা লাফিয়ে লাফিয়ে ডিঙোতে থাকে।]

সুরে ছড়া —

ইকিং মিকিং চিকিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা
মা বলে ইস্কুলে যা
বাবা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা —

[এইভাবে খেলা চলতে থাকে। ইনস্পেক্টর আসে। একটা বাচ্চাকে ডাকে, লজেন্স দেয়, আগের বাচ্চাটার মতোই তার অবস্থা। জিজ্ঞেস করে —]

ইনস্ ॥ বল তো ডলি, হরধনু কে ভেঙেছিল?

ডলি ॥ আমি ভাঙি নি।

ইনস্ ॥ (মুখে কালো মেঘ জমে) ও আচ্ছা —

[ইনস্পেক্টর বেরিয়ে যায়। ডলি মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি বন্ধুরা নজরে এলে তারা ডলিকে ঘিরে দাঁড়ায়।]

১ম জন ॥ মুখ গোমড়া কেন?

[ডলি কথা বলে না]

সবাই ॥ কী হয়েছে ডলি, কী হয়েছে রে?

ডলি ॥ একটা লোক —

সবাই ॥ হাঁ —

ডলি ॥ একটা লোক বলল, তুমি কি হরধনু ভেঙেছ?

১ম জন ॥ আমাকেও জিজ্ঞেস করেছে —

২য় জন ॥ আমাকেও জিজ্ঞেস করেছে একটা বুড়ো —

[সবাই এক এক করে বলছে তাদের প্রত্যেককে নাকি জিজ্ঞেস করেছে।]

১ম জন ॥ কেমন দেখতে বলতো?

২য় জন ॥ বুড়ো।

৩য় জন ॥ পাগলা বুড়ো?

৪র্থ জন ॥ ছড়া কাটে — (পরে সবাই যোগ দেবে)

ভাংলা বনের পাগলা বুড়ো
আমায় এসে বল
আড়াই দিন সমুদ্রেতে
কাঁঠাল কত ফলে?
আমিও বাঁশ আদাড়েতে
কলাই পোনা কত —
তোমাদের ওই বিলের ক্ষেতে
চিংড়ি গাছের মত।

[সবাই হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে প্রস্থান।]

[পরের দৃশ্য ॥ হন হন করে ইনস্পেক্টর হেঁটে যাচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে অন্য আর-একজন, এক অভিভাবক। মুখোমুখি।]

অভিভাবক ॥ আপনাকেই খুঁজছিলাম।

ইনস্ ॥ কেন?

অভি ॥ কি সব আজেবাজে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছেন আপনি?

ইনস্ ॥ কী আজেবাজে প্রশ্ন?

অভি ॥ আমার ছেলেকে আর কখনও এসব উদ্ভট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না। আপনার প্রশ্ন শুনে ভয়ে তার জ্বর এসে গেছে। [illegible] হাঁ করে রইলেন কেন, মুখে মাছি ঢুকে যাবে।

ইনস্ ॥ আমি তো…

[ইনস্পেক্টর আরো কিছু বলতে চায়। অভিভাবক হন হন করে বেরিয়ে যায়।]

অতি ॥ [যেতে যেতে] আপনার কথা শোনার সময় আমার নেই। এই টোটা—

[ইনস্পেক্টর দাঁড়িয়ে থাকে। এক অদ্ভুত কথা নিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘণ্টা বাজে। কোলাহল। বাচ্চারা আসে একেবারে মাঝখানে। শুরু হয় নতুন খেলা। দু'জন মুখোমুখি হাত তুলে চেটোতে ঠেকিয়ে দরজা বানাবার মতো করে দাঁড়ায়। ওদের মাঝখান দিয়ে দরজা ভেদ করে এঁকেবেঁকে লাইন দিয়ে চলে সবাই। যে দু'জন দরজা হয়েছে তারা ছড়া বলে—]

ছড়া ॥
উপেনটি বাইস্কোপ
নাইন টেন টেইস্কোপ
চুলটানা বৌবিয়ানা
সাহেববাবুর বৈঠকখানা
আজ এসেছে যেতে
পান সুপারি খেতে…

[হঠাৎ একজন দূরে দেখতে পায় ইনস্পেক্টরকে—]

একজন ॥ ওই যে, ওই যে বুড়োটা— এদিকে আসছে।

[সবাই চটপট উঠে গিয়ে একটা দেয়াল তৈরি করে। দেয়ালের আড়ালে একটি বাচ্চা। ইনস্পেক্টর প্রবেশ করতেই—]

(আড়াল থেকে) বন্দুবুড়ো—

বলেই আবার আড়ালে গা ঢাকা দেয়।

[বন্দুবুড়ো ডাকটা যে ইনস্পেক্টরের উদ্দেশ্যে ইনস্পেক্টর তা বুঝতে পারেন না। উনি আবার চলতে শুরু করেন। আড়াল থেকে স্থান পরিবর্তন করে আবার অন্য সুরে—]

বন্দুবুড়ো

[এও এক খেলা। ইনস্পেক্টর থমকে দাঁড়ান। হাসেন শব্দহীন। আবার—]

ধমকদে—বন্দু—

পাগলা খুড়োর—খুড়ো

বন্দুবুড়ো—

[আড়ালে সবার হাসি ওঠে। আড়াল সরিয়ে যায়—আড়াল নেই। ইনস্পেক্টরের কাছেও না। এবার প্রকাশ্যে]

বন্দুবুড়ো—বন্দুখুড়ো—বন্দুকাকা—বন্দুজ্যাঠা—

[ইনস্পেক্টর অনেক কষ্টে মুখের চড়াচাপড় করবার চেষ্টা সংবরণ করেন। এবার একদম সামনে নাকের ডগায়]

বন্দুবুড়ো—পাগলা বুড়ো—

[এবার জামা টানাটানি। পাঞ্জাবি কলতান কাকের কর্কশ শব্দে বিদীর্ণ। মাথা চেপে বসে পড়েন ইনস্পেক্টর। কোরাস বাচ্চার শীৎকার তৈরি করে। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে। পিয়ন আসে।]

ইনস্ ॥ এক গ্লাস জল।

[পিয়ন জল নিয়ে আসে]

পিয়ন ॥ স্যার, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর থেকে একজন অফিসার এসেছেন।

ইনস্ ॥ পাঠিয়ে দাও।

[পিয়ন জলের গ্লাস নিয়ে বেরিয়ে যায়]

[অফিসার আসে। গম্ভীর এবং তার্কিকও বটে।]

অফিসার ॥ (হঠাৎই) আপনার গোলমেলে নোট পড়ে শিক্ষা অধিকর্তা ক্ষুব্ধ। জল ঘোলা হবার আগে নোটটা প্রত্যাহার করে নিন।

ইনস্ ॥ কি বলছেন আপনি?

অফিসার ॥ ঠিকই বলছি। গত পনের বছরে সরকারি শিক্ষানীতি রাজ্যকে কতটা এগিয়ে দিয়েছে তার তুলনায় কোথায় সামান্য কি ভাঙচুর হলো তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব তুচ্ছ বিষয়ে আপনার মত দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার কেন মাথা ঘামাবে?

ইনস্ ॥ রামমোহন শিক্ষায়তন খুব ভালো স্কুল। আমার ভালো লাগে। অনেকবার আমি পরিদর্শনে গেছিও। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—

[কথা শেষ করতে দেন না অফিসার]

অফিসার ॥ কোনো কিছু মনে করার কারণ নেই। শুনুন, ইনস্পেক্টরের চাকরি করলেই স্কুল পরিদর্শনে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কাজ করবার জন্য কেন এতো ছটফটানি আপনার? অফিসে আসুন, চেয়ারে বসুন, বাড়ি যান, মাসের শেষে মাইনে নিন। ব্যাস, চুকে গেল ল্যাঠা।

[ইনস্পেক্টর স্তব্ধ হয়ে যান।]

অফিসার ॥ শুনুন, আপনার নোট প্রত্যাহার করে নিন। আমি আসছি।

[অফিসার প্রস্থান করেন। ইনস্পেক্টর উঠে দাঁড়ান]

ইনস্ ॥ যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য কী তাহা জানে অথচ জীবনে তাহা বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, যাহারা মনের গোপনে গোপনে সত্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছে, অথচ বাহিরে সমাজজীবনে সবার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করার সাহস নাই— সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকট সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

[ঘণ্টা বাজে। ইনস্পেক্টর বেরিয়ে যান। ইনস্পেক্টরের এক বন্ধু আসে। তাকে—]

বন্ধু প্রভাস ॥ অমর, অমর—

[ইনস্পেক্টর অমর ঘোষ বেরিয়ে আসে। বন্ধু অমরকে দেখে—]

প্রভাস ॥ কি রে। ভালো আছিস তো তুই?

অমর ॥ হ্যাঁ, কেন?

প্রভাস ॥ না, মানে, কি যে সব খবর পাই।

অমর ॥ কী খবর?

প্রভাস ॥ শুনলাম, তুই নাকি পাগল হয়ে গেছিস ?
জগৎ ॥ কোথায় শুনলি ?
প্রভাস ॥ ওঙ্কার বাড়ির আড্ডায়। রথুরা বলাবলি করছিল—
জগৎ ॥ পাগল মানে সে অ্যাবনর্মাল, না !
প্রভাস ॥ হ্যাঁ।
জগৎ ॥ অ্যাবনর্মাল তারা ? (একটু থেমে) তুই—
প্রভাস ॥ না না, আমি না। আমি তো বিশ্বাসই করতে চাই নি। ওরাই বলছিল—
জগৎ ॥ কি বলছিল ?
প্রভাস ॥ কি সব ভাঙাভাঙির ব্যাপারে তুই নাকি—
জগৎ ॥ কি ভাঙা ? বসন ভাঙা ? হাঁড়ি ভাঙা ? দেশ ভাঙা ?
প্রভাস ॥ না না এই—
জগৎ ॥ শিব ধনুক ভাঙা।
প্রভাস ॥ আরে ওই—কি যেন—
জগৎ ॥ হরধনু ভাঙা ?
প্রভাস ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ।
জগৎ ॥ বল তো হরধনু কে ভেঙেছিল ?
প্রভাস ॥ মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা সীতাকে বিয়ের যোগ্যতা অর্জন করতে রামচন্দ্র হরধনু ভেঙেছিল।
জগৎ ॥ একদিন স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলাম ক্লাসটিতে ছাত্রদের পড়াচ্ছে 'সীতাদি ও রাবণ' নামে একটি কবিতা—বাল্মীকির রামায়ণ থেকে। একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করলাম—'হরধনু কে ভেঙেছিল' ? ছাত্র জবাব দিল—'আমি ভাঙি নি স্যার'। আর শিক্ষক জবাব দিল—'ভাঙচুর করা বাদের কাজ, আমাদের এলাকায় তারা নেই'।
আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সামান্য একটি ঘটনা শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রতিক হালচাল সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলল আমাকে।
প্রভাস ॥ তারপর ?
জগৎ ॥ জেলা শিক্ষা-আধিকারিককে একটা রিপোর্ট পাঠালাম। লিখলাম বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় করলেও একটি ফাঁক থেকে যাচ্ছে ভেতরে।
প্রভাস ॥ তারপর ?
জগৎ ॥ শিক্ষা আধিকারিক একজন অফিসারকে পাঠিয়ে রিপোর্টটা উইথড্র করতে বলল।
প্রভাস ॥ তুমি নিলি ?
জগৎ ॥ না। পনেরোদিন বাদে শিক্ষা দপ্তর একটা চিঠি এল। সাদা কাগজে টাইপ করা। চিঠির বক্তব্য—হরধনু ভাঙার বিষয়টি খুব গোলমেলে। কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীর আওতায় পাঠানো হয়েছে।
প্রভাস ॥ ফ্যানটাসটিক। তারপর ?
জগৎ ॥ সময় কেটে যায়। শিক্ষামন্ত্রক থেকে চিঠি আসে হরধনু সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর প্রতি মুহূর্তে তদন্ত কমিশনের প্রতীক্ষায় দিন গুনেছি। হঠাৎ আবার আরো একখানা চিঠি—
প্রভাস ॥ কমিশনের চিঠি ?
জগৎ ॥ না, খোদ সরকার চিঠি। কমিশনের বিচার বিবেচনা পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী হরধনুর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
[প্রভাস হাসিতে গড়াগড়ি যেতে থাকে]
জগৎ ॥ তুই হাসছিস ? বল তো হরধনুর জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে কারা ?
প্রভাস ॥ (হাসি থামিয়ে) যারা ভাঙচুর করল তারা।
জগৎ ॥ যাক। একটা বাজে ঝামেলা থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল।
[ইনস্পেকটর বিদায় নিতে বেরিয়ে যায়। শুধু প্রভাস দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ওর পাশে এসে অন্য আর একজন দাঁড়ায়। সূত্রধারের মতন—]
১ম ॥ গল্পের সমাপ্তি এখানেই হবার কথা। চাঁদু গল্পটি এ রকম জায়গাতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু সব গল্পের সমাপ্তি সাময়িক। চিরতরে চরম সমাপ্তি কোনও গল্পে ঘটে না। নদীর মতো প্রবহমান গল্প যুগোপযোগী পরিণতি খোঁজে।
২য় ॥ হরধনু কাহিনীও ত্রেতাযুগ থেকে সাম্প্রতিক যুগে এসে মোড় নিয়েছে। তারা হরধনুর টাকা কে পাবে ? যারা টাকা পেলে খুশি হবে। স্কুল ইনস্পেকটর এতে খুশি হলো। খুশি হলো অন্য কারণে। তার আশা হিসেবে জমা পড়বে হরধনু ফাইল। পরিচিতরা আর তাকে পাগল ভাববে না। পাড়ার বাচ্চারা ধনুভাঙা বলে পেছন থেকে আওয়াজ দেবে না। কিন্তু সে যা আশা করেছিল, পারবে তা ঘটল না। হরধনু সংক্রান্ত গোপন তথ্য কিভাবে যেন ফাঁস হয়ে গেল।
[কোরাস পর পর পেছনে লাইন দিয়ে প্রত্যেকের কাঁধে হাত রেখে নাচতে নাচতে আসে—]
ছড়া ॥
এলাটিং বেলাটিং সই লো
কবে ফাঁস হইল
কবরের মুণ্ডু নর্দমায়
গেছটা শকুনে ছিঁড়ে খায়।
[ছড়া বলতে বলতে ওরা প্রবেশ করল। ছড়িয়ে পড়ল।]
তারপর জোড়ায় জোড়ায় পাশাপাশি কাল ধরে দুলতে লাগল। মুখে ছড়া—
সবাই একসঙ্গে ছড়া ॥
খুঁটি পায়ে থেকে ভাঙা
ভাঙার কানটি মুলে দে খা
ভাঙা দোলে—ভাঙা দোলে—
ও
ছড়া ॥
বাবুর মনের কি কান্না

বিরোধী দলের কালটি দীর্ঘ

ভাগা লেগে — ভাগা লেগে —

[বিধানসভার অধিবেশনে স্পিকার বা অধ্যক্ষ]

স্পিকার ॥ আপনারা মারামারি করবেন না। স্থির হয়ে বসুন। বিধানসভা চালাতে দিন। অর্ডার — অর্ডার —

বিরোধীপক্ষ ॥ আমরা স্যার মুলতুবি প্রস্তাব তুলব।

স্পিকার ॥ লিখিত প্রস্তাব সভায় পেশ করুন।

সরকারপক্ষ ॥ স্যার, আমাদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

স্পিকার ॥ চুপ করুন, চুপ করুন। এরকম চললে সভা মুলতুবি রাখতে বাধ্য হব।

বিরোধীপক্ষ ॥ (বক্তৃতার ঢং-এ) বন্ধুগণ, বোফর্স কেলেঙ্কারীর চেয়েও সাংঘাতিক কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়েছে সরকার। শিক্ষামন্ত্রক হবুচন্দ্র ভক্তের ক্যাপিটেশন বাবদ কোটি কোটি টাকার বেআইনী লেনদেন করেছে —

সরকারপক্ষ ॥ অপপ্রচার — অপপ্রচার।

স্পিকার ॥ অর্ডার — অর্ডার। এবার শিক্ষামন্ত্রী জবাবী ভাষণ দেবেন।

শিক্ষামন্ত্রী ॥ আমি দুষ্কৃতকারীদের আটক করার জন্য পুলিশকে বলেছি। মাননীয় সদস্যরা চাইলে হবুচন্দ্রের ক্যাপিটেশনের টাকা আরো বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি।

সরকারপক্ষ ॥ [করতালি]

শিক্ষামন্ত্রী ॥ শুধু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই বিরোধীদলের প্রস্তাবিত বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি মেনে নিচ্ছি।

[সভায় উভয়পক্ষের উল্লাস। ছড়া কাটতে থাকে সবাই। ইনস্পেকটর আসে। ত্রাহি ত্রাহি।]

ছড়া ॥
আমলাতো জোড়া জোড়া
মারব চাবুক ছুটবে ঘোড়া
ওরে বিবি সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলাঘোড়া
পাগলা ঘোড়া খেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে
অল রাইট ভেরি গুড
পাওরুটি বিস্কুট।

[কোয়াস বেরিয়ে না গিয়ে একটি বিশাল ঘরের কাঠামো তৈরি করতে পারে অথবা শুধু বন্দুকের কাঠামো। ইনস্পেকটর উঁকি উঁকিতে প্রবেশ করেন। একটা কিছু ধরে দাঁড়ান। বন্ধু প্রভাস আসে। হাতে আবোল কাগজ। জনককে (ইনস্পেকটরকে) দেখে চমকে উঠে —]

প্রভাস ॥ একি চেহারা হয়েছে তোর ?

জনক ॥ (আপন মনে) হাত পা ঠান্ডা। খিদে নেই। শেষ হয়ে যাব (বন্দুকে দেখে) নিশ্চয় জানবে ?

প্রভাস ॥ (কাগজটা গোপনে লুকোয়) কিছু না।

জনক ॥ লুকোস না বল — । আমার মাথার ওপর একটা হাতির পা ঝুলছে। যে কোনো মুহূর্তে থেঁতলে দেবে।

প্রভাস ॥ একটা কিছু করা দরকার।

জনক ॥ কি করতে বলিস ?

প্রভাস ॥ শিক্ষামন্ত্রকে থেকে ফাইলটা গায়েব করা সম্ভব ?

জনক ॥ । যদি স্বপ্নেও হাসে হায় রে।

প্রভাস ॥ একটা কাজ কর — রামায়ণে হবুচন্দ্র রাজার কাহিনী — অর্থাৎ কি, কে লেখেছিল, কেন লেখেছিল সব তথ্য দিয়ে একটা রিপোর্ট বানিয়ে যদি জুড়িয়ে দেওয়া যায়। তাহলে হয়ত অদ্ভুত ভুল বোঝাবুঝির —

জনক ॥ তার চাইতে আমি যদি প্রফেসরের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াই !

প্রভাস ॥ কঠিন প্রশ্ন, সময়সাপেক্ষ। তবু গবেষণাযোগ্য হবে।

জনক ॥ তাই করব।

[গির্জার ঘন্টা বাজার মতো ঢং ঢং শব্দ। কোয়াস যেন বহুদূর থেকে গোঙানোর মতো করে বলছে —
কোয়াস — শুনুন — শুনুন — শুনুন —
ইনস্পেকটর এবারে মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।]

ইনস্পেকটর ॥ (দর্শকদের) শুনুন, হবুচন্দ্র বলে কিছু নেই। সেটা জানার চেষ্টাও কেউ করে নি, বুঝলেন ! বুঝলেন আপনারা ?

[দূর থেকে ভেসে আসা বোকা শব্দ হয়]

আমি গ্যালিলিও গ্যালিলেই, ফ্লোরেন্সের গণিত ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। আমি শপথ নিয়ে বলছি, আমি যা এতকাল শিখিয়েছি সব ভুল। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত নয় এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে না — না —

শিশু ॥ বাবু !

[ইনস্পেকটর শিশুটোকে দেখেই আঁতকে উঠে পিছন ফিরে দৌড়ে পালাতে চায়।]

শিশু ॥ তুমি পালাচ্ছ কেন ?

ইনস্‌ ॥ হবুচন্দ্র কেউ ডাকে নি।

শিশু ॥ রামচন্দ্র তবে কি লেখেছিল ?

ইনস্‌ ॥ তুমি জান !!!

শিশু ॥ মা বলেছে। আমি ছোটদের রামায়ণ পড়েছি।

[ইনস্পেকটর অনাস্বাদিত সুখের আনন্দে ভরে পড়েন। শিশুটিকে তুলে ধরেন।]

ইনস ॥ শিবম্ বিকৃত মস্তিষ্কের মাঝখানে এই তো একটা সতেজ শিশু…।

[কোয়াস ফিরে দাঁড়ায়]

চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিলেন 'পৃথিবী ঘুরছে না'
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও
বরং তাকে চোখ রাঙাও না —

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আয়নায়

এক অসহায় মৃত্যুর কাহিনী

[illegible]

[illegible]

ওবোলা মাহাতো বাঁচতে পারে নি

গত বছর ১ নভেম্বর (১৯৯০) ওবোলা মাহাতো মারা যায়। অসুস্থতার কারণে নয়, এই মৃত্যুর আসল কারণ হলো কলকাতা মানুষের চরম অজ্ঞতা, গোঁড়ামি এবং নির্মম অবহেলা।

মারা যাবার আগে সে ছিল ৮ বছরের স্বাভাবিক প্রাণচঞ্চল একটি মেয়ে। তার সমবয়সী এখানকার অন্যান্য মেয়ের মতোই তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যের মতো ওবোলার শৈশবও। বাড়িতে তার আরও দু-টি ছোট্ট ভাইবোন রয়েছে। লেখাপড়ার পাট তাদের নেই। ওবোলার প্রতি কারও তেমন নজর ছিল না। তার মা বোকারোতে একটি পাথরের খাদে কাজ করে, সকাল ৭টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজে যায়, ফিরতে ফিরতে সন্ধে পার হয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে অলস হলো ওবোলার বাবা। তার স্ত্রী সারাদিন পাথর বোঝাই ঝুড়ি মাথায় নিয়ে পরিশ্রম করে। আর তিনি সারাদিনে কখনো মুরগী লড়াই, কখনো পুজো–ইত্যাদি 'সামাজিক' কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। কেউ দেখত না ওবোলার খান-খাওয়া হলো কি-না; ওদের কাছে ওবোলা আর কিছু ছিল না।

একদিন ওবোলার হঠাৎ জ্বরবমি শুরু হলো। খুব কাঁদতে লাগল মেয়েটা। আশপাশের লোকেরা ভাবল ও বোধহয় মারাই যাবে। আমরা সকলেই জানলাম, কিন্তু বললেন না তার বাবা ফিরে আসার আগে কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আমরা টি. বি. রোগ বলেই আশঙ্কা করছিলাম। ওর বাবা ফিরে আসতেই আমরা ওবোলাকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বললাম, কারণ সেখানে বিনা পয়সায় ওষুধ পাবার কথা। পরদিন সকাল ন-টায় আমরা হাসপাতালে পৌঁছলাম। এখানে চারজন ডাক্তার থাকার কথা, কিন্তু মাত্র একজন ডাক্তারের জন্য আরও দু-ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করতে হলো। ডাক্তার এসেই তাকে তাড়াতাড়ি দেখে কাজ সারলেন এবং বললেন–'বিশেষ চিন্তার কিছু নেই। খারাপ কাশি থেকেই হয়ত এমনটা হয়েছে।' অথচ বলা হলো মেয়েটির কোনো কাশি ছিল না। ডাক্তার তাকে কয়েকটা খোলা ট্যাবলেট এবং একটা ইনজেকশান দিলেন। অবশ্য এই সঙ্গে বলে দিলেন যে, টি. বি. সন্দেহে আমরা যদি এক্স-রে করতে চাই তাহলে শহরের একমাত্র এক্স-রে ক্লিনিকে তা করা যেতে পারে। শহরের এই ক্লিনিকটি ডাক্তারের ব্যক্তিগত।

ওবোলার জ্বরকষ্ট কিন্তু থামল না। সম্ভবত কারণেই সরকারি ডাক্তার এবং হাসপাতালের ওপর ওবোলার পরিবারের কারও আস্থা থাকল না। সরকারি ওষুধে কোনো কাজ হয় নি, ডাক্তার তাকে ঠিকমতো পরীক্ষা করে নি এবং গরিব বলে মেয়েটিকে ভর্তিও করা হয় নি। এখানে সবচেয়েই অভিযোগ হলো সঠিক এবং কার্যকর চিকিৎসার জন্য সরকারি চিকিৎসকদের 'প্রাইভেট' ক্লিনিকে না গেলে উপায় নেই। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অবর্তমানে ওবোলার বাবা ও পাড়ার এক ওঝার কাছে গেল। ওঝা এসে আবিষ্কার করল ওবোলার ওপরে প্রেতাত্মা ভর করেছে, যাকে মন্ত্র দিয়ে তাড়াতে হবে। একটা লাল মুরগি 'বলি' দিয়ে সেই রক্ত ওবোলাকে পান করানো হলো। দিন দুয়েক ওবোলার রক্তপাত বন্ধ থাকল। ওর বাড়ির সবার বিশ্বাস হলো 'ওঝা'র জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। ওঝা প্রতিদিন এসে মন্ত্র পড়ত এবং ওবোলাকে ভাত ও আলু ছাড়া বিশেষ কিছু খাবার দেওয়া হতো না। পালং, ডাল, মাছ, কলা–যেগুলো স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়–সব খাওয়া নিষেধ করা হলো।

দু-দিন পর থেকে ওবোলার পুরো শরীরটার ফুসকুড়ি দেখা দিল এবং দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া শুরু হলো। এবার বোকারো জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলাম আমরা, কিন্তু পরিবর্তে ওঝার চিকিৎসাই চলতে থাকল। একবার সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমাদের পরামর্শের ওপর ওদের ভরসা আর ছিল না। আমরাও নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় থাকলাম। লেখকের অবস্থা জটিল হতে মাহাতো পরিবারের দুঃখের সমাধা না, ওবোলার মা-ই আমাদের অনুরোধ করল কিছু একটা করবার জন্য।

এর মধ্যে কালীপুজো এসে গেল। ওঝা একটা ছাগল ও মুরগী বলি দেবার ব্যবস্থা করতে বলল। উৎসবের মেজাজে বাড়িতে অনেক লোক যাওয়াআসা

ওরা লড়াই করে

বিশ্বে বিভিন্ন দেশে [illegible] দুই চরিত্রের চিত্র কম-বেশি একই রকম। 'ওরা' দুনিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশের [illegible], [illegible] বিভিন্ন শক্তি-যুক্তির প্রতিরোধ, এবং জনতার ও নিজেদের অধিকার নিয়ে [illegible] কিছু সংবেদনশীল মানুষ ও সংগঠন। কিন্তু এদের [illegible] সংগঠিত হও না সেভাবে। বর্তমান বিভাগে [illegible] একটি কাহিনী প্রকাশিত হবে।

— স. ম.

৮

ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারের কাছে একটি নিউক্লিয়ার মিসাইল উৎক্ষেপণের ঘাঁটি ছিল; এখান থেকেই প্রথম আমেরিকান ক্রুইজ (cruise) মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয়। এই বার্কশায়ারে ঘিরে নিউক্লিয়ার বিরোধী এক বিশাল আন্দোলন গড়ে ওঠে মহিলাদের নেতৃত্বে। গ্রীনহাম কমন অঞ্চলের মহিলারা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই ঘাঁটিটির চারপাশে অবস্থান চালিয়ে যান! এই অবস্থানের ফলে সারা ইংল্যান্ডে বহুদিন ধরে নিউক্লিয়ার শক্তিবিরোধী আন্দোলন চালু থাকে। এই অবস্থান থেকে যে-সব অভিনব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে একটি ছিল, ১৯৮২ সালে তিন হাজারের বেশি মহিলা এই মিসাইল ঘাঁটির চারপাশে এক বিশাল মানবশৃঙ্খল গড়ে তোলেন। এর পর ১৯৮৩ সালে ৭৫ হাজারের বেশি মহিলা এক মানব-শৃঙ্খল গড়ে তুলে বার্কশায়ারের গ্রীনহাম মিসাইল ঘাঁটি থেকে শুরু করে বার্কশায়ারের অন্য প্রান্তের একটি মিসাইল ঘাঁটি পর্যন্ত প্রসারিত করে দেন।

সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এই অবস্থানে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সর্বদাই হেনস্তা হতে হয়েছে। সরকারি কর্মীরা তো বটেই, দিনের পর দিন সেনাবাহিনীর সৈন্য, এমনকি স্থানীয় কিছু মানুষজনও, এই অবস্থান বানচাল করার জন্য সর্বতো উপায়ে সচেষ্ট ছিল। অবস্থানকারীদের অপমান করা, রাত্রিবেলায় হঠাৎ আক্রমণ করা, শারীরিক বলপ্রয়োগ, ইত্যাদি রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি ঘটনায় একটি বড় গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে একটি তাঁবু বিদীর্ণ করে চলে যায়, সেই তাঁবুতে কিছু মহিলা ঘুমোচ্ছিলেন — আশ্চর্যভাবে তাঁরা বেঁচে যান।

সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে হিল্ডা মারেলের হত্যার (উৎস মানুষ, ডিসেম্বর, '৯৪, পৃ. ৩৩১) ঠিক ১ মাস পরে, ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে। গ্রীনহাম কমন-এ অবস্থানকারী একজন অহিংস প্রতিবাদকারী মিসেস সেইন্‌স্‌বোরিকে গাড়ি করে পৌঁছে দেবার আশ্বাস জানান একজন স্থানীয় ব্যক্তি। পরে শ্রীমতী সেইন্‌স্‌বোরিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় — নির্মম প্রহারের ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর

এক অসহায় মৃত্যুর কাহিনী [১৬ পাতার পর]

করতে লাগল। খাবার এবং পানীয় দুটোই সমান তালে চলছে। ব্যাপারটাকে আরও জোরদার করতে ওবোলার বাবা একটা মদের ড্রাম কিনে নিয়ে এল। উৎসবের দিনেই ওবোলার অবস্থার প্রচণ্ড অবনতি হতে থাকল। যা খাচ্ছে তাই বমি করছে। 'ডিহাইড্রেশন'-এর ভয়ে আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা আবার বললাম। কিন্তু উৎসবের ফুর্তি তখন তুঙ্গে। ওবোলার বাবা তিন দুপুরে মাতাল হলো। সেই অবস্থায় ওরা পরদিন মেয়েকে হাসপাতালে নেবে বলে স্থির করল। তবে রোগীরা হাসপাতালে কারখানার বাইরের নাগরিকদের জন্য জমা দিতে হয় যে টাকা, তারও চিন্তা রইল।

ওবোলার শরীরের জলশূন্যতা রোধ করবার জন্য আমরা এক লিটার 'স্যালাইন' তৈরি করে ওবোলার মা-কে বললাম খানিকক্ষণ বাদে বাদে এক চামচ করে খাইয়ে দিতে। ওবোলার বাবা নিশ্চিন্তে আনন্দের আসরে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি আগের দিনের তৈরি 'স্যালাইন' সম্পূর্ণটাই খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, ধুলো আর মাছিতে ভরপুর। ওকে এক চামচও খাওয়ানো হয় নি। বাড়ির লোকেরা বলল, 'কি হবে খাইয়ে? যা মুখে দেওয়া হচ্ছে তাই তো বমি হয়ে যাচ্ছে!'

অবশেষে সকাল ১০-৩০টায় ওবোলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বেলা ২টোয় সে মারা যায়।

ওবোলা মহামাতো নামের আট বছরের রোগা মেয়েটার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর কারণ — সরকারি ডাক্তারদের ওপর কোনো রকম ভরসা রাখতে পারে নি ওরা; মৃত্যুর কারণ — দরিদ্র বলে সামান্য 'কাশি'র অজুহাত দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নি ওকে; মৃত্যুর কারণ — ডাক্তাররা হাসপাতালের বদলে তাদের নিজের নিজের প্রাইভেট ক্লিনিকে বসেছিল, মৃত্যুর কারণ — মেয়েটির প্রতি কোনো নজর দিতে পারে নি ওর বাবা-মা; মৃত্যুর কারণ — নিজের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সাধারণ মানুষের চরম অজ্ঞতা; মৃত্যুর কারণ — আমাদের মতো শিক্ষিত জনের প্রতি ওদের বিশ্বাস আস্থা এতই কম যে, আমাদের সাবধান বাণীতে ওরা কর্ণপাত করে নি; মৃত্যুর কারণ — ওরা এতই গরিব ছিল যে হাসপাতালে ভর্তির টাকাটা সংগ্রহ করা কষ্টকর ছিল;...। তাই ওবোলা মহামাতো মারা গিয়েছিল — এতদিন প্রতিকূলতার মধ্যে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ তার ছিল না।

অনুবাদ : [illegible] ঘোষ

আগে তাকে এক বার ধর্ষণও করা হয়।

ডিক্তা ম্যুয়েলের ঘটনার মতো স্টেন্সেন্ডারন-এর মৃত্যু প্রসঙ্গের আজও কিনারা হয় নি — ম্যুয়েলের মতো এই মৃত্যুও রাজনৈতিক কারণেই ঘটেছিল। সরকার এবং আইন ব্যবস্থা ক্রমাগত এই ঘটনাটি সম্পর্কে ধামা চাপা দিয়ে গেছে। সরকার এমনকি স্থানীয় অধিবাসীদেরও এই অবস্থানের বিরুদ্ধে উসকে দেবার যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং তাতে অনেকটাই সফল হয়েছে।

এর চার বছর আগে ১৯৮০ সালে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, ফিলিপাইন্সে, একটি বিতর্কিত নিউক্লিয় চুল্লি বসানো নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ফিলিপাইন্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মার্কোস এই নিউক্লিয় চুল্লিটি বসানোর প্রস্তুতি নেন। (অন্যান্য অনেক প্রকল্পের মতো, এই কেনাবেচা থেকে প্রেসিডেন্ট মার্কোস অনেক টাকা হাতিয়ে নেন বলে পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে)। চুল্লিটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যায় এবং তা বসানোর জন্য স্থান নির্বাচন করা হয় ফিলিপাইন্সের এক [illegible] উপকূল বাতান (Bataan)-এ। কিন্তু বাতান-এ, যে পাহাড়ের কোলে এই চুল্লিটি বসে, সেই পাহাড়টি আসলে একটি আগ্নেয়গিরি — এই আগ্নেয়গিরি থেকে এখনও প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত হয়! তাছাড়া অঞ্চলটি, আমাদের নরোরা নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্রের মতো, পৃথিবীর সবচেয়ে ভূকম্পনপ্রবণ এলাকার মধ্যে পড়ে।

‘Concerned Citizens of Bataan’ নামে নাগরিকদের একটি সংস্থা গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ আইনানুগ পদ্ধতিতে — এই সংস্থার কাজ ছিল চুল্লির বিপজ্জনক বিকিরণ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করে এই চুল্লি বন্ধ করার চেষ্টা করা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মার্কোসের প্রত্যক্ষ নির্দেশে পুলিশ এই সংস্থার সভ্যদের ওপর অত্যাচার চালায়। এমনকি এই সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেলায় অপ্রয়োজনীয় হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়। এই হিংসা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় যখন 'জিজ্ঞাসাবাদের' জন্য দু-জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় এবং গুলি করে হত্যা করে।

নিউক্লিয় চুল্লির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত প্রতিবাদী ব্যক্তিদের মৃত্যুর ঘটনায় বেশ সাদৃশ্য আছে — তাঁরা সাধারণত মারা গেছেন মিছিলে হাঁটার সময় পুলিশের গুলিতে। ১৯৮২ সালে দু-টি বিভিন্ন ঘটনায় জার্মানি ও জাপানে নিউক্লিয় চুল্লি-বিরোধী মিছিলের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পুলিশের গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে অবশ্য মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু মিছিল ছত্রভঙ্গ হবার মূল্য দেন বেশ কিছু মানুষ তাঁদের মূল্যবান প্রাণের বিনিময়ে। ১৯৮৬ সালে জার্মানিতে একজন প্রতিবাদী মৃত্যু বরণ করেন — তিনি ব্যাভারিয়াতে জার্মানির প্রথম নিউক্লিয় বর্জ্য-পদার্থ পুনর্ব্যবহারের একটি কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।

নিউক্লিয় শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার সমালোচনাও কিন্তু মানুষের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোনো বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে না — এমনকি তাদের বিক্ষোভ আন্দোলনের কর্মসূচীতে কোথাও প্রশাসনকে হিংসার আশ্রয় নেবার জন্য উস্কানি দেওয়া হয় না — তবুও বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর মিছিল দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। কয়েকটি বিখ্যাত নিউক্লিয় বিরোধী আন্দোলনের বিক্ষোভ-প্রতিবাদের রীতি বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট হবে।

বেশিরভাগ নিউক্লিয়-বিরোধী আন্দোলনকারীই আইন-অমান্যকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেই বেশি আগ্রহী কেন না তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হলো নিউক্লিয় চুল্লি সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার ক্ষতিকর দিকগুলি মানুষজনের সামনে আনা। তারা সাধারণত নিউক্লিয় চুল্লির চারপাশের বেড়ার একটি তার হয়ত কেটে দিয়ে গ্রেফতার বরণ করেন — নিউক্লিয় চুল্লি উড়িয়ে দেবার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করেন না। এ যাবৎকাল দেখা গেছে, প্রতিটি চুল্লির দুর্ঘটনার জন্য বাস্তবজ্ঞানহীনভাবে হয় অজ্ঞাত নাম দিয়ে নতুবা নিউক্লিয়-বিরোধী শক্তিগুলিকে দায়ী করা হচ্ছে।

[সূত্র: David Day-র *The Eco Wars* বই।]

৯

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। মালায়লাম দৈনিক, মাতৃভূমি পত্রিকায় অধ্যাপক আর. ভি. জি. মেননের একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. পি. কে. আয়েঙ্গারের কিছু মতবাদকে খণ্ডন করে। মেননের মতে, কেরলে নিউক্লিয় শক্তিকেন্দ্র বসানোর যুক্তি হিসেবে আয়েঙ্গার যে-সব তথ্য দিয়েছেন তা অপ্রমাণিত অথবা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।…এই চিঠি প্রকাশিত হবার পর থেকে অধ্যাপক মেননের জীবনে একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁকে Agency for Non-Conventional Energy & Rural Technology (ANERT)-এর অধ্যক্ষ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং তাঁকে তাঁর আগের কর্মস্থল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। এই তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হলো ওই সময় কেরলে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের একটি তিন-সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল কেরলে প্রস্তাবিত নিউক্লিয় শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের জন্য আসছিলেন। অধ্যাপক মেনন, কেরলের মতো ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যে নিউক্লিয় শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর পদচ্যুতির পেছনে সরকারি যুক্তি ছিল এই যে, সরকারি কর্মচারি হিসেবে দৈনিক পত্রিকাতে চিঠি লেখার আগে তাঁর সরকারি অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। এ-ব্যাপারটি যে প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে ঘটেছে তা সন্দেহ করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমত চিঠি প্রকাশিত হবার দীর্ঘ পাঁচ মাস পর সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং ঠিক এমন সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যখন নিউক্লিয় শক্তিকেন্দ্র বসানোর স্থান-নির্বাচন সমাপ্ত। এই ঘটনায় সরকার কেবল বিরোধী মতের প্রতি অসহিষ্ণুতাই প্রকাশ করে নি, প্রকারান্তরে দেশের বিজ্ঞানীকুলকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে। সরকারের এই মনোভাব থেকে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে সরকারি বিশেষজ্ঞ নির্বাচনের মানদণ্ড হিসেবে বিজ্ঞানীদের পেশাগত দক্ষতা, যোগ্যতা ইত্যাদি বিচার্য হবে না — পরিবর্তে সরকারের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যই বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে প্রাধান্য পাবে।

[সূত্র: '[illegible]' ও *The Statesman* পত্রিকা।]

সংকলন ও অনুবাদ : শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

মাধবীর অধিকার নিয়ে

চিত্তবিদ

মনে করতে পারছি এই ভদ্রলোকই একদিন এসেছিলেন তাঁর ভাবী জামাই-এর ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। সেই ছেলেটি নাকি এখানে চিকিৎসা করিয়েছে। তাই মেয়ের বিয়ে দেবার আগে তিনি জানতে চান ভাবী জামাই-এর ঠিক কী মনের রোগ ছিল।

মস্ত চওড়া মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ আর মোটা ফ্রেমের চশমা। উনি মফস্সল থেকেই পড়ান। সামনের চেয়ারে বসে কোনো ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'অভিজিৎ মিত্র নামে একটি ছেলে আপনার কাছে চিকিৎসা করিয়েছিল। ঠিক কিসের জন্য ও চিকিৎসা করিয়েছিল জানতে পারলে আমার সুবিধা হয়।' কোনোরকম পূর্বপরিচয় ছাড়া এই ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি থাকে না, তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে ঠিক চিনলাম না। আপনি কি অভিজিতের কেউ হন?' ভদ্রলোক বললেন না— 'আমার মেয়ের সাথে ওর বিয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে। কানাঘুষো শুনলাম ও নাকি মানসিকভাবে অসুস্থ এবং এখানে চিকিৎসা করায়। তাই, বুঝতেই পারছেন মেয়ের বাবা, আমার কর্তব্য তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়া।'

'আপনার সাথে কি অভিজিতের বাবা মা কি কেউ এসেছেন, নইলে তার রোগের ব্যাপারে আপনার সাথে কোনো আলোচনা করতে পারব না।' ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর শুধু বললেন 'আপনাকে একটু খুলে বলি। সম্প্রতি আমার বড় মেয়ের সাথে অভিজিৎ মিত্র নামের একটি ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। আমার মেয়ে একটি স্কুলে পড়ায়. ছেলেটিও একটি সরকারি সংস্থার ড্রাফটসম্যান। ওর বাবাও সম্পর্কে আমার গুরুভাই হন। শুনেছি ওর নাকি মাথার গোলমাল হয়েছিল এবং আপনার কাছে চিকিৎসা হয়েছিল।' তাকে থামিয়ে বললাম, 'আমি সবকিছুই বুঝতে পারছি এখানে আপনি কেন এসেছেন। কিন্তু রোগী সম্পর্কে কিছু বলা তো আমাদের নিয়ম নেই।' উনি অসহিষ্ণু হয়ে জানতে চাইলেন, 'তাহলে মেয়ের বাবা হয়ে আমার জানার অধিকার নেই।' 'হ্যাঁ অধিকার আপনার আছে, কিন্তু তা হবে রোগীর সামনে বা রোগীর বাড়ির লোকের সামনে। আপনাকে আমি কিছুই বলব না।' কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করে ভদ্রলোক হাল ছেড়ে উঠে পড়লেন, 'এ আপনাদের কী রকমের রীতিনীতি জানি না, তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক না। যদি তার বাড়ির লোক আমার সাথে এখানে আসতে না চায় তাহলে আমি কোনোদিনই জানতে পারব না আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে!'

তারপর আর কেউ আসে নি। ভুলে গেছি ওদের কথা। হঠাৎ বছরখানেক পর এক নিরালা সন্ধ্যায় এক বন্ধু এসে হাজির। মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে একটা প্রেসক্রিপশন বার করে তুলে ধরল। সেই অভিজিৎ মিত্র। বাকী কথাগুলো সব মনে পড়ে গেল। তবে এর আগেও একদিন নাকি এসেছিল তারা, কিন্তু শেষে ধৈর্য রাখতে পারে নি। কিছুক্ষণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এখনো বা থেকে নতুন কিছুর খবর মুখে দাও নি। ছেলেটির হাবভাবে ভাবটা এখনও আছে। মেয়েটি চুপচাপ চুপচাপ বসে রইল।

মনের রোগ মানুষকে নিয়ে যে কি বিচিত্র খেলা করে অভিজিৎ তার একটি উদাহরণ। সাঁতারের রোগ নিয়ে ও অনেক দূরে উঠে এসেছে। একার বোঝার জোয়ারে ধরা পড়ে। ছেলেবেলা থেকে তার অদ্ভুত সন্দেহ প্রকৃতির জন্য কখনও চিকিৎসকের কাছে আসার কথা ওদের মনে হয় নি। কেন না তার বাবা মা কি আত্মীয়-স্বজন তার এই প্রকৃতিকে স্বাভাবিক বলে ভেবে মেনে নিয়েছেন। ও ছিল ঘরকুনো, ওর কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না, ছিল অস্বাভাবিক ভয়, দুশ্চিন্তার সুপ্ত পরিবর্তন করতে হয়েছে। এজন্য দু-তিনটে বারও নষ্ট হয়েছে। এক একটা সময় ওর এমনও গেছে যে, ওর নাগাড়ে দেড়-দুমাস ঘরের মধ্যে ও স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিল। কিন্তু এই সমস্ত মানসিক গোলমাল সে সামলে নিয়েছে। তিন বছরের ড্রাফটসম্যান কোর্সের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় সে পাশ করেছে, সরকারি চাকরি নিয়েছে। বলা যায়, নিজের স্বাধীন জীবনযাপন শুরু করেছে।

কিন্তু বর্তমান দৈনন্দিন, পরীক্ষা আর একা একা পড়াশোনার জন্যে ছিল ততদিন কোনোক্রমে মানিয়ে নিয়েছে। সমস্যা শুরু হয়েছে নতুন করে চাকরি করতে গিয়ে। ওর প্রথম পোস্টিং ছিল মহাজনপদ। সেখানকার কাজের পরিবেশ ও মানিয়ে নিতে পারে নি। ছ-মাসের মধ্যে স্বাস্থ্যের কারণ কর্তৃপক্ষই চেষ্টা করে ওকে আসানসোলে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তখনও চিকিৎসার কথা কেউ ভাবে নি। ওকে ঠাট্টা করে দুটো কথা বললেও ও সন্দেহ করেছে, অভিমান করেছে। ওর ধারণা ওর বিরুদ্ধে সবাই চক্রান্ত করছে। ও খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে মেসে, পাছে খাবারে কেউ বিষ মিশিয়ে দেয়। এইসব ভাবি ওর সহজ জীবনযাপনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ওর বন্ধুরা সহানুভূতিশীল না হলে ও আরও বিপদে পড়ত কেউ।

ওর সমস্যা বাড়ল আসানসোলে গিয়ে, যার জন্য ওর মা বাবা হলেন ওকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসতে। ওখানে এক মধ্য বিবাহিতা বিধবা হয়ে স্বামীর জায়গায় চাকরিতে ঢোকে। তাকে ঘিরে ও নানান মিথ্যা কল্পনা গড়ে তুলতে থাকে। এই নিয়ে দু-চারজনকে বলতেই কথাটা কানাকানি হলো এবং শেষে বড়সাহেবের কানে পৌঁছাল। তিনি ওকে ডেকে এমন দিলেন যেন না ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ একপেশে, মেয়েটি কিছুই জানত না। সাহেবের ধমক খেয়ে ওর রাগ, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা সব বেড়ে গেল।

ও উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করল। প্রকাশ্যে চিৎকার করত — মায়ের ভাইয়ের এই ভালোবাসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করেছে, মায়েরকে সে খুন করবে ইত্যাদি। ফলে তার সহকর্মীরা তাকে চিকিৎসার জন্য বাবা মায়ের কাছে দিয়ে গেল। এসব প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। ও চিকিৎসাতেও ছিল অনিয়মিত।

শেষে দিকে ও একাই আসত এবং অনেকখানি সুস্থ হয়েছিল। হঠাৎ একদিন বলল ও বিয়ে করতে চায়, বাড়িতেও দেখাশোনা চলছে। ওর মাকে পরামর্শ দিলাম, যেখানেই বিয়ে দেবেন, বলে-কয়ে দেবেন, কেন না বিয়ের পরেও ওর চিকিৎসা করাতে হবে, তখন স্ত্রী জানতে পারলে বা তার বাড়ির লোক জানতে পারলে অনর্থ বাধবে। জন্য ভাবেও ওষুধ ঠেকানো হয়েছে। তাছাড়া বিয়ে একটা আলাদা চাপ আছে, তার জন্যেও ভেঙে পড়তে পারে।'

ওদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বিয়ের আগে কী কথা হয়েছে জানবার উপায় নেই। কেন না ছেলেটি বলল তার বাবা-মা নাকি বলেছিল ওর অসুখের কথা। মেয়েটি অর্থাৎ মাধবী বলতে শুরু করে, 'না, তেমন কিছুই বলে নি। বলেছিল ও একটু নার্ভাস থাকে তাই আপনার কাছে ওর চিকিৎসা হয়েছিল। বাবা আপনার কাছে এসেছিলেন কিন্তু আপনি ওকে কিছু বলেন নি। বিয়ের পর আমার অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর।'

অর্জিত কোনো কিছুই স্বীকার করতে চায় না। তার কোনো সমস্যাই হয় নি। অন্যায়ভাবে তার স্ত্রী তার ওপর অভিযোগ করছে। তার বাপের বাড়ির ওপর খুবই টান। ও সেখানেই বেশি থাকতে পছন্দ করে। ওকে বাইরে রেখে মাধবীর কথা শুনলাম।

বিয়ের ফুলশয্যার রাত থেকেই মাধবী বিভ্রান্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে ওর অস্বাভাবিক আচরণে। মাধবী বুঝতে পারে অর্জিত অসুস্থ। ও হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে চেঁচাতে শুরু করে। এমনভাবে মাধবীর হাত-পা ধরে কান্না শুরু করে যে, এমনকি মাধবী ভয় পেয়ে যায় — বুঝি বা তার কোনো গুরুতর শারীরিক গোলযোগ হয়েছে। একই কথা বারবার বলতে থাকে — মাধবী যেন ওকে ছেড়ে না যায়। শুরু হয় মাধবীর বোঝার ও বোঝানোর পালা।

মাঝে মাঝে ও বেশ সুস্থ থাকে আত্ম-পরিজন মানুষের মতো। তখন দিনগুলি কোনোরকমে কাটে, কিন্তু ছেলেমানুষী ভাবটা থাকেই। নিমন্ত্রণ বেড়াতে গিয়ে অসম্ভব অবস্থা তৈরি করল। সকলের ভয়, রাস্তার লোক দেখে, পাড়া পড়শি দেখে, পুলিশ দেখে — সবাই যেন ওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, ওকে বাঁধে ফেলবার চেষ্টা করছে। প্রথম প্রথম হতভম্ব হলেও মাধবী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ফল হয় নি। তাছাড়া ও শারীরিকভাবেও অক্ষম।

বোঝা যায় অর্জিত স্ত্রীর সামনে লজ্জা পাচ্ছিল তাই প্রথমত বলে চলেছিল তার কোনো অসুখ নেই, কোনো অসুবিধা নেই, তার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করছে। ওকে বুঝিয়ে বলায়, স্ত্রীর কথা শুনবেন। ওর কাছে চিকিৎসার দায়িত্ব দিলাম। ও আপনাকে সাহায্য করবে। বেশী, একগাদা দলে আপনার সমস্যা বাড়বে।' ওরা তখনকার মতো চলে গেল।

তিন সপ্তাহ বাদেই আবার তারা সদলবলে এসে হাজির। এবার ছেলের পক্ষে তার মেসো আর মেয়ের বাবা তো আছেনই। বুঝতে পারলাম অবস্থা আরও জটিল হয়েছে। দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপ — কে কাকে ঠকিয়েছে, কে কোথায় মানিয়ে নিতে পারছে না, এই নিয়ে বিশ্লেষণ চলল। বাধ্য হয়ে বলতে হলো, 'আপনারা কেন এসেছেন?' মেয়ের বাবা বলল, 'জামাইকে চিকিৎসা করতে হবে, ও চিকিৎসা করাতে চায় না। এদিকে আমার মেয়ের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে।' ছেলে বলল, 'আমার কোনো অসুখ নেই আমি কেন চিকিৎসা করাব?' ছেলের মেসো বলল, 'আমি জানতে চাই সত্যি ওর কোনো রোগ আছে কি-না। কেননা বারবার ওরা অভিযোগ করছে ছেলে অসুস্থ। কিন্তু এই সাতদিন আমার বাড়িতে ছিল, আমি কোনো অসুস্থতাই দেখতে পাই নি।' মাধবী চুপ করেছিল। ওকে জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তর দিল, 'দেখুন রোগ আছে কি নেই সেটা আমার চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই কেউ জানে না, কেননা ওকে নিয়ে আমায় থাকতে হয়, ঘর করতে হয়।' মেসো তির্যকভঙ্গিতে বললেন, 'ক-দিন আর ঘর করেছ।' ছেলের বাড়ির অভিযোগ মেয়ে অধিকাংশ সময়ই বাপের বাড়িতে থাকে। তাই সে যে দোষারোপ করছে সেটা তার মানায় না। মেয়ে মোটেই শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নিতে পারছে না। অথচ ওর ননদ নেই, দেওর নেই — একমাত্র ছেলে। শ্বশুরবাড়ির কোনো সমস্যাই নেই।

এমন এইসব উত্তর প্রত্যুত্তর বিনিময়ের মধ্যে সময় বয়ে চলে, কোনো সমাধানের রাস্তা দেখা যায় না। বাধ্য হয়ে বলতে হয়, 'দেখুন আপনারা নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনাটা সেরে এখানে আসুন। কারণ আপনাদের পারস্পরিক দোষ ও কথা দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই।' ওঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরে গেলেন এবং কিছু পরে সমবেত হয়ে ফিরলেন — ছেলের চিকিৎসা হোক এটা ওঁরা চান। যেহেতু ছেলে ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে এখন স্ত্রীর কথাও শোনে না, তাই ছেলের মেসো দায়িত্ব নিলেন ওষুধ খাওয়াবে। মেসোকে আলাদা করে ডেকে বলে দিলাম, 'ছেলে সত্যিই অসুস্থ, ওকে ঠিকমতো ওষুধ খাওয়াবেন, এটাতে মর্যাদার লড়াই হিসাবে দেখলে ভুল করবেন।'

এরও পাঁচ ছ-সপ্তাহ পর একদিন মাধবী তার বাবাকে নিয়ে হাজির, সে সার্টিফিকেট চায় ডিভোর্সের মামলার জন্য। তাকে সার্টিফিকেট দিলেই তা আদালতে রোগীর বিরুদ্ধে যাবে এবং বিচারক রায় দেবেন যে এই বিয়ে আর আইনত সিদ্ধ নয়। অথচ বহুক্ষেত্রে বিয়ের পর এমন গোলমালের মধ্যে পড়াটা যে-কোনো মেয়ের কাছেই দুর্ভাগ্যজনক, কেন না তাকে সারাজীবন এই বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। তাই তার প্রতি সহানুভূতিতে একাত্মবোধ করাই যায় কিন্তু বিষয়টা চিকিৎসকের নীতিবিরুদ্ধ হয়ে না তো!

মাধবী দীর্ঘাঙ্গী, শ্যামলা, প্রাণচঞ্চলা, সহজ স্বাভাবিক আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো। বাড়ির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো, সেও একটা স্কুলে

মাস্টারি করে সুতরাং স্বাধীনচেতা হওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসে, 'আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই অবস্থায় পড়লে আপনি তাকে কী পরামর্শ দিতেন? আপনি আমায় যেমন ভাবতে পারলেই আমার কথা আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।' কথা প্রসঙ্গে সে আগের দিনের অসমাপ্ত আলোচনার জেরটা অবশ্য মনে করিয়ে দিল, 'আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার ছেলেমেয়ের এমন রোগ হতে পারে কি-না। তাছাড়া ও কতদিন অসুস্থ থাকবে, সত্যিই ও কোনোদিন সুস্থ হবে কি-না, ওর পুরুষত্ব যা এখন নেই বললেই চলে তা কোনোদিন ফিরে আসবে কি-না, ও স্বাভাবিক আর পাঁচজনের মতো সংসার করতে পারবে কি না— এইসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি কিছুই জানি না।' এর কোনো উত্তর না দিয়ে ওকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করি, 'আপনার কি মনে হয় ডিভোর্স করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?'

মাধবী মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর অন্যমনস্ক হয়ে বলে গেল, 'তাও আমি ঠিক জানি না। হয়তো সারা জীবন আর আমার বিয়েই হবে না। হয়তো আবার যেখানে সম্পর্ক হলো সেখানে আরও দুর্দশার মধ্যে পড়লাম। হয়তো আবার কোথাও ঠকে গেলাম। কিন্তু একটা সুযোগ আমায় নিতেই হবে। সব জেনে শুনে এভাবে আমি হাল ছেড়ে দিতে পারব না।' 'আরও একটা প্রশ্ন চলে আসে। ধরুন এই মামলা আরও পাঁচ বছর চলল। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে ওরা অত সহজে ডিভোর্স দেবে না। সেখানে আপনার বিয়ে আরও পাঁচ বছর পেছোচ্ছে।' যেন কথাটা লুফে নিয়ে সে বলে উঠল, 'ঐ জন্যেই তো আপনার জোরালো সার্টিফিকেট চাই। আপনার সার্টিফিকেটে যদি লেখা থাকে যা আমার উকিল বলে দিয়েছেন। যেমন, ওর সিজোফ্রেনিয়া আছে, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি, ওকে সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে, এর ফলাফল অনিশ্চিত, ওর যৌনক্ষমতা নেই —তাহলে আমার কাজটা সহজ হয়ে যায়।' মৃদু হেসে বললাম, 'আপনি আমার জায়গায় থাকলে কি এইরকম করতে পারতেন?' সে একটুও সংকোচ বোধ না করে বলে উঠল, 'আমি কি খুব অন্যায় দাবি করছি – আপনাদের কাছে এইটুকু সাহায্য আমি পাব না।' তাকে বুঝিয়ে বলি, 'তাহলে যে এখানে চিকিৎসা করাতে এসেছিল, যার সাথে আমার চুক্তি হয়েছিল, তার অনুমতি ছাড়া তার বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো কাজ করব না, সেই চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে সে কি আমার বিরুদ্ধে করবে না?'

মাধবী নড়েচড়ে বসল, 'আপনার নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে আপনাকে নিশ্চয়ই কিছু করতে বলব না। সে দাবি আমার করা উচিতও নয়। আমি জানি আমার লড়াই আমাকেই করতে হবে। শুধু আপনাদের একটু সাহায্য চেয়েছিলাম যাতে আমার কষ্ট একটু কমে।'

মাঝে মাঝে এমন সমস্যায় সব চিকিৎসককেই পড়তে হয়, বিশেষত তাকে যখন বিচারের কাজে ব্যবহার করা হয়। ছেলেটির অসুস্থতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে সুস্থ থাকতে হলে ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসা ও পরিচর্যা তাকে পেতে হবে। মাধবীর কথা প্রথমেই যে, সে তার সাধ্যমতো চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছেলেটি ও তার পরিবারের অসহযোগিতার জন্য সে সফল হয় নি। কাজেই সে সারা জীবন এই বোঝা বয়ে বেড়াবে কেন? আলাপ টেনে নিলাম, যদি মাধবী প্রসন্ন হলো। বললাম, 'দেখুন আবার একবার ভেবে। আপনি হয়তো ডিভোর্স পেয়ে গেলেন, কিন্তু তার জন্য ছেলেটি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে না তো!' মনে হলো মাধবী যেন প্রস্তুত ছিল, 'সেটা ঠিক বলতে পারব না। আমি সত্যি কথাই বলছি। ও যখন প্রথম আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদত এই বলে যে, আমায় ছেড়ে ও বাঁচতে পারবে না, আমি যেন থমকে যেতাম। ওকে সান্ত্বনা দিতাম। মনের মধ্যে একটা সফ্ট কর্নারও তৈরি হয়েছিল। তার জন্যেই সন্দেহ ও যখন উপদ্রব করত, মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। এমন এক-একটা দিন গেছে যে, আমার জন্মান্তর মনে হয়েছে, আমি রীতিমতো ভয় পেয়েছি। পরে মনে হয়েছে, ওর যা-কিছুই ঘটুক আমি আর সইতে পারব না। ওর ভালোমন্দ আর আমার বিচারের মধ্যে নেই। আমাকে নিজেকে বাঁচতে হবে। এটাই আমার কাছে এখন প্রধান। অনেক চিন্তা করেছি। শুধু আমার চিন্তাই নয়, পাঁচজনের সাথে কথা বলেছি। সবাই একই কথা বলছেন—এর বোঝা নিয়ে সারা জীবন কাটানো যায় না। তাই ওর ভবিষ্যৎ কি তাই নিয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। হয়তো ও আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। হয়তো ওর আর সারা জীবন বিয়েই হলো না। ও হয়তো আর চাকরি করতে পারল না। কিন্তু আমি এসব ভাবব কেন? ওর এই অবস্থার জন্যে তো আমি দায়ী নই। আমি নিজেকে ওর জন্য উৎসর্গ করতে পারব না। আমার একটাই জীবন। এই জীবনটাকে আমি ওর জন্য নষ্ট করতে পারব না। আপনি নিশ্চয়ই পরামর্শ দেবেন না যে, ওর জন্য আমি নিজেকে বলিদান দিই।'

প্রিয় লেখকদের প্রতি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাগজের একপিঠে ওপরে-নিচে দু-পাশে মার্জিন রেখে লিখুন।
লেখার সঙ্গে আপনার পুরো নাম-ঠিকানা অবশ্যই পাঠাবেন। দুঃখিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

□□

অনুগ্রহ করে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করবেন

গ্রাহকপদ নবীকরণের সময় □ যে কোনো অভিযোগের সময়
পত্রিকার মোড়কে (wrapper) গ্রাহক নম্বর লেখা থাকে প্রতি সংখ্যাতেই

P 8116

এই সংখ্যায় থাকছে 'ইংলিশ না বাংলা মিডিয়াম' নিয়ে আপনাদের নির্বাচিত মতামত। আগামী ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সংখ্যায় থাকবে 'চাকরি ও আপনি' নিয়ে আলোচনা।

১. ইংলিশ না বাংলা মিডিয়াম

আপনার ছেলে কিংবা মেয়েটিকে কোথায় [illegible] স্কুলে ভর্তি করবেন [illegible] আপনিও [illegible] — ইংলিশ মিডিয়াম না বাংলা? [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে [illegible] ভালো। [illegible] ... [illegible] ... [illegible] 'চালি-বাবি-মার্গারেট' [illegible] ... একটু ভেবে দেখা যাক।

কিন্তু সেখানেও কথা আছে। বাংলা স্কুলে পড়লে কি [illegible] ? আর আজকাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো সবই তো [illegible] । [illegible] 'মামার' [illegible] অনেক বাংলা স্কুল (যেমন) কিংবা [illegible] । ...[illegible] তৈরি হবে কি না, [illegible] কি না। সেটা কি ইংলিশ মিডিয়ামে [illegible] বাংলা হয়? নাকি বাংলা স্কুল থেকে [illegible] ভালো?

[illegible] না। বেশ জটিল ব্যাপার। আপনি কি বলেন?

ম তা ম ত

ইংরেজিটা শেখা দরকার ভালোভাবে, সেই সঙ্গে চালাক চতুর 'স্মার্ট'ও হওয়া দরকার (অবশ্যই নিজস্ব নীতিবোধ, আত্মমর্যাদা, বজায় রেখে)। এটা দরকার বর্তমান দুনিয়ার মাথা তুলে বাঁচার জন্য, সুস্থভাবে বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য।

চতুর্দিকে প্রতিযোগিতা। ঘোর প্রতিযোগিতা। শিক্ষিত জনের দৃষ্টিভঙ্গি মানসিকতা পাল্টে দিচ্ছে এই প্রতিযোগিতা, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক পাল্টে দিচ্ছে, কিশোর-কিশোরীরা চাপের মুখে ভারসাম্য হারিয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে যখন-তখন। এরকমই আজকের দুনিয়া, আমাদের সামাজিক পরিবেশ। বড় নির্মম, কঠোর, অমানবিক।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়? পালিয়ে তো বাঁচা যাবে না! বিশেষ করে মধ্যবিত্তের দায় অনেক। এই সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা যখন আমার নেই, সংঘবদ্ধ আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম ইত্যাদি কথাগুলো যখন নেহাৎই বস্তাপচা বুলির মতো হয়ে যাচ্ছে, তখন নিজেকে তো নিজেই বাঁচাতে হবে। বড় হয়ে চাকরি বা কোনো সম্মানজনক পেশা তো দরকার। তখন অবধারিতভাবেই চাকরির প্রতিযোগিতার মধ্যে আমাকে নামতেই হচ্ছে। বর্তমান দুনিয়ার উপযোগী হতেই হবে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে। তখন চলতে-ফিরতে ইংরেজি ছাড়া গতি নেই। বাস্তব কথা বলছি। একটু ভেবে দেখলে আপনিও মানবেন। অবহেলিত পরাজিত জীবন কে চায়? এবং যেহেতু শৈশব থেকেই ভিত্তিটা তৈরি হয় তাই ইংলিশ মিডিয়ামই কাজের হবে বলে মনে করি।

কেবল চাকরি-বাকরি বা আধুনিক পেশার প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়, ইংরেজিতে সড়গড় হওয়ার আরেকটা সুবিধা আছে। আমাদের যাবতীয় প্রতিবেশী আর পশ্চিমের অসাধারণরা ইংরেজি জাননেওয়ালাদের ফালতু চালিয়াতি আর ভণ্ডামির মুখে ঝামা ঘষে দেওয়ার জন্যও ইংরেজিটা অনায়াস আয়ত্তে থাকা ভালো। এতে চালিয়াতদের মোকাবিলা করা যায়, তথা 'আধুনিক'-দের কাছে হীনমন্যতা আসে না।

বড় কথা হলো, ইংরেজি মিডিয়ামে শিক্ষিত হলেই বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি ভুলে যেতে হয় না; ওটা নিজের ব্যাপার, বাংলার প্রতি নিজস্ব পরিবারের পূর্ণ চর্চা-আলোচনায় থাকার ব্যাপার। ইংরেজি একটু বেশি জানলেও, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বাংলার চর্চা, বাংলার প্রতি প্রীতি, ইচ্ছে থাকলেই বজায় রাখা যায়।

অঞ্জন সরকার
সল্টলেক, কলকাতা

[illegible]

প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা।। চারিদিকে রাত-দিন প্রতিযোগিতার দরজাটা খুলিল। সবার

পরীক্ষা-যন্ত্রে প্রতিযোগিতায় নামাবার। আমাদের ভাষা আন্দোলন—প্রথম কম্পিটিশনের মধ্যে আমরা জন্ম নিয়েছি। আজকের প্রজন্মের মধ্যে কোন কম্পিটিশন নামক আর একটি রাক্ষসী বাসা বেঁধেছে যার ইংরেজি নাম 'কম্পিটিশন্‌ ব্রান্ড ক্যাপসুলস্‌' সংক্ষেপে সি বি সি। হাজার হাজার মানুষ প্রাণীর মধ্যে হতে হবে যোগ্য একজন। খাদ চলবে না। নিখাদ সোনার আকবরী মোহর হতে হবে। নইলে অতলান্তিক সমুদ্রের উপরে।

বর্তমান প্রগতিশীল যুগে প্রতিযোগিতার রেসে টিকতে, সাফল্যের দড়ি ছুঁতে ইংরেজি জানাটা—অপ্রত্যাশিতভাবে মঙ্গল (বাধ্যতামূলক) হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাকরির বাজারে, আজকের দিনে কে কতটা ইংরেজি জানে, তার-ই প্রতিযোগিতার লড়াই চলছে—স্কুলে মোটেই অস্থায়ি হবে না। ইংরেজি না জানলে সম্পূর্ণ হয় না, বলে বোধ হয়। তাই যদি, ইংরেজিতে 'আপনাকে' তুখোড় হতে হলে ইংলিশ মিডিয়ামে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু বাংলা ভাষাকে একেবারে গলাটিপে হত্যা করে নয়। মাতৃভাষা বাংলাকে জানতে হবেই—পাশাপাশি। বলতে পারি, একটি ডালে দুটি সবুজ পাতা না থাকলে যেমন কোনো ফুলকে মানায় না, ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হয়, তেমনি স্বদেশ ভাষাতে ইংরেজির পাশে বাংলাভাষা না থাকলে কেমন যেন অসম্পূর্ণের মতো মনে লাগে। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে জানতে বাংলা সাহিত্য জানা সেজন্য সকলেরই প্রয়োজন। আমরা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি'—কি ভুলে যাবো?—ভুললে চলবে না!

আনোয়ার আলী শেখ
পলাশী, নদীয়া

□□

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কোন্‌ মাধ্যমে পড়ানো দরকার এবং আসলে কোন্‌ মাধ্যমে পড়ানো উচিত এ দুটো ব্যাপার এক নয়। অবস্থার কথা বললে বাস্তব পরিস্থিতির আলোচনা এসে যায়। আবার উচিত-অনুচিতের কথা বিচার করতে বসলে সে এক দীর্ঘ আলোচনা, বর্তমান লেখায় সে সুযোগ নেই। আমি যেটা বলতে চাই তা হলো, শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' জাতীয় একটি শব্দের উত্তরে এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

নবীন শিক্ষার্থীর কাছে মাধ্যমের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো শিক্ষণীয় বিষয়। বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো মাধ্যম যদি শিশুকে ঠিকমতো শিক্ষিত করে তুলতে পারে তবে মাধ্যমের জন্য কিছু এসে যায় না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—বাংলা মাধ্যমের সবাই যেমন বাংলায় দক্ষ হয়ে ওঠে না, ইংরেজী মাধ্যমের সকলে তেমনি ইংরেজিতে দক্ষ হবেই এমন গ্যারান্টি কি দেওয়া যায়? আসল কথা হলো, শিক্ষণীয় বিষয় শিশুদের কাছে কিভাবে শেখার উপযোগী করে উপস্থাপিত করা হচ্ছে সেটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাই মাধ্যম হিসেবে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভালো এ-প্রশ্নের মধ্যেই অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি সুবিধে হয় এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। অবশ্য এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে চাকরির মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষক ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নন। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ গড়গড় করে ইংরেজিতে কথা বলে যাওয়াই যদি চাকরি পাওয়ার একমাত্র উপায় হতো তবে 'স্পোকেন ইংলিশ' ডিপ্লোমা কোর্সের সমস্ত সফল ছাত্রছাত্রী একবারের চেষ্টাতেই ভালো ভালো চাকরি পেয়ে যেত। তা কিন্তু হয় না। একজন চাকরি প্রার্থীর কথাবার্তা অগোছালো, অসংলগ্ন আর অসতর্ক হলে সে ইংরেজি মাধ্যমের হলেও পরীক্ষককে আদৌ কোনোরকমভাবে impress করতে পারে না।

এতক্ষণ তো সর্ষের প্রকারভেদ অর্থাৎ সাদা সর্ষে না কালো সর্ষে এই বিতর্ক বর্ণনা করা গেল। কিন্তু যদি সব সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকে তবে তো সর্ষে থেকে আর ভূত তাড়ানো যায় না কেন খাঁটি সর্ষের তেল পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটের ঢেউ এসে পড়ছে ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো মাধ্যমের শিক্ষাই কি শিশুদের প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করতে চায়? তাহলে আর মাধ্যমের গুণাগুণ বিচারের তাত্ত্বিক আলোচনার কিই বা যৌক্তিকতা থাকে? সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীকে চোখ কান খোলা রেখে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বুঝে নিতে সাহায্য করবে তা একে দু'প্রকার মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে শিক্ষা প্রচলিত Academic শিক্ষাব্যবস্থায় পাওয়া যাবে বলে বর্তমান আলোচকের আদৌ বিশ্বাস হয় না। সুতরাং বাংলা বা ইংরেজী মাধ্যমের কূটতর্ক আসলে আমাদের বিভ্রান্ত করে এবং মূল জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় নিয়ে ফেলে। সচেতন দায়িত্বশীল ব্যক্তিরই উচিত প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা জেনে নিয়ে শিক্ষার্থীদের বাস্তব আগ্রহ জাগিয়ে শিক্ষাদান করা। এ শিক্ষা পারিবারিক স্তরেই দেওয়া উচিত। পরবর্তী সময়ে এর সপক্ষে জনমত গঠন করে এদিকে সামাজিক আন্দোলনের স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। চাকরির জন্য কোন্‌ মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে এটা ভাবতে গেলে ধরে নেওয়া হয় চাকরির বিস্তর সুযোগ আছে। বর্তমান ভারতে এটা তো সবার জানা কথা যে, চাকরির সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এই সুযোগ যখন শূন্যের কাছাকাছি চলে এলে মাধ্যমকেন্দ্রিক বাদানুবাদ কেমন হাস্যকর হয়ে পড়ে না? বাংলা মাধ্যম না কি ইংরেজি মাধ্যম এ বিতর্ক দেখলে মনে হয় আমাদের কোথায় আবর্তের মধ্যে এনে ফেলছে, যেখান থেকে বেরোতে না পারলে সমূহ বিপদ।

প্রদীপ সান্যাল
গড়িয়া, কলকাতা

□□

আজকাল আমরা একটা বিষয় নিয়ে খুবই

চিন্তিত হয়ে পড়ি যে আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা কোন্ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করব ? যেহেতু চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজিতেই প্রতিযোগিতা হয় এবং এই মিডিয়ামকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়, তাই আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে।

আজ চাকরির প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন কাজকর্ম ইংরেজি মাধ্যমেই হয়। এই প্রতিযোগিতায় যদি এগ পেতে হয় তাহলে চাই ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান, শিক্ষা। সেখানে ভাষাটা কোনো বাধা নয়। এটাতো একটা মাধ্যম। আর শিক্ষা, জ্ঞান মাতৃভাষায় (বাংলাভাষা) মাধ্যমে যতটা মানুষ করা সম্ভব অন্য ভাষাতে ততটা নয়। কারণ জন্ম থেকে আমরা এই ভাষার পরিবেশে বড় হয়ে একে সহজভাবে গ্রহণ করে এসেছি। তাই কেন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কাক হয়ে ময়ূর সাজাতে যাবো ?

এখন ইংরেজি শেখা একটা ফ্যাশন। ইংরেজি বলতে পারলেই সবাই নিজেকে স্মার্ট মনে করে। এই যুগের সাথে তাল মেলাতে হলে, এই 'ড্যাডি-মাম্মি-হাই' মার্কা কালচার খুবই প্রয়োজনীয়। তাই অনেক মা-বাবারা, উক্ত সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য বাধ্য হয়েই ছেলেমেয়েদের ইংরেজি স্কুলগুলিতে পাঠান। কিন্তু তার ফল হচ্ছে উল্টো। ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র তোতাপাখির মতো বুলি আওড়াতে শিখেছে কিন্তু জ্ঞান বা শিক্ষা কিছুই অর্জন করে নি। বরং তারা আরো বেশি বেশি করে অপসংস্কৃতির শিকার হয়েছে।

অনেকের ধারণা এই যে, বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলিতে পলিটিক্স ঢুকে পড়েছে এবং তাই এখানে পড়াশুনো কিছুই হয় না। এই ধারণাটা সবসময় ঠিক নয়। কিছু কিছু স্কুল আছে যাতে পড়াশুনোর পরিবেশ বজায় আছে। যে ভালো ছাত্র, যার শেখার আগ্রহ আছে, সে এইসব স্কুলে পড়েই শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে। অন্য যে-কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে কিছুতে কম নয়। প্রতিযোগিতায় তা প্রমাণও দিতে পারবে।

তবে বর্তমানে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতেই শিক্ষার পরিবেশের তারতম্য আর বজায় নেই। তা সে যে মিডিয়ামেরই হোক। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিক্ষকেরাও কেবলমাত্র নিঃস্বার্থে বিদ্যাবিতরণ করার মতো মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কেন না আজ পারিপার্শ্বিক জীবনধারায় যে প্রতিযোগিতা, সেখানে দাঁড়াতে হলে তাকে অর্থোপার্জন করতেই হবে। তাই ছাত্রদের মানুষ করে শিক্ষিত করে তোলার মতো আদর্শবোধ আর নেই। তাই আজ বিদ্যালয়গুলি 'ব্যবসাকেন্দ্রে' পরিণত হয়েছে।

আমরা বিদ্যা অর্জন করে চাকরি করি। চাকরি মানে আজ বেশী ব্যাপক জনগণের কাজে লাগে। ব্যাপক জনগণের কাজে নিজেকে লাগাতে হলে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। যার জন্য তাদের মাতৃভাষাটা জানা একান্ত জরুরি। তা না হলে আমরা কি করেই বা তাদের সমস্যাকে বুঝব এবং কি করেই বা তার সমাধান বাতলে দেব ?

তাই আমার মনে হয় প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্যও আঞ্চলিক মাতৃভাষাকেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

শাকিলা কুমারী
তোতো দ্বী, রাঁচী

। :

শিক্ষা আমাদের সমাজে এক গভীর ক্ষত। স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের প্রত্যাশা আজও পূরণ হয় নি। যাই হোক, আমার ছেলেমেয়েকে কোনোভাবেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করব না, তার কারণ :

১. ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কিছু ইংরেজি শব্দ শেখানো হয়। অনেক সময় ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তা বলে সেটাকে স্মার্ট বা ট্যালেন্ট বলা যায় না। স্মার্টের মাপকাঠি চরিত্রপূর্ণ পরিবেশ মোকাবিলা করে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা।

২. ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের ভালোবাসা পায় না। অভিভাবকের মোড়কে অনেক সময় মানবিক মূল্যবোধগুলি হারিয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের দোষে নয়। ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা-ব্যবস্থা কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করতে শেখায়। ছোটো থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে গাড়ি-বাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের স্বপ্ন এঁকে দেয়। সমাজ বা দেশের সম্পদ ইংলিশ মিডিয়াম থেকে তৈরি হয়েছে বলে শুনি নি।

৩. শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্য। সমগ্র জনসংখ্যার এক শতাংশও এর আওতায় আসতে পারে নি আজও।

যত দিন যাচ্ছে ততই মধ্যবিত্ত সমাজ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ছে। চাকরি নির্ভরশীল শহর-মফস্বলের উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষ ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার কারণে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝোঁক দিচ্ছে। এই স্রোত দিনকে দিন বাড়ছে। এমন শিক্ষা দিতে হবে যে, লেখাপড়া শেষ করেই যেন মোটা মাইনের চাকরি পায়। দুহাতে কামাতে পারে। এই হচ্ছে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা। স্বাধীন দেশের সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার বর্তমানে শিক্ষা আর পাঁচটা জিনিসের মতো পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। পণ্য এই কারণে যে, যেমন তুমি ছেলেমেয়ের পিছনে পুঁজি বিনিয়োগ করবে সেই রকম পুঁজি সুদে-আসলে উঠে আসবে। সোজা কথা, আজকের শিক্ষা জীবনের সার্বিক বিকাশের মাধ্যম নয়, উপার্জনের মাধ্যম। ছেলেকে প্রথমে ইংলিশ মাধ্যম, তারপর ডাক্তারি – নয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা প্রশাসনিক স্তরে পড়াতে পারলে দেখে কে। দুহাতে ইনকাম। দেশ ভেসে যাক কিছু যায় আসে না, টাকার পাহাড়ে থাকব বসে। এই হলো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশ করা ছাত্রদের চিন্তাভাবনা।

পাশাপাশি মেয়েদের ব্যাপারে মধ্যবিত্তদের

ভূমিকা যেহেতু ইংলিশ মিডিয়ামে না দেওয়াই ভালো। কি হবে টাকা ফেলে। ওরা তো পরের বাড়ি চলে যাবে। দাম পর্যন্ত ফিরে পাওয়া যাবে না। মধ্যবিত্তের এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সত্যিই দুঃখজনক।

সেইজন্য আমি আমার ছেলেমেয়েদের সাধারণ সরকারি স্কুল-কলেজে পড়াব। চরম দারিদ্র্য আর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে লেখাপড়া করতে পারলে সব দিক থেকে সচেতন হবে। দেশের অগ্রগতিতে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে।

শম্পা মুখার্জী
বোলপুর, বীরভূম

□

School-এ ছেলেমেয়েদের Admission-এর আগে ভেবে দেখতে হবে বাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশের কথা। অর্থাৎ ইংলিশ মিডিয়াম বা বাংলা মিডিয়াম এটা নির্বাচনের সময় School-পঠন-পাঠন-এর পরিবেশের সাথে বাড়ির সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশটির কথা মাথায় রাখতে হবে! Craze-এর বশে ইংলিশ মিডিয়াম School-এ ভর্তি করে পরে বাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে বাচ্চার ভবিষ্যৎটি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকটা বিশেষ নজর রাখতে হবে।

বাংলা মাধ্যম School-এ পড়াশোনা করেও ভালো ইংরেজি শেখার নমুনা ভূরি ভূরি আছে। আবার ইংরেজি মাধ্যম School-এ পড়ে ভালো ইংরেজি না শেখার নমুনাও বহু আছে। কিন্তু মনে শেখার ইচ্ছা তৈরি করা একটি প্রধান ব্যাপার। সেক্ষেত্রে অবশ্যই দেখতে হবে যাতে শিশু অত্যধিক চাপের মধ্যে না থাকে।

ভালো খাত তৈরি হতে গেলে অবশ্যই ভালো ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শুধু ইংরেজি শেখাটাই কিন্তু মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

ইদানিং সরকারি বাংলা মাধ্যম School-এ ইংরেজি শেখানো হয় তুলনামূলকভাবে উঁচু শ্রেণিতে। যে পদ্ধতিতে শেখানো ইংরেজি শেখানো হয় অর্থাৎ Communicative English, সেটা শেখার জন্য School-গুলিতে প্রকৃতই ঐ পদ্ধতিতে শেখানোর পরিবেশ আছে কিনা, সর্বোপরি সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের নিজ গৃহে অনুরূপ পরিবেশ আছে কিনা, এগুলি School নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত বলে আমার ধারণা। অন্যদিকে, ইংরেজি মাধ্যম School-গুলিতে বাচ্চাদের অত্যধিক চাপের মধ্যে পড়াশোনা শেখানো হয় কিনা এবং ইংরেজি মাধ্যম School-গুলিতে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ব্যাপার-গুলি সাধারণ ঘরের বিভিন্ন পরিবেশ, সমাজের সাথে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলি অবশ্যই বিচার্য বিষয়। মোটের ওপর গৃহ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ School নির্বাচনের মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়।

বিদ্যুৎ বক্সী
[illegible]

□

ইংলিশ না বাংলা মিডিয়াম? — উত্তর দাও: এ-ধরনের একটা সাধারণ বিষয়কে নিয়ে এত লেটোনায় যে কোনো কারণ থাকতে পারে, তা সত্যিই আমাদের জানা নেই। তবে আমাদের ধারণা, এ-ব্যাপারে যাঁদের এত বেশি মাথাব্যথা, যাঁরা বিভ্রান্তিতে পড়ে সমস্যা ঘটে বলে ভাবছেন, তাঁরা বাস্তবেই অসুস্থ। এরাই বাহুল্য, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই কিছু মানুষ আজ এই অদ্ভুত রোগের শিকার।

আচ্ছা বলুন তো, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ার সুযোগ হলেই এবং বাবুদের রেজাল্ট আর ইংরেজিতে তুখোড় কথা বলানো শেখাতে পারলেই কি ওদের চাকরি বাকরি বা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে? ভবিষ্যতের জন্য সেরকম সর্বপ্রকার কোনো ইঙ্গিত আমরা কি আদৌ পাচ্ছি? — মোটেই না। পাশাপাশি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছাত্র-ছাত্রী মানেই প্রতিযোগিতার আসর থেকে সকলের পিছিয়ে যাওয়া — এ যুক্তি কেমন করে মানি। অনেক সময় ঠিক উল্টোটাও কি আমরা ঘটতে দেখি না? তাহলে কেন এই 'ইংলিশ মিডিয়াম' নামক মরীচিকার পিছনে ছোটার এত ব্যর্থ প্রচেষ্টা?

হ্যাঁ, আসল কথাই হলো, আমার ছেলেটা বা মেয়েটা ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ ছোটোবেলা থেকে তারা প্রকৃতই মানুষ হওয়ার সুযোগ বা পরিবেশ পাচ্ছে কিনা, সেটাই মূল বিবেচ্য। অর্থাৎ দৃষ্টিটাকে যদি স্বচ্ছ করে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে ছেলেমেয়েদের অনুকূল করে গড়ে তুলতে পারি, তবে সেটাই হবে একটা বলিষ্ঠ কাজ।

সুতরাং মূলের বড় ব্যাপারটা যদি প্রকৃতই দাঁড়াতে হয়, তবে ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠিয়ে 'সাহেব বাচ্চা' করে তোলার চেয়েও আদর্শকে মাথায় রেখে বাস্তববোধ ও মননশীলতা দিয়ে আমাদের সর্বাংশে বিবেচনা করা উচিত। এবং সেক্ষেত্রে আমার শিশুকন্যা যদি বড় হয়ে বাড়িতে টেলারিং-এর ছোট্ট ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বা আমার ছেলে যদি তবলা কিংবা গানের টিউশনি করে তার সংসারটা চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়, তবে জানব, সেটাই আমাদের কাছে অনেক বেশি পাওয়া। কারণ, ক্ষমতার জোর ও 'অসাধারণ' জীবনের চেয়েও আদর্শ নিয়ে মাথা উঁচু করে স্বচ্ছভাবে বেঁচে থাকাটা আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

চম্পা সানন্দ
[illegible]

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়:

১০. ঈশ্বর বিশ্বাস ও আপনার বিশ্বাস

নির্মলবাবু সৎ, প্রগতিশীল, দয়ালু মানুষ। এককালে বামপন্থী দলের সক্রিয় সমর্থকও ছিলেন, এখন গুটিয়ে গেছেন। চারপাশের অসততা আর দুর্নীতি দেখে মন খারাপ করেন, নিজের মতো বাঁচতে চান। সুযোগ পেলে লোকের উপকারও করেন।

নির্মলবাবু পুজো-আর্চা করেন না, দেব-দেবী মানেন না, কিন্তু ঈশ্বর মানেন। ওঁর কাছে ঈশ্বর কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি নয়, ঈশ্বর এক শক্তির নাম—যে শক্তির ভরসায় মনোবল আসে, সমস্যা-সংকটে শক্তিশালী অবলম্বন খুঁজে পাওয়া যায়। নির্মলবাবু কখনোই মনে করেন না ঈশ্বরই সব করে দেবে; অসুখ-বিসুখে ডাক্তার না দেখিয়ে তিনি কখনো দেবস্থানের ওপর নির্ভর করেন না, কিন্তু বহু অভিজ্ঞতায় পরিণত নির্মলবাবু দেখেছেন এই ঈশ্বর বিশ্বাসে অনেক জোর অনেক শান্তি মেলে। এমনকি তিনি এটাও বলেন যে—ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে অনেক কুকর্ম, অনেক অনাচার চলতে পারে, কিন্তু যাদের দুরভিসন্ধি নেই তারা ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্যই 'পাপকাজ' করতে ভয় পায়, মানুষের প্রতি দয়া-মমতা দেখায়।

আপনি কী বলেন? আপনি কি নির্মলবাবুর সঙ্গে একমত? হলে বা না-হলে—কেন?

একান্ত নিজস্ব মতামতের জন্য এই দপ্তর। অবশ্যই বক্তব্য সহজবোধ্য, সরল ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া চাই। মতামত ৪০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার একমাসের মধ্যে দপ্তরে জমা পড়া চিঠি নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবে। প্রয়োজনবোধে চিঠির অল্পস্বল্প সম্পাদনা করা হতে পারে, কিন্তু পাঠকের মূল বক্তব্যের ওপর কোনোরকম সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না।

পত্রিকাসম্পাদকমণ্ডলী

প্রসঙ্গ। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী

'উৎস মানুষ' অক্টোবর-নভেম্বর '৯৪ সংখ্যায় সুনন্দ সান্যালের প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিরোনামে লেখাটি পড়ে এই বিষয়ে আমার মতামত জানানোর লোভ সামলাতে পারছি না।

১৯৭৮ সালে এই রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর যখন প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া হলো তখন সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে বিতর্কের পক্ষে বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি অশোক মিত্র কমিশনের পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানোর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সুনন্দবাবু আবার নতুন করে বিতর্কটিকে তুলে ধরেছেন এবং চলনসই (Workable) ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানোর পক্ষে তাঁর জোরালো মত প্রকাশ করেছেন। এখানে আমার নিজের চলনসই ইংরেজি শেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে আমার মতামত জানাতে চাই।

সেই ষাটের দশকে যখন আমার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তখন প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি শেখানো হতো কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে, ক্লাশ ওয়ান থেকে ইংরেজি পড়েও আমি চলনসই ইংরেজি তো দূরের কথা একেবারে সাধারণ মানের ইংরেজিটুকুও না শিখে শ্রেফ মুখস্থের দ্বারা কোনোরকমে ইংরেজিতে পাশ করে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা উতরে যাই। এবং তারপর কলেজে উঠে প্রয়োজনের চাপে ও পরিণত বুদ্ধির সাহায্যে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একেবারে গোড়া থেকে গ্রামার বই পড়ে পড়ে ইংরেজি শেখার ভিতটা গড়ে নিই এবং তারপর থেকে আমার চলনসই ইংরেজি শেখার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পশ্চিমবাংলার বারো আনা ছাত্রছাত্রীর অভিজ্ঞতাটা কমবেশি আমারই মতো।

আসলে কোন্ ক্লাশ থেকে ইংরেজি পড়ানো শুরু হবে প্রশ্নটি বোধহয় তা নয়, প্রশ্নটা হলো কিভাবে শেখানো হবে। চলনসই বাংলাভাষাটা আমরা যেভাবে শিখি, যেভাবে 'সমাজ নেতাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শেখার' সুযোগ পায়। (সুনন্দবাবুর এক্ষেত্রে শ্লেষের কারণটা আমার বোধগম্য হলো না। এটা তো চিরকালের সত্য যে বিত্তের সাথে বিদ্যার একটা সম্পর্ক আছে। বিত্তের ক্ষেত্রে অসাম্য থাকলে বিদ্যার ক্ষেত্রেও অসাম্য থাকবে।) আমরা সাধারণ স্কুলগুলিতে সেভাবে ইংরেজি শেখার সুযোগ পাই না। সাধারণ স্কুলগুলোতে যেভাবে ইংরেজি

শেখানো হয় তাতে শুধুমাত্র ইংরাজি শেখার জন্য একজন আলাদা গৃহ প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হয় ঠিকই কিন্তু আমার মতো অনেক ছাত্রছাত্রীর কপালেই জোটে না। মাধ্যমিক স্তরের অপরিণত বুদ্ধিতে আমার এই পড়ে পড়ে নিজের চেষ্টায় টেনস্ (Tense) ভয়েস (Voice আয়ত্ত করা এবং ইংরাজিতে বাক্য তৈরির ক্ষমতা অর্জন করা খুব কম ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই সম্ভব। প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি শেখানোর পুরোনো পর্যায়েই হোক বা এখনকার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরাজি শেখানোর নতুন পর্যায়েই হোক বাস্তবটা হলো এই যে, পুরোনো পর্যায়ের আমলেও যেমন বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ইংরাজির কিছু না শিখে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করত তেমনি এখনকার নতুন পর্যায়েতেও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ইংরাজির কিছু না শিখেই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করছে এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরাজিতে পাইকারি হারে ফেল করছে। প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষায় ফলাফলের দিকে তাকালেই এই সত্যটা ধরা পড়বে। কাজেই আমার মত হলো প্রথমত ইংরাজি ভাষা শেখাটা বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক করা হোক কারণ ইংরাজি ভাষাটা এখন আর শিক্ষার মাধ্যম নয়।

দ্বিতীয়ত ভাষাটা শেখানো হোক উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আর এই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষায় শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের নয় অছাত্রদেরও (Non-student) ইংরাজি শেখানোর সুযোগ দেওয়া হোক।

অরুণ পাল

বালি, হাওড়া

দোন্ট (diphyodont) বলে। কেমনো, ঘোড়া, কাঠবিড়ালি ইত্যাদি প্রাণীর জন্য চার রকমের দাঁত থাকে। তার মধ্যে সামনের দিকে যে দাঁত ব্যবহৃত হয় তার নাম ইনসিজর (Incisor)। আমাদের দাঁত একটা মাপ অবধি বেড়ে আর বাড়ে না। কিন্তু ইঁদুরের এই ইনসিজর দাঁত সারাজীবন ধরেই বেড়ে চলে। দাঁতের নিচে যে কোষগুলি থাকে তাকে বলে পাল্প ক্যাভিটি। এটা অন্যান্য জন্তুদের ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দাঁতের বাড়ও থেমে যায়। কিন্তু ইঁদুরের পাল্প ক্যাভিটির মুখ সারাজীবন খোলা থাকে, দাঁত তার পুষ্টির রসদ পেয়ে যায়, বাড়তে থাকে। এই ঘটনা খরগোসের ক্ষেত্রেও ঘটে। ওরা খাবার সময় উপর চোয়াল ঘষে দাঁত কমিয়ে নেয়। কোনও কারণে ওপর বা নিচের কোনো পাটির ইনসিজর দাঁত পড়ে গেলে খরগোশ বেচারারা পড়ে ভয়ানক বিপদে।

সমীরকুমার ঘোষ

প্রশ্ন-উত্তর

ইঁদুররা ঘরে যা পায় তাই কেটে নষ্ট করে। অন্য কোনো প্রাণী এরকমভাবে কাটে না, কেন?

সোনালী সাহা

বহরমপুর

ইঁদুর এটা করে দৈহিক তাড়নায়। ইঁদুরের কেটেকুটে নষ্ট করার জন্য দায়ী তার দাঁতের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ছোটোর কথা আমাদের মা-ঠাকুমারাও জানেন। ছোটোবেলায় দাঁত পড়ে গেলে দাঁতটা নর্দমায় ফেলে বলতাম—'ইঁদুরমামা। ইঁদুরমামা। আমার ছোটো দাঁতটা নাও, তোমার বড় দাঁতটা দাও।' কথাটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ইঁদুরের মতোই তাদের দাঁত দ্রুত বেড়ে উঠবে এই ধারণা থেকেই সম্ভবত এর উৎপত্তি।

প্রাণীদের এক থেকে দুই বিভিন্নতার জন্য বাড়ে ইঁদুরের দাঁত। তার ওপরে সেগুলো গজায়ও। এতে ওরা খুবই কষ্ট পায়। আর এই কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে জিনিসপত্র কেটে ওরা দাঁত কমিয়ে নেয়, মাপ ঠিক রাখে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুবার দাঁত গজায়। জন্মানোর পর থেকে ছ-সাত বছর অবধি এক সারি দাঁত থাকে। যাকে দুধের দাঁত বলে। এটা পড়ে গজায় আর এক সারি দাঁত। সেটা সারা-জীবনের সাথী। মাঝখানে কোনও কারণে ভেঙে গেলে বা তুলে ফেললে আর গজায় না। এই দুবার গজানোর ব্যাপারটিকে ডাইফায়ো-

সংগঠন সংবাদ

হবে

... জনস্থান কোন কয়লাখনি থেকে বেরিয়ে আসা বিষাক্ত গ্যাসে গোবরা, পায়রাডাঙা, নৈটি ইত্যাদি গ্রামের বাতাস ভয়ানক দূষিত হয়ে যাচ্ছে এবং ওই সব অঞ্চলের মাটি ও জল দূষিত হয়ে চাষের ক্ষতি হচ্ছে, এছাড়াও মানুষের স্বাস্থ্যেরও ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। তাই গোবরা অ্যান্টি পলিউশন ফোরাম নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে খবর বলে, এই দূষণ প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ফোরাম কলকাতা ও আশপাশের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনগুলিকে এই কাজে সাথী হিসাবে পেতে

চায়। সেজন্যেই আগামী ৮ জানুয়ারি ১০টার ফোরাম সমস্ত বিজ্ঞান সংগঠনগুলিকে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করছে গোখলে অডিটোরিয়ামে। সমস্ত বিজ্ঞান সংগঠনকে উপস্থিত হতে আহ্বান জানাচ্ছে ফোরাম।

☐ কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এর সামনে শতাব্দী-র আয়োজনে 'ফুটপাতে নাটোৎসব' জানুয়ারি, ১৯৯৫-এ।

শনি	২১শে	মিছিল	শতাব্দী
রবি	২২শে	সাদা কালো	শতক
সোম	২৩শে	অ্যাজানী	পথসেনা
বুধ	২৫শে	কিস্‌সা কুর্সী কা	পথসেনা
শনি	২৮শে	ময়ূরাক্ষী	শতাব্দী
		হুতোমের ওপন্যাস	শতক
রবি	২৯শে	গণ্ডী	আয়না

প্রতিদিনই শুরু হবে বিকেল তিনটেয়।

হয়েছে

☐ গত ১১ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর কাঁচরাপাড়ার লিচুবাগানে বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা উৎস মানুষ, গণবিজ্ঞান ভাবনার ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার স্টল ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। তাছাড়া সর্পবিদ্যা স্টল পরিচালনা করেন ও কর্মীরা পত্র-পত্রিকার কথা প্রচার করেন।

☐ গত ২৩-২৬ অক্টোবর '৯৪ কোন্নগর সায়েন্স ক্লাবের আমন্ত্রণে নবীন দাস স্কুলে বিজ্ঞান মঞ্চের প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান বিভাগ ছিল। অবশ্যই কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে।

☐ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য, অপবিশ্বাস ও অবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী প্রয়াত বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের জন্য 'হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি' সংস্থার উদ্যোগে হরিণঘাটা, কল্যাণী, কাঁচড়াপাড়ার অঞ্চলের ৮টি স্কুলের প্রায় ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায় ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১২ নভেম্বর '৯৪ কাঁচড়াপাড়ার গার্লস হাইস্কুলে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লিখিত ও মৌখিকভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর-পর্ব চালানো হয়।

☐ গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা ফেডারেশন হল সোসাইটির উদ্যোগে ১৯ এবং ২০ নভেম্বর '৯৪ ফেডারেশন হল-এ "প্রযুক্তির বিবর্তন ও ভারতীয় সমাজ" (Technological Development & Indian Society) শীর্ষক দু'দিনব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

☐ সর্দার সরোবর ড্যামের কাজ বাতিলের জন্য দাবি ও সুপ্রীম কোর্টে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কেসের শুনানি চলবার স্থগিত রাখার প্রতিবাদে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকর, এবং প্রধান বিরোধী ও আরো তিনজন ২১ নভেম্বর থেকে ভোপালে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন করেছেন। এঁদের অনশনের সমর্থনে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে ফ্রেন্ডস অব নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের উদ্যোগে গত ২৩ নভেম্বর '৯৪ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা ৬ জন প্রতীক অনশন করেন।

☐ ২৫ নভেম্বর '৯৪ ছিল আন্তর্জাতিক নারী নিপীড়ন বিরোধী দিবস। নারীর বাঁচার অধিকার স্বপক্ষে, ন্যায়সঙ্গত এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তা আইনসম্মতও। কিন্তু আমরা দেখি, যারা আক্রমণের অধিকারী নারী অবহেলিত, বঞ্চিত শুধু নয় আজও নির্যাতিতা, নিপীড়ন ও নৃশংস ধর্ষণের শিকার হয়েই চলেছে। এই উপলক্ষ্যে হাওড়া জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পিপলস্ ইনস্টিটিউট ফর রুরাল অ্যাকশন (PIRA / পিরা) ১৫ দিনব্যাপী নানাভাবে কার্যক্রম নেয়। শুরু হয় ২৫ নভেম্বর '৯৪ এবং শেষ হয় ৯ ডিসেম্বর '৯৪। হাওড়া ও হুগলি জেলার বিভিন্ন গ্রামে সর্বাধিক নারী নিপীড়ন বিরোধী গোষ্ঠীর, পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী, বিভিন্ন আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

☐ গত ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর '৯৪, দুপুরে PIRA-তে দু-দিনের একটি স্থায়ী ও বিকল্প কৃষি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সহ প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। যাতে হাওড়া জেলার ৯টি গ্রাম থেকে ২৩ জন চাষী অংশ নেন। এক্ষেত্রে কৃষির বর্তমান সমস্যা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া, স্থায়ী কৃষির মূলনীতি, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বিকল্প তৈরি, বীজ তৈরি, জল সংরক্ষণ, বন্ধু পোকা ও শত্রু পোকা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। জৈব সার তৈরির জন্য একটি কম্পোস্ট পিট অংশগ্রহণকারী চাষীরা তৈরি করেন।

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় 'অন্ধ বিশ্বাস : কী করব কোথায় যাব' কলামটি প্রকাশ করা গেল না।
পত্রিকাগোষ্ঠী

খোলা আকাশের নিচে মুক্ত ময়দানে কলকাতা পুস্তকমেলায় এবারও উৎস মানুষ-এর স্টল থাকছে।
দেখা হবে, কথা হবে সব শুভানুধ্যায়ী পাঠক গ্রাহক পুরানো নতুন বন্ধুদের সঙ্গে।

WB/EC 228 | ISSN 0971-3800 | RN 37275/80 | Rs. 5.00

UTSA MANUSH | VOL 16 NO 1 | JANUARY 1995 | পাঁচ টাকা

আবেদন

'উৎস মানুষ' যদি আপনার ভালোবাসা ও প্রত্যাশা একটুও আদায় করে থাকে তাহলে আসুন, একে আপন করে নিন। পত্রিকার সুস্থ এবং সঠিক বিকাশের স্বার্থেই এটা দরকার। যারা আদর্শগত ও নীতিগতভাবে মনে করেন যে, আজকের পলায়নী চরিত্রের হাজারো পত্রিকার ভিড়ে 'উৎস মানুষ'-এর বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠা জরুরি, তারা সরাসরি সাহায্য করুন — নিজের অন্যতম দায়িত্ব মনে করেই।

□ ভালো লেখা দিন — অলৌকিক ও অবৈজ্ঞানিকের বিপক্ষে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ সুস্থ সমাজবোধ ও মানবিক গুণাবলীর সপক্ষে লেখা □ বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিন □ আপনার চারপাশের মানুষজনের কাছে 'উৎস মানুষ' পৌঁছে দিন নিয়মিত।

চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক উৎস মানুষ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

এছাড়া সরাসরি সাক্ষাতের জন্য

২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৯-এ (এন বি সি-র উল্টোদিকে) ব্লক আর্ট প্রসেস-এর ভেতর (সোম—শুক্র : ১১টা-৬টা) আসুন।

'উৎস মানুষ'-এর পক্ষে পরম কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং সাধনা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ (ফোন: ২৪১ ৩৪৪০) থেকে মুদ্রিত।

ISSN 0971-5800
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

উৎস মানুষ

স্কুল মানে এক যন্ত্রালয়
ভারতের বুকে বিদেশী বর্জ্য
ওষুধের বিকল্প ভাবনা
আবার আসছে সূর্যগ্রহণ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

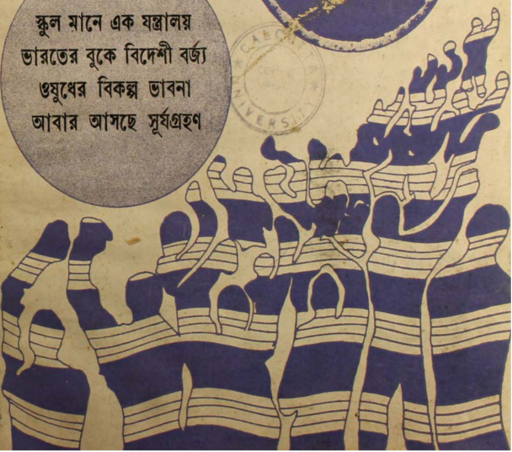

উৎস মানুষ

ষোড়শ বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা □ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

প্রবন্ধ

আহরণ

নারী নির্যাতন : সত্তর বছর আগে □ ২৯

বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসা □ ৩১

বিকল্প চিকিৎসা না-কি চিকিৎসার বিকল্প? □ ৩৪

১৯৯৫ সালের স্বর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ □ ৩৭

ভারতবর্ষ কি আমেরিকার তাঁবেদার? □ ৪১

অনুবাদ: [illegible]

মহাজন □ ৪৪

[illegible] □ [illegible]

[illegible] □ [illegible]

[illegible] □ [illegible]

চিঠিপত্র □ [illegible]

[illegible] □ [illegible]

উৎস মানুষ
ISSN 0971-5800
বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

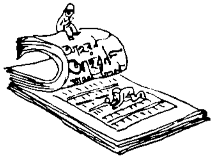

নারী নির্যাতন : সত্তর বছর আগে

পণ্ডিত দিব্যেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী

[illegible] — স. ম.

২৯শে শ্রাবণ, সন ১৩৩১ সাল

(14th August, 1924)

নারী-নিগ্রহ — ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় জজের এজলাসে একটী হিন্দু-নারী-হরণের মামলা চলিতেছে। আদালতের সমক্ষে বাদিনী যে জবানবন্দী দিয়াছে, নিম্নে তাহার মর্ম্ম দেওয়া হইল—

আমার নাম সুশীলা। আমি আমার স্বামীর সহিত এক বিছানায় শুইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম। প্রায় দুপুর রাত্রে সময় ৪ জন লোক আমাদের ঘরে প্রবেশ করে। আমরা শুইবার আগে আমার স্বামী ঘরের দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া শুইয়াছিলেন। উক্ত ৪ জনের নাম — যথাক্রমে ইনু, অতুল, সরাফত ও নসরালী। ৪ জন ঘরে ঢুকিয়া আমার হাত ধরে। ইহাতে আমি চীৎকার করিয়া উঠি। চীৎকার শুনিয়া আমার স্বামী জাগ্রত হন ও আমাকে ধরেন। ইনু ও সরাফত তখন আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া বাহিরে নিয়া আসে। আমাকে টানিয়া বাহিরে আনিবার সময় আমার কাপড়ের কতকাংশ দরজায় লাগিয়া ছিঁড়িয়া যায়। আমাকে তখন আমাদের বাড়ীর উত্তর ধারের একটা জমিতে আনা হয়। আমার দেবশ্বশুর অমরচাঁদ ও আমার স্বামী তাহাদের পাছে পাছে ঐ স্থানে আসেন। অতুল তখন আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল এবং প্রথমেই আমার শ্বশুরকে দেখিতে পাইয়া বলে, "শালাকে মারিয়া ফেল।" ইহাতে নসরালী অমরচাঁদকে আঘাত করিয়া ভূমিসাৎ করে। আমার স্বামী তখন কি অবস্থায় ছিলেন, বলিতে পারি না। আমার হাতে শাঁখা ছিল ও ছেঁড়া কাপড়ের বাকি অংশ তখনও পরিধানে ছিল। কিন্তু যখন আমার শ্বশুর আসিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ তাহাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতেছিলেন, তখন এই শাঁখা ভাঙিয়া

যায় এবং টানাটানিতে কাপড়ও ছিঁড়িয়া যায়। তখন আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ছিলাম। সেখান হইতে পুনঃপুনঃ আমি চীৎকার করিব, এই ভয়ে আমার মুখে কাপড় গুঁজিয়া চোখ বাঁধিয়া দিয়া গেল। আমার চোখ মুখ বাঁধাছিল বলিয়া কোন দিকে লইয়া গেল, বলিতে পারিনা। একটা ঘিরের ধারে লেবুক্ষেতে নিয়া রাখিল এবং আমার চোখের বাঁধা ও মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। তখন আমি ৪ জন আসামীকেই চিনিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, আমরা তেলের ব্যবসা করি এবং তেল কিনিতে উহারা প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে যাইত এবং আমার স্বামীর সঙ্গে বসিয়া তামাক খাইত ও গল্পগুজব করিত। সেখানে ঐ লেবুক্ষেতে একটী কাপড় বিছাইয়া উহারা আমাকে জোর করিয়া উহাতে শোয়ায় এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতুল্য প্রথম আমার ইজ্জৎ নষ্ট করে ও বাকি দুইজনে আমাকে ধরিয়া রাখে; তারপর পদ্মলালী আমাকে বলাৎকার করে ও বাকি ২ জনে ধরিয়া রাখে। ইহার পর ইন্দ্রা আমার ইজ্জৎ নষ্ট করে। ইহার পর আর কেহ আমার উপর বলাৎকার করে নাই। সম্ভবতঃ বাড়ীতে একটী লোকজন শুনিয়া চলিয়া যায়, সে আমার ইজ্জত নষ্ট করে নাই। আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, দুর্বৃত্তগণ যখন আমাকে লইয়া আসে, তখন আমার পিঠে ও পায়ে টানিয়া নিবার কালে আঘাত পাই ও কাঁটার দাগ লাগে। উহারা মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখায়—তাই আমি চীৎকার করি নাই এবং তাহাদিগকে আমাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তাহারা বলে যে, তোকে ফিরাইয়া দিবার জন্য কি আনিয়াছি? তখন তাহারা আমার হাতে মাটী দিয়া শপথ করায় যে, কাহারও নিকট উল্লিখিত বিষয় কিছু না বলি। ইহাতে আমি চুপ করিয়াছিলাম। পদ্মলালী ও অতুল্য উলঙ্গ অবস্থায় আমাকে আমার বাড়ীর ধারের বাঁশঝাড়ের দিয়া চলিয়া যায়, রাত্রি তখন প্রায় ভোর হইয়া গিয়াছিল। আমি তখন সেখান হইতে বাড়ীতে গিয়া একখানা কাপড় পরি এবং মধুসূদন পাল, উমেশ পাল, দিনা পাল, গনিভেনার ও একাধিক মান্যগণ্য প্রমুখকে আমাদের বাড়ীর উঠানে বসিয়া থাকিতে দেখি এবং সকলের কাছে উপরোক্ত ঘটনার বিষয় বিবৃত করি। আমার স্বামী কিম্বা অন্যকে বাড়ী গিয়া দেখি নাই, তাঁহারা উদ্দেশ্যেই থানায় গিয়াছিলেন এবং পরে বাড়ি আসিয়াছিলেন। দারোগাবাবু আসিলে আমি সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছি। তারপর আমাকে নোয়াখালার হাসপাতালে পাঠানো হয়, সেখানে ডাক্তারবাবু আমাকে পরীক্ষা করেন।

শ্রীরামপুর

আয়েশা ও সুবাসী নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের নামে শ্রীরামপুর আদালতে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর এস, সি, লাহিড়ীর এজলাসে এই অভিযোগ হয় যে, তাহারা শ্যামলাল কোলের স্ত্রীকে বাড়ির বাহির করিয়া অন্যত্র কোনখানে রাখিয়াছিল। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ একদিন শ্যামলাল কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাড়ী ছিল না, আসামীরা এই সুযোগে তাহার স্ত্রী

রাজবালার নিকট গিয়া বলে যে, তাহার স্বামীর কলেরা হইয়াছে এবং তাহাকে লিলুয়ায় তাহার কর্ম্মস্থল হইতে শালকিয়ায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহার স্বামী তাহার সহিত দেখা করিতে চায়। রাজবালা ঐ কথা শুনিয়া আসামীদের সহিত শালকিয়ায় যাইবার জন্য বাড়ী হইতে রওনা হয়, কিন্তু তাহারা তাহাকে সত্যপ্রিয় জনৈক বারবনিতার ঘরে লইয়া যায় এবং সেখানে তাহার ইজ্জতের হানি করে। হাকিম মহাশয়কে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে তাহাকে আরও দুই মাস জেল খাটিতে হইবে। সুবাসীরও তিন মাস জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে, জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে তাহাকে আরও ১ মাস জেলে কাটাইতে হইবে। আর যদি জরিমানার টাকা আদায় হয়, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাদীকে দিবার আদেশ হইয়াছে।

বসিরহাট

বসিরহাটের এক নারী-নিগ্রহের মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ৮ই চৈত্র ২৪ পরগনার তেঁতুলিয়া পোষ্টাফিসের অধীন গোকুলপুর গ্রামের মুন্সী গাজী নামক জনৈক দরিদ্র মুসলমানের পুত্রবধূকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল, প্রায় একমাস পরে পুলিশের সাহায্যে একজন আসামির বাড়ী হইতে মেয়েটীকে উদ্ধার করা হয়। অতঃপর বসিরহাট আদালতে মোকদ্দমা রুজু হয়, গত ২রা আগষ্ট স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার রায় দিয়াছেন, আসামী অব্যাহতি পাইয়াছে। অভিযোগে যে সকল কথা শুনা গিয়াছে, তাহাতে আপীল করিলে সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু মুন্সী গাজীর আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ।

ফেণী

ফেণীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট চাঁদমিঞা নামক এক ব্যক্তিকে বে-আইনী আটক ও প্রহারের অভিযোগে একজন দারোগা এবং কতিপয় কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে সমন জারী করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, ত্রিপুরা ষ্টেটের অন্তর্গত আমতলিক নামক স্থানের চাঁদমিঞার বালিকা স্ত্রী খোর্শেদা খাতুনকে আম্বিনী নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়া লইয়া যাইয়া ফেণীর এক বেশ্যালয়ে রাখে। তাঁর স্বামী খোঁজ পাইয়া সেখান হইতে তাহাকে আনিতে গেলে দারোগা এবং কনষ্টেবলরা তাহার উপর অত্যাচারও করে। অতঃপর ১লা আগষ্ট তারিখে সরলা নাম্নী জনৈকা বেশ্যা তাহাকে লইয়া থানায় যাইতেছিল; চাঁদমিঞা তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে কনষ্টেবলরা তাহাকে দারোগার সম্মুখে খুব প্রহার করে। তৎপর তাহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়, বাদীর পক্ষের উকীল পুলিশের বিরুদ্ধে এই মামলা উঠাইয়া দিতে অস্বীকার করায় নাকি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপমান করিয়াছেন।

স্বৈরতন্ত্র-শিক্ষাযন্ত্র

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পনের বছর স্কুল মাস্টারি করে সেপ্টেম্বরে চাকরিটা ছেড়েই দিলাম।

আমার বিদায়ের দিন — স্টাফরুমে বসে আছি — এমন সময় একটি ছেলে এসে দাঁড়াল, তার হাতে একটি ছোট্ট ফুলের স্তবক। সসংকোচে সে জানাল, তার খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে এই ফুলটা দেয়; কিন্তু যেহেতু সে আজ ইউনিফর্ম পরে আসে নি, তাকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এ-অবস্থায় আমি কি তার হাত থেকে স্তবকটি গ্রহণ করব?

আমার সেই প্রিয় ছাত্রটির প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে আর স্কুল নামের যে-স্বৈরাচারী ব্যবস্থাটার চাকর হয়ে আমি এতদিন কাজ করেছি, তার প্রতি ঘৃণা নিক্ষেপ করে আমি এখানের লেখা শুরু করতে চাই।

নব বর্ষমান শিক্ষায় একটা কান্ডের মধ্যে এখন ঘুরতে হচ্ছে কলকাতা আর তার আশপাশের বস্তি-ঝুপড়ি অঞ্চলে। অবাক হয়ে শুনেছি, এখানকার অনেক শিশুই একসময় স্কুলে ভর্তি হয়ে পরে ছেড়ে দিয়েছে: কারণ পড়ার খরচ নাকি জোটানো যায় নি। প্রশ্ন করেছি: খরচের কথা আসছে কেন? স্কুলে পড়তে তো এখন পয়সা লাগে না। উত্তর: তা তো হলো, কিন্তু ওই 'ফেস' আর 'টিউশানি পড়ার' টাকা কে দেবে!

অবস্থাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এ-রকম: আমরা ঘোষণা করেছি, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক, তার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিচ্ছে। আবার নিয়মশৃঙ্খলার নামে এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যার ধাক্কায় একজন শিশু সেই সুযোগের আওতা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এই অদ্ভুত কান্ডটা ঘটে যাচ্ছে নিঃশব্দেই।

আমরা সকলেই জানি, বিদ্যালয়ের কিছু নিজস্ব নিয়মকানুন থাকে, সবার জন্যে এক ইউনিফর্ম সেই নিয়মের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এই নিয়ম রাখতে গিয়ে যাদের জন্যে বিদ্যালয় তাদের এক অংশকেই যদি আমরা ধরে রাখতে না পারি, নিয়ম তাহলে কোন্ কাজে লাগল। আবার একদিকে স্কুলে বেতন নেওয়া হচ্ছে না, প্রাথমিক স্তরে বিনা পয়সায় বই দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে — প্রাইভেট টিউটর ছাড়া নাকি শিশুদের চলে না। তার মানে ক্লাসে বিশেষ কিছুই হয় না, কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন করার সময় মান বজায় রাখতে ভুল হয় না। ফলে একটা বস্তির শিশুকেও আজ তিরিশ / চল্লিশ টাকার দক্ষিণা গুনতে হয় ঘরে পড়ানোর জন্যে। সে-টাকা বাপ-মা দিতে না পারলে সে সরস্বতীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাগজ-লোহা-শিশিবোতল কুড়োয়, নয়তো রাস্তার চায়ের দোকানে কাঁচের গ্লাস ধোয়। আমাদের সর্বজনীন শিক্ষার এই হলো মোটের ওপর হাল।

গরিব শিশুদের স্কুল ছেড়ে দেওয়া বা ড্রপ আউট নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং দারিদ্র্যকেই মোটামুটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা মনে রাখি নি যে, সাধারণভাবে একটি পাঠ্যপুস্তকে যা থাকে এবং যেভাবে থাকে, তা একটি শিশুর ভালো লাগার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, একটি দরিদ্র শিশুরও আত্মসম্মান বোধ থাকে। প্রাথমিক স্তরে পাস-ফেল উঠে গেলেও পরীক্ষায় কিছু লিখতে-না-পারার অক্ষমতা তাকে খোঁচায়, সে ক্রমশ ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে আসতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই স্কুল ছেড়ে দেয়; এই ছেড়ে দেওয়াটাই তার মুক্তি। যারা ছেড়ে দেয় না, তারা খুঁজে নেয় কয়েকটি মার্কা-মারা স্কুল। যে-কোনো পাড়ার শিশু তাই যে-কোনো স্কুলে যায় না। আমার বাসস্থান সল্টলেকের পশ্চিম কিনারে, সেখানে কলকাতার অন্যতম প্রাচীন বস্তি: দত্তাবাদ। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এখানকার ছেলে মেয়েরা পারতপক্ষে সল্টলেক-ডি. আই. পি. অঞ্চলের স্কুলে ভর্তি হয় না; তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আছে উল্টোডাঙা-মানিকতলা অঞ্চলের কয়েকটি জীর্ণ-মলিন বিদ্যালয়। সেখানকার শিক্ষকরা গর্বভরে বলে থাকেন, আমাদের স্কুলের আর কী হবে, বলুন। এখানে সব গ্রাম এরিয়া থেকে ছাত্র আসে।

বর্তমান লেখকের 'স্কুল-ছুট: আমরা আর ওরা' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল গত জানুয়ারি '৯০ সংখ্যার 'উৎস মানুষ'-এ, তারই ধারাবাহিকতায় পড়তে হবে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাটি।
—স. ম.

আমার শিক্ষক জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতার একেবারে দক্ষিণে ধাঁকুরিয়া অঞ্চলের এরকম একটি গরিব স্কুলে। আমাদের ঠিক পাশেই ছিল কলকাতার একটি বনেদী বিদ্যালয় — বিরাট তার বিল্ডিং। আমাদের ছাত্ররা কিন্তু সেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবতেই পারত না। আমরা পড়াতাম, শিক্ষাপদ্ধতি আর পাশ-ফেলের মানে কোনো ভেদ রাখি নি। কিন্তু ভেদ সমাজে রয়েছেই, আর তাই ভাবভঙ্গিও হয়ে আছে। এটা স্বীকার না করাটা এক ধরনের স্বেচ্ছাচার। সবার জন্যে এক শিক্ষার নামে রাষ্ট্র এই স্বেচ্ছাচারকেই প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে।

'মানুষ' গড়ার কারখানা

স্কুল, আমরা দেখেছি, রাষ্ট্রেরই একটি ছোট্টো অঙ্গ। প্রতিটি রাষ্ট্র-ই চায় এমন নাগরিক তৈরি করতে যে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করবে না। স্কুলও এই কাজটাই করে। নিয়মকানুন এমনভাবে বাঁধা হয়, যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা স্কুলকে কখনও চ্যালেঞ্জ করতে না পারে। পাঠক্রম এমনভাবে স্থির করা হয়, যাতে ছাত্র/ছাত্রীদের নিজেদের কথা বলার, নিজেদের মতো করে ভাবার সুযোগ কম থাকে। আদর্শ শিক্ষার্থী হলো সে-ই, যে স্কুলের নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে খাঁটিয়ে নিতে পেরেছে।

বছর দশেক আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি যে ক্লাসের ক্লাসটিচার ছিলাম, সেই ক্লাসঘরে অনেকদিন ধরেই পাখা ছিল না। বারবার বলেও জানিয়েও কোনো ফল হয় নি। একদিন ক্লাসে যেতে গিয়ে দেখি, ছাত্ররা সব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বক্তব্য : পাখার ব্যবস্থা না করা হলে তারা ক্লাস করবে না। প্রধান শিক্ষক সেদিন অনুপস্থিত। আমি ছাত্রদের কথা ধৈর্য ধরে শুনে বলি, সেদিনের মতো তারা ক্লাসটা করুক; আমি পরেরদিনই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সমস্যাটা নিয়ে কথা বলব। ছাত্ররা আমার অনুরোধ রেখে ক্লাসে ঢুকে যায়।

পরের দিন প্রধান শিক্ষকের কাছে সব ঘটনাটি খুলে বলি, তিনি গম্ভীরমুখে জানিয়ে দেন, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গেছে। পরে জানতে পারি, প্রধান শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের খাতায় লিখে দিয়েছেন, ছাত্ররা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে গর্হিত অপরাধ করেছে — অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। কিশোর মনের সহজাত এবং সঙ্গত প্রতিবাদচেতনাকে এইভাবে গলা টিপে মারল স্কুল। এই স্কুলই আবার স্বাধীনতা দিবসে ছাত্রদের ক্ষুদিরাম-বাঘা যতীনের গল্প শোনায়।

স্কুল মানে নির্বিবাদে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা, এই ধারণাটা আসলে প্রথম থেকেই চলে আসছে। শুনে অবাক হতে হয় যে — ইংরেজি 'স্কুল' কথাটা এসেছে একটা গ্রীক শব্দ থেকে, যার মানে 'অবসর'। প্রাচীন গ্রীক সমাজে শিশুদের দিনে কিছুক্ষণের জন্যে স্কুলে রেখে দেওয়া হতো, যাতে তারা দুষ্টুমি করতে না পারে। এই স্কুল বা অবসরের আবহাওয়ায় শিশুদের পেটিয়ে দিয়ে আসত ক্রীতদাসরা, যাদের কোনো অধিকার ছিল না শিক্ষার।

তবে রাষ্ট্র জনসাধারণের শিক্ষায় আগ্রহী হয় তার নিজের স্বার্থে। যেমন শিল্পবিপ্লবের পর শিক্ষার ওপর জোর পড়ে; কারণ বোঝা গিয়েছিল, কারখানায় কাজ করতে হলে শ্রমিকের একটু-আধটু লেখাপড়া, হিসেব করা জানা দরকার। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সব দেশই শিক্ষা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে; কারণ পাঁচ বছরের ব্যবধানে দু-দুটো মহাযুদ্ধ মানুষের ন্যায়-নীতির মূল্যবোধকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। স্কুলকে কিন্তু রাষ্ট্র প্রথম থেকেই দেখেছে তার পছন্দমতো নাগরিক তৈরির একটা কারখানা হিসাবে। শিক্ষাতত্ত্বের পাতায় তাই বারবারই ঝাঁকিয়ে গেছে আত্মনিয়ন্ত্রণ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, নীতিবোধ এইসব প্রত্যয়। ধরে নেওয়া হয়েছে মানুষ নিজের থেকে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমভাবে বিকশিত করতে পারে না। তার জন্যে একটা বাইরের নিয়ামক-শক্তি বা এজেন্ট লাগে। স্কুল এইরকম এক এজেন্ট। যুক্তিবোধ আর স্বাধীনতার কথাও অবশ্য এসেছে; তার পিছনে থেকেছে এই বিশ্বাস যে, মানুষ নিজের ভালোমন্দ নিজে বোঝে না; যুক্তিকার তার স্বভাবের ধর্ম নয়। সেটা তাকে শেখাতে হবে শিক্ষার ভেতর দিয়ে। মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত 'শিক্ষা' শব্দটির অর্থ হলো : চর্চার দ্বারা আয়ত্তীকরণ। [আয়ত্ত করতে হবে সেইসব নীতি-শৃঙ্খলা-যুক্তি যা রাষ্ট্র আদর্শ মনে করে।]

আবার বিভিন্ন সময়ে দার্শনিকরা যখন শিক্ষা নিয়ে কথা বলেছেন, তার পিছনে কাজ করেছে তাঁদের নিজেদের আদর্শের ধারণা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বিশ্বাস করতেন, মানুষ নিজের যুক্তিকে নিজে প্রয়োগ করতে জানে না; এই অক্ষমতাকে অতিক্রম করাই হলো জ্ঞানদীপ্তি বা 'এনলাইটেনমেন্ট'। কান্ট চেয়েছিলেন, শিক্ষা গড়ে উঠবে আগামী পৃথিবীর উন্নততর মানবের কথা মনে রেখে। আবার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বিরুদ্ধে রুশোর প্রতিবাদ ও তাঁর নিজস্ব দর্শনের প্রতিক্রিয়া। কান্টের প্রায় সমসাময়িক এই ফরাসী দার্শনিক বিশ্বাস করতেন, শিশুকে কিছু শেখানোর দরকার নেই; প্রকৃতির সাহচর্যে সে নিজে থেকেই শিখে নেবে।

রাষ্ট্র যেমন শিক্ষাকে গড়তে চেয়েছে তাঁর নিজের ছাঁচে দার্শনিকরাও শিক্ষার প্রক্রিয়া গড়েছেন তাঁদের নিজস্ব দার্শনিক প্রত্যয়ের আদিকল্প থেকে। ফলে একটা নিয়ম ভাঙতে গিয়ে আর-একটা নিয়ম তৈরি হয়েছে। যাদের জন্যে শিক্ষা, সেই শিশুদের পছন্দ-অপছন্দের দিকটা ঠিক গণনীয় হয়ে ওঠে নি। যেমন, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির জনক ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২) তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমে ধর্ম এবং নীতিশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন; কারণ শিক্ষার ভেতর দিয়ে শিশুদের তিনি দিতে চেয়েছিলেন এক 'বিশ্বাত্মীয় ঐক্যের ধারণা'। একটি শিশু সত্যিই জগৎকে এইভাবে দেখতে চায় কিনা, ফ্রোয়েবেল তা বিচার করে দেখেন নি। আবার মারিয়া মন্তেসরি (১৮৭০-১৯৫২) তাঁর পাঠক্রমে রূপকথা-জাতীয় গল্পের কোনো জায়গা রাখেন নি, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এইসব অসম্ভব গল্প শিশুদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। মন্তেসরি শিশুর স্বাধীনতায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শিক্ষার নামে সেই স্বাধীনতায় কোনোরকম

হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। কিন্তু অ্যান্টোনির প্রতি শিক্ষকের যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, এটা মন্তেসরি নিজে মানতে চাইতেন না।

গত দুশো বছর ধরে শিক্ষা নিয়ে এই যে ভাবনাচিন্তা, শিশুদের কথা সেখানে বারবারই বলা হয়েছে; কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাদের মনগড়া আদর্শটাই যেন বড় হয়ে উঠেছে; শিশুদের পক্ষের হয়ে আমরা যেন তাদের শেষপর্যন্ত স্কুলেই বেঁধেছি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও এই ধারা থেকে পুরোপুরি মুক্ত বলা যায় না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের সকাল-সন্ধ্যা চোখ বুজে উপাসনা করতে হতো, দীক্ষাগ্রহণের সময় 'গুরুদেব'-এর মুখে বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক সমাজের কথা শুনতে হতো, ক্রিয়াসাধনের অভ্যাস কখনও অত্যাচার হয়ে উঠত; এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, চৌকায় বসে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বর্ণভেদ বজায় রাখা হতো।* ঔপনিষদিক দর্শন এবং বৈদিক তপোবন-শিক্ষার প্রভাব এই সময় রবীন্দ্রনাথের ওপর খুবই প্রবল ছিল; ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন সেই আদর্শেরই আদলে।

স্কুলকে নিয়ে রাষ্ট্র আর দার্শনিকদের মধ্যে এইভাবে টানাপোড়েন চলেছে, এবং এই দুই শক্তির ভেতর বিরোধ-ও বারবার দেখা গেছে। নতুন শিক্ষাপদ্ধতিকে রাষ্ট্র সবসময়ই সন্দেহের চোখে দেখেছে। ফ্রোয়েবল তাঁর নিজের দেশ জার্মানিতে কাজ করার সুযোগ পান নি। মন্তেসরিকে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট ইতালি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ওপর ব্রিটিশ সরকার নজর রাখত বলে শোনা যায়। আরও সাম্প্রতিককালে ব্রাজিলের পাওলো ফ্রেয়ারকে তাঁর দেশের সরকার প্রথমে বন্দী করে, পরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

স্কুলের ওপর রাষ্ট্রের এই ক্রমাগত নজরদারির প্রধান কারণ, স্কুলকে রাষ্ট্র মনে করে: কারখানা। শিক্ষার ছাঁচে ঢালাই হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে তার পছন্দমতো নাগরিক। শৃঙ্খলা আর কর্তব্য — এই দুটি শব্দের তাই বিশেষ দাপট স্কুলের জগতে। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক হলো ভক্তির সম্পর্ক; শিক্ষক ছাত্রকে অনুরোধ করেন না, 'আদেশ' করেন; শিক্ষকের মুখের ওপর কথা বলাটা ছাত্রের পক্ষে গর্হিত অপরাধ। শান্তিনিকেতনের বাইরে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষককে 'গুরুজী' বলার রেওয়াজ এখনও চালু আছে।

স্কুলে নিয়মশৃঙ্খলা থাকবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা বিনয়ী হবে, এটা আমাদের সকলেরই কাম্য। কিন্তু রাষ্ট্র যেমন নিয়ম দিয়ে আমাদের চোখ রাঙায়, আর নিজে নিয়ম ভাঙে, স্কুলও তেমনি সব সময় শৃঙ্খলা আর নীতির কথা বলে অথচ নিজে হয়ে থাকে বিশৃঙ্খলা আর দুর্নীতির একটা আখড়া। যে-কোনো একটা সাধারণ স্কুলের বাস্তব ছবিটা মোটামুটি এ-রকম: ক্লাসরুমে স্লেটবোর্ড ভাঙা, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়ে না, বেঞ্চ-ডেস্ক ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় কম, দুর্গন্ধময় প্রস্রাবাগারে নাক ঢাকা ছাড়া আর কেউ ঢুকতেই পারে না, ক্লাসে নাকি বিশেষ কিছুই শেখানো সম্ভব হয় না, বাকি তাই কোচিং সেন্টারে ভিড় উপচে পড়ে। ভেবে দেখুন, যে-স্কুল প্রতিদিন ক্লাসে বিশুদ্ধ জলের কথা বলে, সেই স্কুলই হাত তুলে ফেলে জানিয়ে দেয়: ছেলেদের বিশুদ্ধ পানীয় জল যোগান দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। কাঁধে ব্যাগ-বোঝাই জলের বোতল ছাড়া ছাত্র-ছাত্রী তাই এখন আর ভাবাই যায় না। একসঙ্গে দু-খানির বেশি খাতা একজন শিক্ষক নিতে পারেন না, কারণ তাহলে 'ব্যাগ ভারি হয়ে যাবে।' অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের রোজ বলা হয়, তারা যেন প্রতিদিন সব ক্লাসের বই সঙ্গে নিয়ে আসে। এক-একখানা বইয়ের এখন যা ওজন, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা যে কতটা ভারি হয়ে যায়, সেটা ভাবার গরজ কারোর নেই।

আমাদের সমাজে কোনো প্রতিষ্ঠানই দুর্নীতিমুক্ত নয়, বা খুব সুশৃঙ্খলভাবে চলে না। স্কুল তার থেকে বিশেষ আলাদা হবে, এমন প্রত্যাশা করি না। কিন্তু আমাকে যা সবচেয়ে অবাক করেছে, তা হলো: স্কুলের স্বেচ্ছাচারিতা এবং সেই বোধ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সন্ত্রস্ত করে রাখার ক্ষমতা। কী যদি জ্ঞানের কথাই না হলো আমাদের গুরুজীর মাস্টারমশাইদের মুখে শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন পাল্টা প্রশ্ন তোলার কথা ভাবতে পারি নি। যে-শিক্ষক ক্লাসে এসেই ঘুমিয়ে পড়তেন, তাঁকেও শুনেছি স্বাধীনতা দিবসে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা। আমরা অট্টহাস্য করে উঠি নি, এই উৎকট পরিহাস সহ্য করেছি: কারণ আমরা বুঝেই নিয়েছিলাম, স্কুলে এ-সব মেনে নিতে হয় — সেটাই দস্তুর।

পনের বছর মাস্টারি করে এখন বুঝতে পারি, স্কুলের একটা প্রচণ্ড অনুশাসন শক্তি আছে। স্কুলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছেলে বা মেয়ে বুঝে নেয়, এখানে তার নিজের কথা বলা চলবে না — এরই নাম স্কুল। লক্ষ করেছি, স্কুলের প্রতি একটা চাপা রাগ অনেক ছাত্রের মনেই আছে। কিন্তু সেটা তারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না। তারা যখন সুযোগ পেলেই স্কুলের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে, দেয়ালে অশ্লীল শব্দ লিখে রাখে, আড়াল থেকে শিক্ষকের নাম ধরে ডাকে বা ক্লাস সামলাতে অক্ষম শিক্ষককে নানাভাবে বিরক্ত এবং অপমান করে, তখন বুঝতে পারি, সেই ক্ষোভেরই প্রকাশ হলো — কিন্তু সোজাসুজি নয়, ঘুরিয়ে।

রাষ্ট্র যেমন তার নিপীড়ন শক্তিকে লুকিয়ে রাখার জন্যে চারপাশে জনসেবার একটা জ্যোতির্বলয় রচনা করে রাখে, স্কুলও তেমনি তার প্রাতিষ্ঠানিক মায়াজাল দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বশ করে রাখে। বেশ গুন্ডা-গোছের একটি ছেলেও তাই ক্লাসের মধ্যে শিক্ষকের দণ্ড হজম করে নেয়। শিক্ষক ক্লাসে না এলে বা এসেও না পড়ালে ছাত্ররা সাধারণত কৈফিয়ৎ চায় না। তারা ধরেই নেয়, এটা স্কুল — এখানে এসব মেনে নিতে হয়: এই মেনে নেওয়ার শিক্ষাই স্কুল দেয়। পাওলো ফ্রেয়ার তাই এই শিক্ষাকে বলেছিলেন পোষ মানানো: 'ডোমেস্টিকেশন'।

* প্রকৃত অর্থে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বা [illegible] শিক্ষার একটা ছোটো বিবরণ [illegible] শিক্ষাসত্র, [illegible] ১৯২০ সালে। [illegible] সেই ছোটো সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় নি। [illegible] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (১৯৭৯)

বিকল্প চিকিৎসা না-কি চিকিৎসার বিকল্প ?

ভবানীপ্রসাদ সাহু

সম্প্রতি বিকল্প চিকিৎসা বা অলটারনেটিভ মেডিসিন নামে একটা কথা বেশ শোনা যাচ্ছে। বহুল প্রচারের ফলে কথাটা বেশ চালুও হয়ে গেছে। তবে কথাটা কতটা যুক্তিসম্মত তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। বিকল্প বলতে কার বিকল্প? এখানে অবশ্যই প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকল্প হিসেবে বোঝানো হচ্ছে, যাকে অনেকে অ্যালোপ্যাথি বা পাশ্চাত্য চিকিৎসা (ওয়েস্টার্ন মেডিসিন) নামে অভিহিত করেন। এটি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে, বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এটি বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এখানে একটি 'কিন্তু' রয়ে যায়।

'পাশ্চাত্য' চিকিৎসার একটি বড় অংশ হচ্ছে ওষুধপত্র। কিন্তু ভেষজ বিজ্ঞানের বইতে মন্তব্য করা হয়েছে, যত দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ করা হোক না কেন, ঔষধ দূষণ (Drug toxicity)-কে সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব নয়। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার (axiom), কোন বিতর্কের ব্যাপার নয় (লরেন্স এর ফার্মাকোলজি)। দূষণের বিপদ ও রোগীর উপকার — কোনদিকে পাল্লা কতটা ভারী, তার বিচার করে চিকিৎসককে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই অনিবার্য ঔষধ দূষণের ব্যাপারটা কতটা নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মতও। কোনো ওষুধের কার্যকারিতার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণই তার গ্রহণযোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি নয়, যেহেতু এখনো বহুক্ষেত্রে অজ্ঞাত, মানুষের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে তা রাসায়নিকভাবে দূষিত করে। ফলে একদা যে ওষুধ চিকিৎসাবিজ্ঞানী তথা চিকিৎসকদের কাছে আদরণীয় ছিল তা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই পরিত্যাজ্য হয়েছে, যেমন ক্লিওকুইনল যুক্ত আমাশার ওষুধ, ইত্যাদি। এদের পরিত্যাগ করার আগে লক্ষ লক্ষ মানুষের শরীরে এদের প্রয়োগ ও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার দায় 'বিজ্ঞানী'দের নিতে হয় না। এছাড়া জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়োটিকের মতো বহু ওষুধের, প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করা অজস্র জীবাণুর সৃষ্টিও হচ্ছে অনাকাঙ্খিতভাবেই। তাদের মারতে আসছে আরো দামী অ্যান্টিবায়োটিক — সৃষ্টি হচ্ছে নবীনতর প্রতিরোধী জীবাণু এবং এই দুষ্টচক্র অন্তহীন। ওষুধজনিত রাসায়নিক দূষণের কারণে জীনগত পরিবর্তন, গর্ভস্থ শিশুর বিকৃতি, ক্যান্সারের সৃষ্টি, উৎসেচক তথা এনজাইমের বিশৃঙ্খলা, ইত্যাদি ধরনের অজস্র বিপদের কথাও অজানা নয়।

আধুনিক ও তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত ওষুধপত্রের চেয়ে, যদি এমন কোন পদ্ধতি মানুষ আয়ত্ত করে যার ফলে শরীরের নিজস্ব ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রোগের প্রতিরোধ ও নিরাময় করা যায়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেটিই হবে সবচেয়ে গ্রহণীয় ও আদর্শ পদ্ধতি। এর চেষ্টা মানুষ বহুদিন থেকেই করে আসছে এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা, আকুপাংচার, যোগব্যায়াম ইত্যাদি নানা চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে তার এই প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। তথাকথিত অ্যালোপ্যাথিসহ অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির কিছু কিছু ক্ষেত্রেও এই প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু তবু এখনো মানুষ ওষুধ ছাড়া (অর্থাৎ শরীরের রাসায়নিক দূষণ না ঘটিয়ে) স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে নি। এর একটি বড় কারণ বাণিজ্যিক, যে কারণে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার খরচ দেয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী; যাদের মূল লক্ষ্য থাকে ব্যবসা। এর মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক নানা তথ্য ও সত্যও মানুষ জানতে পারছে — এ-ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। তবে অন্যদিকে এই বাণিজ্যিক ও পণ্যসর্বস্ব মানসিকতার ফলে ঔষধ-হীন চিকিৎসার বিকাশের জন্য আন্তরিক গবেষণাও উপেক্ষিত। মাত্র কয়েক দশকের শিল্পবিকাশ তথা নানা কলকারখানার পরিবেশগত বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে দূষণমুক্ত শিল্প-স্থাপনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করছে; রাসায়নিক যে সার মানুষ একসময় ভেবেছিল পরম উপকারী, তাকে সরিয়ে রেখে প্রাকৃতিক সারের এই ধরনের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া যেমন এ ধরনের একটি উদাহরণ। একইভাবে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী ক্রমবর্ধমান হারে রাসায়নিক পদার্থ ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করার বিপদও মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে।

এর ফলশ্রুতিতে কয়েক দশক পরে এমন এক সামগ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি মানুষ হয়তো করায়ত্ত করতে পারে, যাতে এইভাবে শরীরে বাইরে থেকে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ বা ওষুধ ঢুকিয়ে রোগের চিকিৎসা

করার পদ্ধতি ও মানসিকতা বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।

এই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসা-পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক অবস্থার বিচার করা যেতে পারে। আমাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবেই বহু রোগকে নিজেই মোকাবিলা করে, এমনকি সারিয়েও দেয়। শরীরের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধ করার ও জীবাণু ধ্বংস করার যে জটিল ক্ষমতা রয়েছে তার সাহায্যে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বহু আক্রমণই সে আপনিই সারিয়ে দেয়। পাকস্থলী ফুটো হয়ে গেলে পেটের মধ্যে থাকা ওমেন্টাম আপনিই ঐ ফুটোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে ও ঐ ফুটোটিকে বন্ধ করার চেষ্টা করে। এ-ধরনের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যা কমলতে পারী-রিক ত্রুটি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত আহত রোগের ক্ষেত্রে কমবেশি প্রযোজ্য।

কিন্তু শরীরের এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জীবাণুর সংখ্যা যদি এই সীমার বাইরে হয় তখন শরীরের পক্ষে তার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। ফলে রোগী মারা পড়ে। গত শতকে হাজার বছর ধরে তাই-ই হয়ে আসছিল। কিন্তু গত ৫-৬ দশকের মধ্যে মানুষ জীবাণুকে মারার জন্য ওষুধ আবিষ্কার করেছে যা বাইরে থেকে শরীরে ঢোকালে ঐ জীবাণু মারা পড়ে এবং রোগী বেঁচে যায়। বর্তমানে এই ওষুধ তথা অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া সাম্প্রতিক মানবসভ্যতাকে কল্পনা করা যায় না। আকুপাংচার জাতীয় কোনো চিকিৎসার মাধ্যমে শরীরের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলে দাবি করা হয়, দেখা যাচ্ছে সেগুলিও এ ধরনের ওষুধের সমকক্ষ আদৌ নয়। এই ধরনের অনেক ওষুধ ঠিক কিভাবে কাজ করে তা সবসময় সম্পূর্ণ জানা না গেলেও, কাজ যে করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে কখনো আরো উন্নত কোনো ব্যবস্থার ফলে হয়তো ছোটবেলাতেই টীকা দিয়ে সারাজীবনের জন্য জীবাণু প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করানো যাবে, কিন্তু বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিকই চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা শরীরের কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটালেও।

কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা শুধু ওষুধপত্র নয়। অস্ত্রোপচার, রক্তসঞ্চালন, শারীরিকশ্রম, সূর্যরশ্মির প্রয়োগ, ব্যায়াম তথা ফিজিওথেরাপি, মানসিক ও সামাজিক দিকের প্রতি সতর্কতা ইত্যাদি অনেককিছুই এই তথাকথিত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত বা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকদের অনুসরণ করতে হয়। এই চিকিৎসা-ব্যবস্থার শাখাগুলোর পুরনো বহু ওষুধও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এক সময় যা ছিল শুধু অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical), পরে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে (অন্তত একটি স্তর অবধি) পরীক্ষিত হয়ে এই চিকিৎসাব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে। পেরুর গ্রাম্য চিকিৎসকেরা যেমন কুইনাইনের সন্ধান দিয়েছেন, তেমনি ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা দিয়েছেন রক্তচাপ কমানোর ওষুধ রিসার্পিনের সন্ধান সর্পগন্ধা গাছ থেকে (তবে এটির ব্যবহার হতো পাগলামির চিকিৎসায়)। অর্থাৎ এ চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোনো কিছুই ব্রাত্য নয়, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়া চাই। তথাকথিত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির বাইরে যে-সব চিকিৎসায় অন্তত কিছু ক্ষেত্রে কার্যকারিতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে সেগুলিও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং হচ্ছেও। এ ব্যাপারে হোমিওপ্যাথি, আকুপাংচার, আকুপ্রেশার প্রয়োগ, বিভিন্ন গ্রামীণ বা আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতি, ইত্যাদি অনেককিছুকেই বিবেচনা করা যায়।

কিন্তু মুশকিল হয় অতিবিজ্ঞানীদের নিয়ে বা মেকি বিজ্ঞানমনস্কদের নিয়ে। অপবিজ্ঞানের পাশাপাশি অতিবিজ্ঞান আস্তিকতার সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে দেখতে চায়। গোঁড়ামিতে, বৈজ্ঞানিক মনের চেয়ে প্রচলিত বিজ্ঞানের পরিধিতে কোনো কিছু চূড়ান্তভাবে যাচাই না হলে তাকে ব্রাত্য বা অসম্মানীয় বলে বর্জন করার মানসিকতার সৃষ্টি হয় এর ফলে। শরীরের মতো বহু ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত একটি সম্ভাবনাপূর্ণ স্তরের উপর কাজ করা নানা চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যাপারে-অনেকাংশের কারণে, এই অতিবিজ্ঞানী দাম্ভিক মানসিকতা সেগুলিকে আবশ্যিকভাবে সম্মান দেখানোর প্রয়োজনীয়তা বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব অনুভব করে না।

তথাকথিত বিকল্প চিকিৎসা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের অনেকে আবার অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বিপরীতে অপবিজ্ঞানী মানসিকতার পরিচয় দেন। তার একটি বড় উদাহরণ এই 'বিকল্প চিকিৎসা' কথাটিই। চিকিৎসা কখনোই বিকল্প বা প্রাথমিক হতে পারে না। যা-ই অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করে এবং সুস্থ শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করে সেটিই চিকিৎসা। তার পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু যারা 'বিকল্প চিকিৎসা' কথাটির ব্যবহার করেন তারা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, তথাকথিত অ্যালোপ্যাথি বা আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতিই প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, অন্যান্য-গুলি তার বিকল্প মাত্র। কোনো বিশেষ অসুস্থতার মোকাবিলার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত, সবচেয়ে নিরাপদ, ও কার্যকর একটি চিকিৎসাই কাম্য। মানুষ এখনো তা জানে না, ভবিষ্যতেই তা হয়তো জানবে, কিন্তু তার চেষ্টাটাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চালিয়ে যাওয়া দরকার। এই চিকিৎসার নানা অঙ্গ থাকতে পারে যার অন্যতম হতে পারে ঐ তথাকথিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা। কিন্তু 'বিকল্প চিকিৎসা' কথাটির মধ্য দিয়ে এমন মানসিকতাই প্রকাশ ঘটে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত দিকগুলিকেও যেন অস্বীকার করে তথাকথিত বিকল্প চিকিৎসাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিকল্প চিকিৎসার প্রচারকেরা এবং বিকল্প চিকিৎসার বিরোধীরা উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্যেও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই 'বিকল্প চিকিৎসার' ভাবনাটিকে লুফে নিয়ে প্রচার করেন। প্রথম দলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতিকে অস্বীকার করা ও দ্বিতীয়-দলের ক্ষেত্রে তা তথাকথিত অ্যালোপ্যাথি বা পাশ্চাত্য চিকিৎসার নিজ পরিমণ্ডলের বাইরের পদ্ধতিগুলিকে হেয়জ্ঞান করা। এই ধরনের মানসিকতা থেকে 'যার নেই কোনো গতি, সে করে হোমিওপ্যাথি' বা 'অ্যালোপ্যাথি মানে এলোপাথাড়ি চিকিৎসা' এ ধরনের কথাবার্তার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিতে সব ক্যান্সার সেরে যায়, আকুপাংচারে গোলিওর সুঁচিয়ে যাওয়া মাংসপেশীও ফুলে ফেঁপে ওঠে, ম্যাগনেটোথেরাপিতে সমস্ত রকমের

রোগ সারানো যায় – এ জাতীয় নানা ধরনের প্রচার চলে।

বাণিজ্যিক মানসিকতা পুরো ছবিটিকে আরো জটিল করে তোলে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যেমন এই ব্যবস্থার অধীনস্থ, তেমনি তথাকথিত বিকল্প ও অপ্রমাণিত পদ্ধতিগুলির দিকেও ব্যবসা ও পুঁজি হাত বাড়ায়। অপ্রমাণিত বা সন্দেহজনক কার্যকারিতার ওষুধপত্র নিয়ে ব্যবসা করা, অনুমোদিত গাছগাছড়ার ওষুধের বোতল বা মোড়কবন্দী করে নির্বিবাদে বিক্রি করা, বা এ ধরনের নানা চিকিৎসাকে চটকদারভাবে সাধারণ রোগীদের সামনে হাজির করা – ইত্যাদি নানা কৌশল চলে। শুধু আমাদের দেশে আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্রের ব্যবসা করে এমন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওষুধ কোম্পানির সংখ্যা ৫০০০ এবং তারা বছরে ৬০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। এসব ওষুধের সবগুলিই যে অকার্যকর তা নয়, কিন্তু কোনটা কতটা কার্যকর, কিভাবে কাজ করে ইত্যাদিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানার চেষ্টার ব্যাপারটি ব্যবসার সাথে নিতান্তই ফালতু হয়ে পড়ে।

সরকারি চাতুরিও এ-ধরনের চিকিৎসার অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দেয়। একদিকে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ দেশের মানুষকে না দিতে পেরে তথাকথিত বিকল্প এইসব চিকিৎসাকে ঐতিহ্য ও জনমুখী চিকিৎসার মোড়ক পরিয়ে জনসাধারণের চোখের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ইউনানির মত প্রাচীন একটি চিকিৎসাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিমার্জিত না করে এবং তার উপর মৌলিক গবেষণা না চালিয়েই তার সরকারি স্বীকৃতি ও কলেজ-হাসপাতাল তৈরির কাজ চলছে। একইভাবে আয়ুর্বেদের পেছনেও একই সরকারি উদ্যম রয়েছে। বাস্তবে অর্থোপার্জনের জন্য এইসব পাশ করা আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা অ্যালোপ্যাথি ওষুধই বেশি ব্যবহার করেন, গ্রামাঞ্চলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা চর্চা করতে গেলেও তাই করেন এবং আয়ুর্বেদী ওষুধ নেওয়ার রোগীও বিরল। আয়ুর্বেদের মূল দার্শনিক তত্ত্ব যেমন, তেমনি তার ওষুধপত্রের উপর প্রকৃত গবেষণা করে তার যুগোপযোগী পরিমার্জনা ও বিকাশ না ঘটিয়ে, এ ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অর্থহীনতা ছাড়া বিশেষ কিছু প্রমাণ করে না। সরকারিভাবেই আয়ুর্বেদের তথাকথিত ওষুধপত্র ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০-এর আওতার বাইরে থেকে গেছে। ফলে সেগুলি কার্যকর কিনা বা তার থেকে ক্ষতি হতে পারে কিনা, এ-ধরনের বিচার না করেই যে কেউ গাছ-গাছড়ার ওষুধ আয়ুর্বেদিক নাম দিয়ে বিক্রি করতে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আমাদের দেশে তা হচ্ছেও।

তবে আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি বা আকুপাংচার জাতীয় নানা ধরনের চিকিৎসা যাঁরা করেছেন, তাঁরা বহু রোগীর নিঃসন্দেহ আরোগ্যের কথা বলেন। ব্যাপারটি কতটা সত্যি, সত্যি হলে কিভাবে ঘটেছে, তা জানলে কিভাবে তাকে একটি সর্বসম্মত চিকিৎসার ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা যায় এসব নিয়ে গবেষণামূলক কাজেও উদ্যোগিতা বর্জন করে আন্তরিকভাবে করা দরকার। সরকারিভাবে কারোও তাগিদ দিয়ে তাদের অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগকে উৎসাহিত করাটার মধ্যে এই সন্ধান ও উন্নতি ঘটানোর আন্তরিকতা তেমন নেই, বরং আছে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ, পিঠ বাঁচানো ও জনমত

ঠকানোর চেষ্টা।

এই সরকারি অপদার্থতার আরেকটি বহিঃপ্রকাশ ঘটে তথাকথিত বিকল্প চিকিৎসার প্রচারকদের ওপর নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না করার মধ্য দিয়ে। বলা যায় এক নৈরাজ্য চলছে। বিকল্প চিকিৎসা শেখানোর কলেজ, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদি খুলে তারা দরিদ্র দেশের বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতারণা করছে এবং সহজে ডাক্তার বানিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কেউ হাইকোর্টের আইনী সাহায্য নেয়, কেউ নেয় পাকস্তরা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, আবার কেউ বা দোহাই দেয় ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য ও জনমুখী চিকিৎসা গড়ার মানবিক প্রচেষ্টার। আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইলেকট্রোহোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক, ইউনানি, আকুপাংচার, তিব্বতী চিকিৎসা, ইন্দোঅ্যালোপ্যাথি, নেচারোপ্যাথি, অস্টিওপ্যাথি, ম্যাগনেটোথেরাপি, হাইড্রোথেরাপি, যোগ, হিপনোথেরাপি, ক্রিস্টাল থেরাপি, কালার থেরাপি, অ্যারোম্যাটিক চিকিৎসা, বাখ্ ইত্যাদি অজস্র জানা-অজানা, প্রমাণিত-অপ্রমাণিত যে-চিকিৎসাই তথাকথিত অ্যালোপ্যাথির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মনে করা হয়, তাদের শেখানো চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। কিছু টাকা নিয়ে নামমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে, কখনো বা আদৌ না দিয়েও জোগাড়-করা অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের বিনিময়ে নানা ডিগ্রি দিচ্ছে : যেমন এম-বি. বি. এস (বায়ো) বা (এ এম – অর্থাৎ অল্টারনেটিভ মেডিসিন), এম-ডি, পি এইচ ডি ইত্যাদি ইত্যাদি। সরকারি উদাসীনতার সুযোগে এরা যে শুধু মানুষ ঠকাচ্ছে তাই-ই নয়, এই ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতিগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা, বৈজ্ঞানিক বিকাশের পথ, বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ করার উপায়গুলিকেও হাস্যকর ও অসম্ভব করে তুলছে। দেখে শুনে মনে হয়, বিকল্প চিকিৎসারই বিকল্প এরা মানুষের উপর চাপাতে চাইছে। এই ব্যবসা শুধু ভারতে নয় ইয়োরোপ আমেরিকার নানা দেশেও বেশ চালু।

তথাকথিত বিকল্প চিকিৎসাকে ঘিরে এই অসামাজিক ব্যবসায়িক মানসিকতা এখন বিভিন্নভাবেও আন্তর্জাতিক চরিত্র পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন চিকিৎসার অভিজ্ঞতাগুলি নতুন আন্তর্জাতিক আইন, প্যাটেন্ট ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর করায়ত্ত হতে শুরু করেছে। ভারতের যেমন গাছের পেটেন্ট নিচ্ছে আমেরিকা বা জার্মানির ব্যবসায়ীরা। বহু শত বছরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ যে জ্ঞান একসময় মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে (যত অসম্পূর্ণ ভাবেই তা মিটুক না কেন) এবং উপযুক্ত জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে একটি আদর্শ চিকিৎসাপদ্ধতি গড়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে, তা বিভিন্ন স্তরে ব্যবসা ও বিভিন্ন ধরনের অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার চাপে পড়ে বিকৃত হচ্ছে এবং আরো বিকৃত অবাঞ্ছিত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে বলে আশংকা হচ্ছে।

আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক সমাজসচেতন ব্যক্তিরা একদিনেই অবশ্য এই সমস্যাকে পাল্টে দেওয়ার মত শক্তি রাখেন না। কিন্তু তাঁরা অবশ্য বর্তমানের মোহ ও অতীতজ্ঞানের বাগাড়ম্বর থেকে মুক্ত হয়ে একটি আদর্শ চিকিৎসাপদ্ধতি গড়ে তোলার আন্দোলনকে সামনে নিয়ে আসতে পারেন।

১৯৯৫ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ

আশীষ মুখোপাধ্যায়

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে-কোন মানুষের কাছেই চিত্তাকর্ষক এবং অবাক হবার মতো এক বিস্ময়কর, সম্পূর্ণ নৈসর্গিক ঘটনা। আমাদের স্মরণকালের মধ্যে ১৯৮০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির সূর্যগ্রহণ নিয়ে যে হৈ চৈ হয়েছিল তা অনেকেরই মনে আছে। আগামী ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর কালীপুজোর দিন সকালবেলায় আবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা, যার ছায়া রাজস্থান থেকে শুরু করে গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে রাজস্থানের ঝুনঝুনু, জয়পুর, উত্তর প্রদেশের আগ্রা, ফতেপুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, বিহারের ডাল্টনগঞ্জ, রামগড় ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, তমলুক এবং ডায়মন্ডহারবারের উপর দিয়ে যাবে। পরবর্তী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ভারতবর্ষ থেকে আবার দেখা যাবে ১১ আগস্ট ১৯৯৯ সালে। তবে ঐ সময় বর্ষায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং গ্রহণের স্থায়িত্বও তুলনামূলকভাবে কম হবে।

গ্রহণ কেন হয়

আমরা জানি, আলো সরলরেখায় চলে এবং তা অস্বচ্ছ পদার্থে বাধাপ্রাপ্ত হলে ছায়ার সৃষ্টি হয় আলোর উৎসের উল্টোদিকে এবং ছায়া অস্বচ্ছ পদার্থের আকারেই প্রতিফলিত হয় (৩৮ পাতার ছবি)। আলোর উৎস যেহেতু একবিন্দু থেকে আসছে না—ফলে উৎসের আয়তন মতো ছায়ারও দুটি অংশ তৈরি হয়—প্রচ্ছায়া (umbra) ও উপচ্ছায়া (penumbra) অংশ। ৩৮ পাতার ছবিতে এটা বোঝানো হয়েছে।

সূর্যের ব্যাস চাঁদের ব্যাসের প্রায় চারশ গুণ, আবার সূর্যের দূরত্বও পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের প্রায় চারশ গুণ; ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদকে প্রায় সূর্যের সমানই দেখায় (½° কৌণিক ব্যাস)।

পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ পথ এবং চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ পথ ডিম্বাকৃতি হওয়ায় পৃথিবী থেকে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব সবসময় এক থাকে না—ফলে আকারেও তুলনামূলকভাবে তাদের সামান্য ছোটবড় দেখায় পৃথিবী থেকে।

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একই সরলরেখায় এসে গেলে, আমাদের চোখে চাঁদের গোলক সূর্যের গোলককে ঢেকে দিলে সূর্যগ্রহণ হয়। সেইরকমভাবে চাঁদ অন্যদিকে গেলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়লে পৃথিবী থেকে চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই হিসাবে প্রতি পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ এবং প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হতো—যদি চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ পথ এবং পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ পথের কক্ষতল দুটি একই হতো। কিন্তু তা না হয়ে কক্ষতল দুটি পরস্পরের সঙ্গে ৫° কোণে হেলে থাকায় যদিও প্রতি ২৯ দিনে কক্ষতল দুটি দুই বিন্দুতে ছেদ করে [যাদের রাহু (Northern Node) ও কেতু (Southern Node) বলে] কিন্তু তারা সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে ঐ সময় একই সরলরেখায় নাও পড়তে পারে। চাঁদ ঐ সময় সূর্য-পৃথিবীর কক্ষতল থেকে বড়জোর ১°০৬′-এর মধ্যে থাকলে তবে গ্রহণ হবার সম্ভাবনা থাকে। সঙ্গে ৩৯ পাতার ছবিতে তা দেখানো হয়েছে।

চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই দৃশ্য চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া একইরকম দেখা যায়। ফলে স্থানবিশেষে তার রূপে একটা হেরফের হয় না। কিন্তু সূর্য-গ্রহণের বেলায় চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কোথায় পড়বে তার উপর নির্ভর করবে—তা পূর্ণগ্রাস হবে না আংশিক হবে। পৃথিবীতে যখন সূর্যগ্রহণ চাঁদে তখন পৃথিবীগ্রহণ। পৃথিবীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ চাঁদে তখন পৃথিবীগ্রহণ। চাঁদে এই সূর্যগ্রহণের সময় তুলনামূলকভাবে অনেক দীর্ঘস্থায়ী, পৃথিবীর ব্যাস চাঁদের ব্যাসের তুলনায় অনেক বড় বলে। চাঁদের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর যে-সব স্থানে পড়ে সে স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এবং উপচ্ছায়া স্থান থেকে আংশিক গ্রহণ দেখা যায়। বাকি অংশে আদৌ সূর্যগ্রহণ হচ্ছে কিনা তা বোঝাই যায় না।

সূর্য কাছে এবং চাঁদ দূরে থাকবে, এই বিশেষ অবস্থিতিতে যখন চাঁদের ছায়া পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না অর্থাৎ ছোটো চাঁদ বড় সূর্যকে ঢাকতে পারে না, তখন বলয়গ্রাস হয়। তখন সূর্যকে বলয় (Ring) মতো দেখায়।

আলো অস্বচ্ছ পদার্থে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছায়ার সৃষ্টি করে আলোর উৎসের উল্টোদিকে এবং ছায়া অস্বচ্ছ পদার্থের আকারই প্রতিফলিত করে।

চিত্র : ১

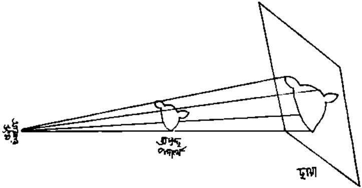

গ্রহণের স্থিতি

এবারের গ্রহণের সময় চাঁদের ছায়ার আয়তন হবে ৪০-৫০ কি.মি. × ৮০-১০০ কি.মি. এবং তা ঘণ্টায় ৫০০০ কি মি. গতিতে যাবে। ঐ গতি ও ছায়ার আয়তনের কারণ পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি ও তার ভূত্বকের বক্রতা। ছায়া তেরছাভাবে পড়লে বেশি জায়গা নেয় তো বটেই। তেমনি ওপর থেকে খাড়াভাবে পড়লে আয়তন ও গতিরও তারতম্য ঘটে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, পৃথিবী নির্দিষ্ট গতিতে নিজের অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে প্রায় ৩০ কি.মি. প্রতি সেকেন্ড গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। চাঁদও ঐ সময় নির্দিষ্ট গতিতে তার উল্টোদিকে সরে যাচ্ছে। চাঁদের ছায়া পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রথম যেখানে স্পর্শ করে তাকে সূর্যোদয় বিন্দু এবং শেষ যেখান থেকে লীন হয় তাকে সূর্যাস্তবিন্দু বলে। ভারতে এবারের গ্রহণ সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হবে রাজস্থানে এবং শেষ হবে প্রায় এগারোটা তিরিশ মিনিটে ডায়মন্ডহারবারে।

গোল জিনিসের ছায়া গোলই হবে — কিন্তু চাঁদের ওপর যে পাহাড়-পর্বত উপত্যকা ইত্যাদি আছে তারজন্য ছায়ারও সামান্য হেরফের হওয়াই স্বাভাবিক। চাঁদের পার্শ্বরেখার (Profile) জন্য সূর্যের আবৃত অংশেরও হেরফের হবে, কোথা থেকে দেখছি তার ওপর। কেন্দ্ররেখার যত কাছে থাকা যাবে গ্রহণ তত দীর্ঘস্থায়ী হবে। পূর্ণগ্রাসে হঠাৎ দিনদুপুরে রাতের সূচীভেদ্য অন্ধকার নেমে আসবে, এবং ঐ অবস্থা স্থায়ী হতে পারে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশে ৭ মিনিট ৪০ সেকেন্ড পর্যন্ত। যেটা ২১৮৬ সালের ৫ জুলাই-এর সূর্যগ্রহণে হবার সম্ভাবনা। এবারের গ্রহণ ১ মিনিট ২২ সেকেন্ড স্থায়ী হবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় একেবারে পূর্বদিকে। তেমনি পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলে বা প্লেনে করে ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়লে গ্রহণের স্থিতি আরও কিছুটা বাড়ানো যায় বৈকি।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চন্দ্রগ্রহণের চেয়ে সূর্যগ্রহণ বেশিবার হয়। প্রতি সাতটি গ্রহণের মধ্যে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের অনুপাত ৫ : ২ বা ৪ : ৩। তবে অধিকাংশ সূর্যগ্রহণ সমুদ্রপৃষ্ঠে বা পর্বতমালার ওপর দিয়ে গেলে নজরে পড়ে না। জনাকীর্ণ লোকালয়ের ওপর দিয়ে তা গেলে তবেই প্রাধান্য পায়। সেখানে যন্ত্রপাতি বসিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ এনে দেয়। এই সুযোগ সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা নিজ নিজ বিষয়ে নানা গবেষণা চালাবার সুযোগ নেন। যদিও গ্রহণ ছাড়া কৃত্রিমভাবে Cornograph দিয়ে সূর্যকে ঢেকে সূর্যের ছটা মণ্ডলের ছবি তোলা বা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, কিন্তু পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ছাড়া কতকগুলি বিশেষ বিষয় পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। তাছাড়া অন্যভাবে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এই সময়ে মিলিয়ে নেওয়া হয়। সূর্যের সাধারণ অবস্থায় আমরা এর আলোকমণ্ডল দেখে থাকি। কিন্তু সূর্যের ছটা মণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও জ্যোতিশিখার ইত্যাদি দেখা যায় না। শুধু সূর্যগ্রহণেই তাদের ছটা দেখার সুযোগ আসে। একটি কৌতূহলোদ্দীপক যে, ১৮৬৮ সালের ১৮ অগাস্ট-এর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় ভারতের মানমন্দির থেকেই প্রথম সূর্যের আবহাওয়ায় হিলিয়ামের অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং ২৩ বছর পরে সূর্যের হিলিয়াম নাম থেকেই পৃথিবীতে হিলিয়ামের অস্তিত্বের আবিষ্কার সম্ভব হয়। সূর্যের অভ্যন্তরে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৬৫'৭ কোটি টন Hydrogen সংযোজিত হয়ে ৬৫,২৫৫ কোটি টন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা সূর্যের শক্তির উৎস। ১৮৯৮ সালের ২২ জানুয়ারি গ্রহণে মহারাষ্ট্রের সাঁগলি থেকে বৈজ্ঞানিক John Fehrshed সূর্যের কিরীটমণ্ডলে অতিবেগুনী রশ্মির বর্ণালী দেখতে পান এবং স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডা. মেঘনাদ সাহা তার ওপর গবেষণা করে ঐ বর্ণালীর মূল তাপীয় আয়নন সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন।

প্রতি ২৯ দিনে কক্ষতল দুটি দুই বিন্দুতে ছেদ করে। কিন্তু তারা সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে ঐ সময় একই সরলরেখায় নাও পড়তে পারে। চাঁদ ঐ সময় সূর্য-পৃথিবীর কক্ষতল থেকে অন্তত ১°৩′৩৬″-এর মধ্যে থাকলে তবেই গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে।

চিঃ : ১

১৯১৯ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি আইনস্টাইনের বক্তব্য যে আলোক ও মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকর্ষিত হয় এ বিষয়ে পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। সেইমতো ব্রাজিলের সোব্রাল এবং প্রিন্সিপ উপসাগরের প্রিন্সিপ দ্বীপের উপর দুটি গবেষকদল পাঠান। যারা ঐ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করেন।

মহাভারতে আছে জয়দ্রথ বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তার চক্র দিয়ে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছিলেন অর্জুনের জন্য কৃত্রিম সৃষ্টি করতে। হয়তো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে তাঁর তা জানা থাকায় তিনি সেই সুযোগ নিতে পেরেছিলেন।

সূর্যগ্রহণ নিয়ে আমাদের করণীয় কী ?

আগামী সূর্যগ্রহণকে সামনে রেখে আমাদের অনেক কিছু করার আছে যা শুরু করা উচিত আর দেরি না করে।

১. স্থান নির্বাচন : ঠিক করতে হবে কোথা থেকে গ্রহণ দেখা হবে, মানচিত্রের মূল মধ্যরেখার যত কাছে হবে সেই জায়গায় তত বেশিক্ষণ ধরে গ্রহণ দেখা যাবে এবং যারে সরে গেলে সময়ও সেই মতো কমবে এবং উপচ্ছায়া অঞ্চল থেকে আলো অনেক কমলেও পুরো অন্ধকার হবার ফলে যে বিশেষ নৈসর্গিক ঘটনার সূচনা হয় বা Diamond Ring-এ (পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর অদ্ভুত সৌন্দর্যের প্রকাশ) তা আদৌ দেখা যাবে না। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেখানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে দর্শনার্থীদের আগমনে ভ্রমণ ব্যবসা বিশেষ লাভবান হয়। আমাদের দেশেও এর সুযোগ আসবে কিনে অনেক। যদি আমরা পরিকল্পিতভাবে এ-কাজটায় হাত দিই, ঐ জায়গায় স্কুল, কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি, গ্রামপঞ্চায়েত যদি এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসেন, তবে কাজটা আরো সহজ হয়।

২. সময় মাপজোখ : গ্রহণকে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত চার ভাগে ভাগ করা যায়। চাঁদ যখন সূর্যকে আড়াল করতে শুরু করে তখন হয় প্রথম স্পর্শ। দ্বিতীয় স্পর্শ যখন সূর্য পুরো ঢাকা পড়ে যায় চাঁদের দ্বারা। যখন সূর্য বেরুতে শুরু করে তখন তৃতীয় স্পর্শ এবং চতুর্থ স্পর্শ সূর্য যখন পুরো মুক্ত হয়। এই সময়গুলি ঠিকমতো নোট করা বিশেষ জরুরি কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে এই সময়গুলি বিভিন্ন হবে। পরে এই সময়-গুলির তথ্য অনেক বেশি জায়গা থেকে নির্ভুলভাবে পেলে চন্দ্র-সূর্যের সঠিক আকার, দূরত্ব ও অন্যান্য তথ্যের পরিপূরক হিসাবে তাঁদের কাজে লাগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্য।

সময় ঠিকমতো রাখতে হলে স্টপ ওয়াচ লাগবে। আজকের দিনে অনেক হাতঘড়ির সঙ্গেই এটা পাওয়া যায় বা কাজে লাগানো যায়। সেই ঘড়ি ঠিকমতো সময় সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয় রেডিও বা টি.ভি.-র সময় সংকেতের সঙ্গে। তারপর বারবার সময় মাপা শুরু না করলে ভুলের পরিমাণ বেশি হবে। সময় মাপার ক্ষেত্রে ২য় এবং ৩য় স্পর্শের সময় দুটিই বেশি জরুরি ও সহজে বোঝা যায়।

৩. সাবধানতা : সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকানো বারণ, তাই প্রয়োজনীয় কাচ বা ফিল্টার-এর ব্যবস্থা করা ও যোগাড় করা দরকার। জলের পাত্রে হলুদ দিয়ে সেইখানে সূর্যের ছায়া দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সূর্য থেকে আলো ও তাপ ছাড়াও অদৃশ্য, বিটা, গামা, অতিবেগুনী রশ্মি নির্গত হয়। চাঁদ আড়াল হওয়ায় রশ্মিগুলি কমতেই থাকে। কিন্তু ঐ ফিল্টারে ঐসব রশ্মি আটকায় না বলে সে-সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

৪. নিরাপদভাবে গ্রহণ দেখার পদ্ধতি : আয়নার ওপর কাগজ আটকে সেই কাগজের মধ্যে ২ সে. মি. আকারের ছিদ্র করে সেই আয়নায় সূর্যের আলো, ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে, ঘরের দেওয়ালে ফেললেও সূর্যের সুন্দর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। এছাড়া পিচবোর্ড বা টিনে ১ মি.মি.-এর ছোট্ট ছিদ্র করে নিচে সাদা কাগজের ওপর সূর্যের আলো ফেললেও সুন্দর সূর্যের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। এতে সূর্যের দিকে না তাকিয়ে অনেকে একসঙ্গে দিনে সূর্যের ছোটোবড় হওয়া লক্ষ করতে পারেন। তবে এগুলিও আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা দরকার, কারণ ঐ গ্রহণের সময় সূর্য কোথায় কোন্‌দিকে থাকবে, রোদ কোন্‌দিকে পড়বে, আয়না কিভাবে বসালে তার আলো কোন্ ঘরে কিভাবে ঢোকানো যাবে সবই ভাবতে হবে।

৫. রত্নমালা : চাঁদের দেহের আড়ালে সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে চাঁদের পূর্বপ্রান্ত ঘিরে একটি সরু আলোর রেখা আর তার মাঝে মাঝে আলোকবিন্দু দেখা যায়। একে বাংলায় বলে

আলোর উৎস যেহেতু এক বিন্দু থেকে আসছে না – ফলে উৎসের আয়তন মতো ছায়ারও দুটি অংশ তৈরি হয় – প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া।
চিঃ : ৩

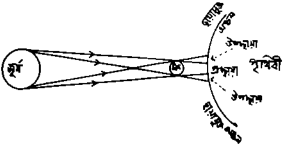

মুক্তমালা। চাঁদের পাহাড়-পর্বত-উপত্যকার জন্যই এটা হয় যার ফাঁক দিয়ে আলো আসে। ডায়মন্ড রিং-এর মতোই দেখায় সূর্যগ্রহণের তৃতীয় স্পর্শের সময়।

৬. তাপমাত্রার হ্রাস : সূর্যগ্রহণের সময় আবহাওয়ার তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়। সেই তাপমাত্রা কিরকম কমছে প্রতি ১৫ সেকেন্ড অন্তর একটা গ্রাফ কাগজে প্লট করা যেতে পারে। গ্রহণের ১০ মিনিট আগে থেকে শুরু করে শেষ হবার ১০ মিনিট পর পর্যন্ত শুধু একটা ঘড়ি ও থার্মোমিটার হলেই চলবে। তবে বাতাসের চেয়ে মাটি, পাথর ইত্যাদির তাপমাত্রা তাড়াতাড়ি বাড়ে ও কমে।

৭. প্রাণীর আচরণ : পাখি, পোকামাকড় ও জন্তু-জানোয়ার হঠাৎ দিনের বেলা সূর্যের আলো কমতে থাকায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাদের আচার-আচরণের ওপরও নজর রাখা যেতে পারে। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে।

৮. ছায়া লহরী : গ্রহণের সময় সূর্য যত ঢাকা পড়তে আরম্ভ করে, গাছের নিচে পাতার ফাঁক দিয়ে যে আলো নিচে মাটিতে পড়ে, তাদের প্রতিবিম্বতেও ঐ সূর্যের আকারের প্রভাব থাকে, ফলে আলোছায়ার ঢেউ (Shadow band)-এর ছায়ালহরীর সৃষ্টি হয়। ভালো করে নজর করলে তবেই এগুলি দেখা যায়। গাছের তলায় সাদা চাদর বিছিয়ে এগুলি দেখতে হয়। ছায়ালহরী হয় পৃথিবীর তাপমাত্রা কমার ফলে, বাতাসে আলোর প্রতিসরণের (Refraction) তারতম্যের প্রভাবে। এটা একরকম দৃষ্টির ভ্রম যার ফলে মনে হয় চারদিকে সাপেরা যেন বেড়াচ্ছে।

৯ অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ : সূর্য পুরো ঢাকা পড়ে গেলে মুহূর্তের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে যায়, আকাশে তারা ফুটে ওঠে। এই সময় সূর্যের কাছে অন্য কোন ধূমকেতুর থাকলে নজর পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া পরিচিত গ্রহনক্ষত্রদের চিনে নেওয়া এবং সূর্য যে রাশিতে অবস্থান করছে জানাও। এবারের গ্রহণে সূর্য কন্যারাশিতে অবস্থান করছে। রাশিচক্র সম্বন্ধে চিনে নেওয়ার জন্য আকাশ-পরিচিতিও একটু দরকার, সেজন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু দেখবার থাকে যে, ঠিকমতো অভ্যাস না করলে সবটাই ভণ্ডুল হবার সম্ভাবনা।

১০. দূরবীক্ষণ বা Telescope-এর সাহায্যে সৌরকলঙ্ক দেখা : যাদের টেলিস্কোপ আছে বা জোগাড় করা সম্ভব হবে তারা টেলিস্কোপে ফিল্টার লাগিয়ে গোটা সূর্যগ্রহণ অবলোকন করতে পারে। এই সময় সৌরকলঙ্ক থাকলে তার সংখ্যা ও অবস্থান কাগজে এঁকে নেওয়া উচিত। বাইনোকুলারের মুখে ওয়েল্ডিং গ্লাস লাগিয়েও গ্রহণ দেখা যায়। তবে চোখের ব্যাপারে কোনো মতেই কোনো অসাবধানতা সমর্থনযোগ্য নয়। তার ফল হতে পারে মারাত্মক।

১১. কুসংস্কার : গ্রহণ নিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যেই অনেক কুসংস্কার আছে। ঐ সময়ে খেতে নেই, তৈরি করা খাবার ফেলে দিতে হয় ইত্যাদি। গ্রহণ দেখাও অনেকের কাছে নিষেধ। হয়তো অর্থলোভী মনে রাহুকেতুর সাপেদের এড়াতে বা সূর্যকে গিলেফেলা রাহুর ভয়েই এমন ব্যবস্থা। কিন্তু আজকের দিনে আমরা যখন পরিষ্কার বুঝতে পারি সূর্যের রেখার মধ্যে চাঁদ এসে যাওয়ার ফলে গ্রহণ হচ্ছে। ফলে নতুন জীবাণুর জন্ম, খাদ্যের দূষিত প্রভাব ইত্যাদির প্রশ্ন অবান্তর। গ্রহণের মতো প্রাকৃতিক ঘটনা মানুষের বিজ্ঞানবোধকে সহজে প্রভাবিত করে বলেই আমরা সবাইকে গ্রহণ দেখতে ও বুঝতে বলছি।

❑ আগামী সংখ্যায় ২৪ অক্টোবর কোথায়, কখন, কতক্ষণ গ্রহণ দেখা যাবে।

আগামী সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে-বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক তথ্য সম্বলিত একটি ইংরিজি পত্রিকা *Nightfall on a Sunny Morning* সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।
প্রকাশক : *Confederation of Indian Amateur Astronomers*। দাম : ২০ টাকা।
বিশদ সংবাদের জন্য যোগাযোগ : আশীষ মুখার্জি
৩২ বি- বি, হরমোহন ঘোষ লেন। কলকাতা ৭০০ ০৮৫।

ভারতবর্ষ কি আমেরিকার ডাস্টবিন ?

পাচু রায়

১৯৯৩ সালে ভারতবর্ষের বুকে সাত হাজার আটশ' একচল্লিশ মেট্রিক টন মার্কিনী প্লাস্টিক আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এবং কাজটা হয়েছে শুল্ক বিভাগের যাবতীয় অনুশাসন মানা করেই। অর্থাৎ ভারত ও মার্কিন উভয় দেশের সরকার বাহাদুরের জ্ঞাতসারে বন্দোবস্ত অনুযায়ীই। মার্কিন শুল্ক বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, একমাত্র ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে রপ্তানিকৃত মার্কিনী আবর্জনার শতকরা ৫৩ ভাগ চালান গেছে ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে। এই উপমহাদেশ এখন আমেরিকার ধাপা। অথচ ঠিক এর এক বছর আগে ১৯৯২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। মার্কিন মুলুক থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থের এই রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপারে নজিরে আছে আমাদের কাছে একই সঙ্গে আনন্দ ও দুঃখের ইতিহাস। দুঃখের ইতিহাস পাঠে বিদেশী পত্রিকাকে গাল গালিচা এবং খাঁকম্ভু কিছু সংযোগে আমদানিকারী বাহাদুর রাজনীতিক চোখের কোনো অসুবিধা থাকার কথা না। গ্রীনপিস ইন্টারন্যাশনাল ওয়েস্ট ট্রেড প্রজেক্ট-এর ডাইরেক্টর অ্যান লিওনার্ডের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশগত সাবলীলতে একটু চোখ মেলালেই প্রমাণ হবে আমাদের দুঃখের কারণ।

মার্কিন মুলুক থেকে ১৯৯২ সালে ৩১৭৫৭ মেট্রিকটন প্লাস্টিক আবর্জনা ভারতবর্ষে রপ্তানি করা হয়েছিল। ১৯৯৩-তে মোট ৭৮৪১'৮ মেট্রিকটনে উপনীত হয়। বৃদ্ধির হার শতকরা সাতাশগুণ ভাগের বেশি। নষ্ট হওয়া ব্যাটারি যেমন ১৯৯২-তে ভারতবর্ষে একেবারেই রপ্তানি হয় নি, ১৯৯৩-তে তা হয়েছে ১৪'৬ মেট্রিকটন। আবর্জনা রপ্তানির এই বন্দোবস্তকে একটা গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে—রি-সাইক্লিং বা পুনর্নবীকরণ! এই 'রি-সাইক্লিং'-এর এক চমৎকার (!) উদাহরণ দেখিয়ে ছিলেন অ্যান লিওনার্ড স্বয়ং কলকাতায় 'সার্ভিস্ সেন্টার' আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে [১৬ ডিসেম্বর '৯৪]। পাড়ির ব্যাটারির এই রকম রিসাইক্লিং-এ এক ভারতীয় কারখানায় তিনি গিয়েছিলেন (যে রকম কারখানা কলকাতা শহরের আশেপাশেও প্রচুর)। সেখানে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কায়দায় কিশোরেরা ভাঙা ব্যাটারির সিসার পাতগুলি খালিহাতে বিন্দুমাত্র সতর্কতা ছাড়াই সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে তুলে পরিষ্কার করছে (যেভাবে এই শহরের বহু ঐ জাতীয় কারখানায় কিশোরেরা করে থাকে)। এবং মজা হলো, মালিক এই সিসারপাত ও অ্যাসিডের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কারণ অ্যান যখন একটি সিসার পাত আঙুলে নিয়ে ছুঁতে যায় তখন মালিক তাকে নিরস্ত করে এবং বলে, ওটা বিষ। অ্যান উত্তর দেয়, 'ইটস্ পয়সনাস ফর অ্যান আমেরিকান, বাট নট ফর দীস ইন্ডিয়ান বেবিস, দেখো!' আমেরা এই কথাটাকেই বিবর্ধিত করলে দেখা যাবে, মার্কিন সরকার, মার্কিন পুঁজির মালিক এবং মার্কিন আবর্জনার আন্তর্জাতিক দালালরাও আবর্জনার বিষক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। মার্কিন মুলুকে প্রতিবছর সহস্র হাজারের বেশি রাসায়নিক প্রস্তুত হয় যা তা নিয়ে অন্য যৌগ বা মিশ্রণ। প্রতিবছর প্রায় এক হাজার করে নতুন নতুন রাসায়নিক মার্কিন কারখানা থেকে তৈরি হচ্ছে। এইসব কারখানা থেকে যে রাসায়নিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা নিক্ষেপের জন্য তাদের দেশের ভিতর আমাদের ধাপার মতন প্রায় তিন হাজার জায়গা আছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে গ্রীনপিস আন্দোলন-এর প্রসার ও সাধারণ মার্কিন নাগরিকের স্বাস্থ্যচেতনা এই জায়গাগুলিকে কমিয়ে এনেছে। তাই মার্কিন দালালরা খুঁজে বের করেছে সেইসব দেশ যেখানে অনায়াসে এইসব বিষাক্ত আবর্জনা চালান করা যাবে। এবং রিসাইক্লিং-এর গালভরা নামে এই কাজটি করলে তাদের দুপয়সাও ভালোরকম আয়ী হবে ফেক দালালি থেকে। একটি দেশের সচেতন সাধারণ মানুষ যখন আন্দোলন করে সেই দেশের সরকারকে বাধ্য করছে মানবিক আইন তৈরি করতে, তখন এগিয়ে আসছে সেই দেশেরই কিছু দালাল যারা এই আবর্জনা রপ্তানি করছে অন্য দেশে যেখানে এই ব্যাপারে আইনী কাঠামো নেই। ভারতবর্ষ একাই এক 'মিঠাকুরের আপন দেশ' যেখানে আবর্জনাসংক্রান্ত কোনও আইনই নেই। তাই এখানে ১৯৯৩ সালে যেখানে আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত প্লাস্টিক আবর্জনার পরিমাণ ছিল ৩ হাজার টোন, ১৯৯৩-এর প্রথম ন-মাসেই তা বেড়ে

দাঁড়াল ৭৪ হাজার কোটিতে। ১৯৯২ সালে তা ১১ কোটি টনে দাঁড়ায়। ধরনের আবর্জনা ভারতে আমদানি হয়েছে একমাত্র কানাডা থেকেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা প্লাস্টিক আবর্জনার কথা আগেই বলেছি। ১৯৯৩-এর প্রথম ৫ মাসে ইংল্যান্ড থেকে এদেশে সিসার আবর্জনা আমদানি হয়েছে ৫ লক্ষ কেজিরও বেশি। কানাডা থেকে সিসার আবর্জনা ১৯৯২ সালে এসেছিল ১০ লক্ষ কেজির বেশি। ঐ একই বছর অস্ট্রেলিয়া থেকে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কেজি সিসার ব্যাটারির আবর্জনা এ-দেশে আমদানি হয়েছে।

সিসার বিষক্রিয়া সম্পর্কে সর্বস্তরেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের কাছে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সিসার বিষক্রিয়া সাংঘাতিক। সিসা স্নায়ুতন্ত্রে গোলযোগ ঘটায়, হাড় গঠনে বিপর্যয় ঘটায়, লোহিত কণিকা গঠনে বাধা দেয় এবং অ্যানিমিয়া সৃষ্টি করে, দৃষ্টিশক্তিতে বাধা দেয়, মস্তিষ্ক আক্রমণ করে স্মৃতি এবং দৃষ্টি ক্ষমতাকে ধ্বংস করে এবং হাড়ের মধ্যে আসন গেড়ে বসে থাকতে পারে অন্তত তিন দশক। এখন মারাত্মক সিসা গাড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে, প্রেসের টাইপ মেশিনের কম্পোজিটারদের এই সিসার সঙ্গে সহবাস করতে হয়, ব্যাটারি প্রস্তুতকারক, বিশেষ করে রেড ব্যাটারি তৈরির কারখানার শ্রমিকরা অজান্তেই একটি মারাত্মক বিষকে ধারণ করে বাঁচছে তাদের শরীরে কোষে-কলায়। সেই বিষের আবর্জনা থেকে কম দূরে, অদূরে থাকার কথা, ধনী দেশের সাধারণ লোকেরাও যখন সেই আবর্জনা নিজের দেশে রাখতে চায় না, সেইসব দেশ যখন সিসার বিষক্রিয়া সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে, তখন সেই বাতিল বিষ চালান হয়ে আসে আমাদের দেশে – 'মেরা দেশ মহান' এই ভারতবর্ষে। দুঃখের এই ব্যাপারে বে-রাজনীতিকদের, বে-বিশেষজ্ঞদের অবস্থা তারা 'চক্ষু থাকিতেও অন্ধ'। এই চক্ষুষ্মান অন্ধরা স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে দেশকে কোন্ খাতার সামনে দাঁড়াচ্ছে তা তারা নিজেরাও জানে না। নিজেরা দাঁড়াচ্ছে শুধু নয় দেশকেও দাঁড় করাবে।

এবারে আনন্দের কথাটায় আসি। যে আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু মানুষের সংগ্রাম। যে সংগ্রামের ফলে ১৯৮৬ সালে যেখানে মাত্র ৩টি দেশে আবর্জনা আমদানির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল সেখানে এখন ১০১টি দেশে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর। এই আনন্দসংবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে গ্রীনপিস আন্দোলন প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা যাক।

পরিবেশ সচেতনতা নির্মাণ করার ব্যাপারে গ্রীনপিস একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এদের সহস্রাধিক কর্মী দুনিয়ার ৩০টি দেশে অবিরাম কাজ করে চলেছে। প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের ব্যক্তিগত সাহায্যপুষ্ট এই সংগঠন। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে আবর্জনা রপ্তানির বিরুদ্ধে এরা সেইসব দেশেও লোকদের যেখান থেকে আবর্জনা রপ্তানি হয়। আমদানি হয় যেসব দেশে সেখানে এরা গড়ে তুলছে সচেতনতা। এছাড়া বিভিন্ন দূষণের বিরুদ্ধে, ওজোন স্তর ধ্বংসের বিরুদ্ধে, পারমাণবিক বিকিরণের বিরুদ্ধে, ক্ষতিকারক শিল্পজাত দ্রব্য এবং কারিগরি বিদ্যা রপ্তানির বিরুদ্ধেও এরা আন্দোলন

পাঠাতে শুরু করেন আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে। গ্রীনপিস তার জাহাজ 'এমভি গ্রীনপিস'-কে ১৯৯৪ সালে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছে এগুলোকে পাশ্চাত্যের ডাস্টবিন বানাবার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে। বন্দরে বন্দরে সাক্ষাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রীনপিস আবর্জনা চালানের ব্যাপারে দুনিয়া জুড়ে নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

শিল্পজাত বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে, শিল্পজাত আবর্জনা বহনে নিষেধের বিরুদ্ধে ইওরোপ ও আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় কড়াকড়ি কার্যকর হওয়ার পর এই আবর্জনা অন্যত্র চালান দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো। চালান গেল সেইসব দেশে, যেখানে এই ব্যাপারে আইনের কোনও কড়াকড়ি নেই। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত বিভাগের তথ্যানুযায়ী ১৯৯০ সালে দুনিয়া জুড়ে ৪০ কোটি টন আবর্জনা তৈরি হয়েছে কেবল শিল্প থেকে এবং এই আবর্জনার শতকরা ৯৮ ভাগ হয়েছে মাত্র ২৪টি দেশে। যারা ও ই সি ডি (Organisation for Economic Co-operation and Development); OECD-এর সদস্য অর্থাৎ এরা সকলেই শিল্পোন্নত। অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ মন্ত্রীর মতে, আর ৭ বছর পরে সিডনিতে কোনও কিছু ফেলার জন্য কোনও জমিই থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ময়লা ফেলার ২৭০০টি জায়গা বাতিল করতে হয়েছে আইনের কারণে। ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ টন ময়লা ফেলার খরচ ছিল ১৫ ডলার; ১৯৮৯ সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫০ ডলার। জার্মানিতে এখন খরচা টন প্রতি ৭০০ ডলার থেকে ৬৪১০ ডলার [১২০০ ডি এম থেকে ১১০০০ ডি এম] পর্যন্ত।

আবর্জনা আমদানির বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালে আফ্রিকায় দেশগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৮৮ সালে গড়ে ওঠে আফ্রিকান সংহতি সংগঠন (Organization of African Unity, OAU)। ১৯৮৯ সালের শেষে কনভেনশনে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৬৯টি দেশ আবর্জনা আমদানি নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯১ সালের বামাকো কনভেনশন এবং ১৯৯০-এর বার্সেলোনা কনভেনশনের পর ১০১টি দেশ আবর্জনা আমদানি নিষিদ্ধ করার আইনী প্রয়োগ করে।

আবর্জনা আমদানির মানচিত্রে আফ্রিকা মহাদেশের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়ার সম্ভাবনায় ও ই সি ডি জাহাজ চালায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে। ফিলিপিন্সের গ্রামীণ পুনর্নির্মাণ আন্দোলনের ফলে ফিলিপিন্সের সরকার আবর্জনা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করল। জনমতের চাপে ১৯৯২-এর নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার সরকার জারী করল প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা। এর আগে অগাস্ট মাসে মালয়েশিয়ার সরকার একইরকম নিষেধাজ্ঞা জারী করে। বামাকো কনভেনশন থেকে বার্সেলোনা কনভেনশন পর্যন্ত সর্বত্রই তত্ত্বগতভাবে ও ই সি ডি কোণঠাসা হয়েছে। এবং যে-সব দেশে নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ নয় সেখানেও আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে। টক্সিক লিওনার্ডের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৩-এর নভেম্বরে সারের

নামে একটি বিমান ভর্তি বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছিল বা আসলে একটি আবর্জনার স্তূপ। সেই স্তূপের অব্যবহৃত অংশ ফেরত পাঠানো হয়েছে।

একতরফাভাবে এবং নির্বিঘ্নে বিষাক্ত আবর্জনা উন্নয়নশীল দেশে ফেলে বলে কৌশলে রপ্তানি করা আজ আর সম্ভবপর নয়। দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে উঠছে। ১০১টি দেশ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে, এটাই আনন্দের। অন্যান্য দেশ যখন বেশি বেশি করে আবর্জনা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে আবর্জনার জাহাজ তখই এগিয়ে আসছে ভারতীয় বন্দরে বেশি বেশি করে — এটাই দুঃখের। এটাই ক্ষোভের।

কারা আছে ওই সিডি-তে

অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ফ্রান্স, জার্মানি, আইসল্যান্ড, ইটালি জাপান, লুক্সেমবার্গ, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সুইৎজারল্যান্ড, টার্কি, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র

সারণী : ১

ভারতবর্ষে আমদানীকৃত আবর্জনা

অস্ট্রেলিয়া থেকে		
প্লাস্টিক	১৯৯০	৩০০০ কেজি
আবর্জনা	১৯৯২	১৬০০০ "
	জানু-সেপ্ট ১৯৯৩	৭৪৩০০ "
সিসা ছাড়া অন্যান্য	১৯৯২	৩৩,৬২১,০০০ "
ধাতব আবর্জনা :		
সিসার ব্যাটারি	১৯৯২	১২৬,০০০ "
আবর্জনা	জানু-সেপ্ট ১৯৯৩	৩৪৬,০০০ "

কানাডা থেকে ১৯৯২ সালে	
তামা ও তামাজাত আবর্জনা	১৬০,৩৭১ কেজি
ছাই	১,২২৬,৪০৫ "
সিসার আবর্জনা	১,০০৭,৮১৭ "
লোহ আবর্জনা	১০৬,০০০,০০০ "
নন ফেরাস আবর্জনা	১০,৩৩০ "
প্লাস্টিক আবর্জনা	৪২,২৭৫ "

যুক্তরাজ্য থেকে	জানু-জুলাই ১৯৯২	জানু-মে ১৯৯৩
ছাই	৩২৪,৮৫২ কেজি	২৫০,০৫৬ কেজি
তামা ও তামাজাত আবর্জনা	২,৪৪০,৫৭৮ "	২৫৭০,৪১০ "
অন্যান্য ধাতব আবর্জনা	৭১১,১৭২ "	১,১২০,৬০৮ "
সিসার আবর্জনা	—	১,১২০,৬০৮ "

যুক্তরাষ্ট্র থেকে		
প্লাস্টিক আবর্জনা	জানু-জুলাই ১৯৯২	৩ ১৭৪,৭০০ কেজি
	১৯৯৩	৭৬৪১,৮০০ "
দস্তা ছাই/ছাই	১৯৯০	১,৭১৪,৩১১,০০০ "
টিনের আবর্জনা	১৯৯০	২৩,৮০২,৩৬০ "

ক্ষতিকারক আবর্জনার আমদানি নিষিদ্ধ করেছে আফ্রিকার ৪১টি দেশ, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ২৩টি দেশ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৮টি দ্বীপ, এবং অন্যান্য ১৮টি দেশ। বলা বাহুল্য, এ-তালিকায় ভারত নেই।

সূত্র : ১৯৯৪ সালের গ্রীনপিস রিপোর্ট, *The Waste Invasion of Asia.*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ব্রডেন মার্টিন, ইন্টার প্রেস সার্ভিস, ওয়াশিংটন।

সারণী : ২

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মার্কিনী আবর্জনার রপ্তানি চিত্র

(মেট্রিক টন হিসেবে)

দেশ	কি ধরনের আবর্জনা	জুন-জুলাই ১৯৯২	১৯৯৩
বাংলাদেশ	প্লাস্টিক আবর্জনা	৪৯'৪	৩৭'৭
ভারতবর্ষ	প্লাস্টিক আবর্জনা	৩,১৭৪'৭	৭৬৪১'৮
	সিসার ছাই	১৮০'৭	১১৬'৯
	ব্যাটারি আবর্জনা	০'০	১৪'৫
পাকিস্তান	প্লাস্টিক আবর্জনা	১১৩'৮	২৮০'৫
	সিসার ড্রস	০'৪	৬'২
ইন্দোনেশিয়া	প্লাস্টিক আবর্জনা	৫,৩৩২'৭	৪০'০
মালয়েশিয়া	"	২৭৪'৭	২১২'৫
	সিসার আবর্জনা	৪১০'১	১০০'৮
ফিলিপিনস	প্লাস্টিক আবর্জনা	৬,১৬১'০	৩৭৬৪'২
	ব্যাটারির স্ল্যাগ	৩১০'২	৩০০'৩
	সিসার স্ল্যাগ	০'০	৩১'৬

সূত্র : Ann Leonard, 'South Asia the New Target of International Waste Trades', *Multinational Monitor*, December, 1993, p. 21.

মহাজন

চিত্তবিদ

ভদ্রমহিলা তার পছন্দ সেটটি নিয়ে সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। তুলনায় ভদ্রলোককে স্পষ্ট বলা যায়। ভদ্রলোক কোনো ভনিতা না করেই কথা পাড়লেন, 'আপনাকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলাম। আমরা দূরে থাকি—জলপাইগুড়ি। আমি সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। ওখানেই পোস্টেড। আমার স্ত্রীর একটা প্রবলেমের জন্য এসেছি। আপনার সাহায্য চাই।' স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এবার বল কি সমস্যা হচ্ছে।'

স্ত্রীর ইতস্তত ভাব দেখে ভদ্রলোকই শুরু করে দিলেন। সমস্যা বলতে গেলে সামান্যই—বছর তিনেক হলো ভদ্রমহিলার একটা বাতিক শুরু হয়েছে। পরিষ্কারের বাতিক। নিজেকে শুদ্ধ করার বাতিক—যাকে পরিচিত ভাষায় বলা হয় 'ওয়াশিং ম্যানিয়া' বা শুচিবায়ু। এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক চলে যাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'ওর কাছে শুনুন। আমি বাইরে আছি। পরে প্রয়োজন হলে আমায় ডাকবেন। তুমি কোনো সংকোচ কোরো না। সমস্যাটা ঠিক ঠিক কি হচ্ছে বোলো তাহলেই উনি তোমায় ঠিকমতো সাহায্য করতে পারবেন।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি মেনে নিলেন।

'মনে করে দেখুন তো এই সমস্যাগুলো বিয়ের আগে কৈশোরকালে ছিল কি-না।' ভাবতে গিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো একটু সরিয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলা বলতে শুরু করলেন, 'অল্প অল্প ছোটবেলাতে তা ছিল, এটা এখন আমার মনে হয়। এজন্য আমার ঠাকুমা কিছুটা দায়ী। আমাদের কলকাতাতেই বাড়ি। বাবা সরকারি কাজ করতেন। বদলির চাকরি, তাই ছোটো ভাইবোনদের নিয়ে মফস্বলে ঘুরে বেড়াতেন। আমি থাকতাম কাকা আর ঠাকুমার কাছে। আমাকে সংসারের উপযুক্ত করার জন্য আর বিয়ে হলে আমার যেন গৃহস্থালী কাজের জন্য শ্বশুরবাড়িতে খোঁটা খেতে না হয় সেজন্য ঠাকুমা সাংঘাতিক নজর দিতেন। ফলে বার বার ঘরের জিনিসপত্র ধোয়া পরিষ্কার করা হতো। বাইরে থেকে এলে সঙ্গে সঙ্গে জামা কাপড় ধুয়ে ফেলা। নিজেকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। এইসবের জন্য আমার আচারের শাসনের মধ্যে পড়তে হতো।

বড় হওয়ার পর এই অভ্যাসগুলো অনেকটাই চলে গিয়েছিল কিন্তু একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাতিক ছিলই। সেইসব নিয়ে কতকগুলো বাতিল অভ্যাসও তৈরি হয়েছিল। 'এখন বাথরুমে কতক্ষণ সময় লাগে?' 'প্রায় দেড় ঘণ্টা', 'নিশ্চয়ই বেশি সময়। 'আর এই বেশি সময় নেওয়া নিয়ে তিনি যতখানি চিন্তিত নন ততখানি চিন্তা ছেলে মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে। ওদের একটি ছেলে একটি মেয়ে—ছেলেটি ছোটো। ভদ্রমহিলা বুঝতে পারেন পরিচ্ছন্নতার নামে তিনি ওদের ওপর অত্যাচার করছেন। এজন্য তাকেও যে ভুগতে হয় না এমন নয়। কাচাকাচির ব্যাপারটা খুব বেড়ে গেছে। বাচ্চারা একটু ধর নোংরা করলেই অত্যধিক শাসনের সম্মুখীন হয়। এইসব ব্যাপারে স্বামীকে শাসন করতে সাহস করেন না সেটাও তার একটা মনোবেদনার কারণ। ওকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু সাহস করে সেটা বলতে পারেন না। আবার গোলমাল হয় যখন পরিচ্ছন্নতার বাড়াবাড়ি দেখে স্বামী বকে দেন। উনি বুঝতে পারছেন এতটা বাড়াবাড়ি করা তার ঠিক নয় কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারেন না। কেমন যেন একটা চাপ তৈরি হয়ে যায়। আর কাজগুলো করতেই হয়, মানে ঐ পরিচ্ছন্নতার বাতিক। না করলে মনটা খারাপ লাগে—করলে মনটা হালকা হয়। কিন্তু করেও শান্তি নেই, ঐ কথাই বার বার মনে আসে, ঐ বুঝি নোংরা হয়ে গেল। আর এসবের সাথে আরও ছোটো-খাটো নানান উৎপাত এসেছে—খিদে হয় না, পায়খানা হয় না। মন ভালো থাকে না। মাঝে মাঝে এমন হয় যে, মৃত্যুর কথাও মনে আসে। মনে হয় কী হবে বেঁচে? সবাইকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছি। বাতিকের জন্য দেখুন না নখগুলোর কি অবস্থা! সবসময় মনে হয় নখের মধ্যে ময়লা ঢুকে আছে। একদিন অন্তর কাটি। কখনও কখনও রক্ত বেরোয়।'

'আপনার এই অভ্যাসটা শুরু হলো কি করে? একদিনেই তো এতটা বাড়াবাড়ি হয় নি। নিশ্চয়ই প্রথম অল্প অল্প করে শুরু হয়েছে তারপর বাড়াবাড়ি হয়েছে। যখন শুরু হয়েছে তখনকার কোনো পারিপার্শ্বিক আঘাত? বা ঠিক আগের কোনো সাংসারিক ঘটনা—দেখুন তো মনে করতে পারেন কি-না! তাহলে আমাদের কাজটাও অনেক সুবিধা হয়ে যায়। তবে ঘটনা থাকলেই যে সেটা খুঁজে উঠতে পারব এমন নয়। অনেক সময় ঘটনার সাথে মনের পরিবর্তনকে আমরা মেলাতে পারি না। কোন্ ঘটনা মনের মধ্যে কি ছাপ ফেলল সেটা বোঝাও বেশ মুশকিল হয়। দেখুন তো ভেবে এইরকম কোনো ঘটনা আছে কি-না। তাছাড়া আপনার পরিবারে অর্থাৎ মা বা বাবার দিক থেকে কোথাও কি এইধরনের বা অন্য কোনো মানসিক রোগ কারোর ছিল?

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলেন, 'আমি তো তেমন কিছু মনে করতে পারছি না। বিয়ের আগে তেমন বলার মতো কোনো ঘটনা নেই। মা বাবার দিক থেকেও কোনো রোগের ইতিহাস তো আমার জানা নেই। ঐ যা বললাম—ঠাকুমার একটু বাতিক ছিল। আমার সমস্যা-টাও অল্প অল্প করে শুরু হয়েছে এটাও ঠিক। ছেলেটা হওয়ার কিছুদিন পরেই শুরু। তবে এত বাড়াবাড়ি ছিল না। এই বাড়াবাড়ি সাম্প্রতিক, মাস ছয়েকের।

'ঠিক করে বলুন তো স্বামীর সাথে সম্পর্ক কেমন?' জিজ্ঞাসা করলে উনি বেশ সপ্রতিভভাবে বলে উঠলেন, 'ঠিকই আছে, এমনি কোনো অসুবিধে

নেই। আমার এই বাতিকের জন্য মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হন, রাগারাগিও করেন। নইলে আমার স্বামীর মতো মানুষ হয় না, আমার কাছে তো উনি দেবতা। নিজের কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না। অপ্রয়োজনে কোথাও নাক গলান না। পরনিন্দা, পরচর্চা কখনও ওর মুখে শুনি নি। ওঁর স্বভাবও খুব শান্ত, সবসময় বাইরে বাইরে নিজের কাজ নিয়ে থাকেন। উনি একজন সৎ দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বলে বেশ সুনাম। আমি ঘরে সংসার নিয়ে থাকি।' 'ঠিক আছে আপনি বাইরে গিয়ে বসুন, আপনার স্বামীকে পাঠিয়ে দিন।'

ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন করলেন, 'কি মনে হলো ডাক্তারবাবু, এ রোগ সারবে তো। শুনেছি এই বাতিকের রোগ নাকি তাড়াতাড়ি সারতে চায় না। আমার ছোটো ছেলেমেয়ে দুটোর ওপর খুব চাপ পড়ছে। সারাদিন ওরা মায়ের সাথে থাকে আর মায়ের অত্যাচার সহ্য করে। ঘরে কোনো কাজের লোক টিকতে পারে না। কারোর কাজ ওর পছন্দ হয় না। আর, সব তো ঠিক মনের মতো হয় না, সবাইকে নিয়ে মানিয়ে চলতে হয়। সে-সব নিয়েও অশান্তি আছে। তাছাড়া আমি ঠিক বাড়ির জন্য সময় দিতে পারি না। নতুন একটা প্রজেক্ট আমাদের চলছে, তার জন্য অনেক সময় দিতে হয়। সংসারের অভাব-অভিযোগ আছে, থাকবেই। এইসবের মাঝে পড়ে স্ত্রীর এই অসুখটা যেন একটা বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

'আপনার স্ত্রীর অসুখটা খুব জটিল কিছু নয়, সাধারণই – সারবে, তবে সময় নেবে। আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন। এই রোগ হওয়ার পেছনে কোনো কারণ আছে বলে কি আপনার মনে হয়? কোনো ধরনের কোনো ভয়, দুশ্চিন্তা বা অপরাধবোধ।' ভদ্রলোক কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, 'ও কি তাহলে আপনাকে সব বলে নি? সেটা আমি আন্দাজ করেছিলাম, তাই বাইরে চলে গেলাম যাতে ও মনের সব কথা খুলে বলতে পারে।'

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন – ওরা তখন শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ভদ্রলোক শিলিগুড়িতে বদলি হয়েছেন। দূর সম্পর্কের এক বিপত্নীক আত্মীয় ছিলেন, তার দোতালা বাড়ি, তারই নিচের তলায় ওঁরা ভাড়া থাকতেন। তখন মেয়েটা ছোটো, ছেলে হয় নি। ভদ্রলোককে কাজের জন্য সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে কাটাতে হতো। ঐ আত্মীয় ভদ্রলোক তার সেই অভাব পূরণ করতেন পরিবারের দেখাশোনা করে। তাই অন্দেশবাবুর মতো উপকারী মানুষকে খারাপ ভাবার কোনো কারণ ছিল না। উল্টে দ্বিগুণ উৎসাহে ভদ্রলোক বাইরের কাজে মন দিয়েছিলেন।

'কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে কতকগুলো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে শুরু করল আর তাতে আমার স্ত্রী ও সেই আত্মীয় ভদ্রলোককে জড়িয়ে নানান কথা শোনা গেল।' বুঝতেই পারছেন, খারাপগুলো আমার কাছে কতখানি মর্মান্তিক ছিল। তাই প্রবল শক্তি দিয়ে ঐসব পরচর্চার প্রতিবাদ করেছি এমনকি কোথাও কোথাও হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়েছিল। যাই হোক আমার ট্রান্সফার ঠিক হয়েছিল। কংগ্রো পরামর্শ দিল জলপাইগুড়ি চলে যেতে। তাই ওখানে চলে এলাম। ওখানে ছেলেটা হলো। পরিচিত কোনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে আর কোনো ঘনিষ্ঠতা রাখবো না মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম কেন না ওদের সান্নিধ্যে মনটা বড় খারাপ হতো। এরই মাঝে অর্থাৎ ছেলেটা যখন একমাসের, তখন আমার স্ত্রী স্বীকারোক্তি করল যে, যা রটেছিল তার অনেকটাই ঘটনা।'

দুঃস্বপ্নের মতো শুনতে লাগলাম। 'শুধু যে সম্পর্ক' ছিল তাই নয় আমার হিসাবমতে ছেলেটাও আমার নয়। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। কেমন যেন মনে হয়েছিল কেউ আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকিয়ে দিয়ে গেছে। আমার স্ত্রীও তার সঙ্গী। প্রায় একমাস কোনো কাজ করতে পারি নি। আমার দু-জন বন্ধু তখন আমায় খুব সাহায্য করেছিল। নইলে হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতাম। ক্রমে শান্ত হলাম। বুদ্ধিবৃত্তির মতো ফিরে আসার চেষ্টা করলাম। নিজেকে বোঝালাম এই ভেবে যে, আমার স্ত্রীর দোষ খুব একটা নেই কেননা আমার ওকে যতখানি সময় দেওয়া উচিত ছিল, দিই নি। ফলে তাকেও ঠকিয়েছি। এমনি তো ও খুব মিশুকে, সবার সাথে খোলামেলাভাবে মিশতে পারে। আর আমার সাথে সম্পর্কটা এমনই ছিল যে, শুধু দম্পতির সম্পর্ক' বললে ভুল হবে – যেন এনি ছিলেন। ও যে এইরকম একটা ফাঁদে পা দিতে পারে তাবতেও পারি নি। যাই হোক সেইসময় কথা প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু অপ্রীতিকর কথা বলেছি। তার প্রভাব ওর এই রোগের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে। তাছাড়া এই ঘটনার পর ওর সাথে সহজ হতেও আমার অনেক সময় লেগেছে। এখনও যে আগের মতো সহজ হতে পেরেছি এমন নয়। তবে অনেক সহজ হয়ে গেছি। তারপরে ওর রোগটাও বেড়েছে। এক একবার ভেবেছি কথাটা ও না বললেও পারত।' 'না বলে পারতেন না কেন না কথায় তার কমানোর জন্য ওঁকে কথাটা বলতেই হতো।' 'হয়তো তাই, কিন্তু আমার এতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে।' হাসলাম, 'সত্যিই কি এতে কোনো বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে?' উল্টে বলা যায় আপনার পরিপূর্ণতা এসেছে এই ঘটনার মধ্যে যার সেটাই আপনার স্ত্রীর অসুস্থতা সারানোর ক্ষেত্রে বড় অস্ত্র।' ভদ্রলোক আনমনা হয়ে বলতে লাগলেন, 'একথা আপনি বলছেন বটে কিন্তু আমার একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আমি নিজে এখন উপলব্ধি করি, সেটা হলো, ধর্ম আমার খুব বেশি টানে এখন। অথচ বিশ্বাস করুন মানুষের জন্য একটা সেন্ট অফ এথিকস্ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস আমার কখনও কোনোদিন ছিল না। কিন্তু এখন ধর্মের কথা ভেবে বেশ একটা তৃপ্তির পাই। মনটা শান্ত হয়।

তারপর আগের কথায় ফিরে এলেন তিনি, 'যাক্ সে কথা। আপনার কি মনে হয়, এই কথাটা আপনাকে ও নিজে মুখে বলতে পারলে কি ওর চিকিৎসার কোনো উপকার হতো? তাহলে আমি ডেকে এনে বলছি যাতে ও আপনার কাছে বলে। কেননা চিকিৎসার প্রয়োজনে ওর মুখ থেকে আপনার শোনা দরকার।' বাধা দিলাম, 'না না এখন এটা না হলেও চলবে। আপনি বললেন ঘটনাটা জানা গেল। এবার একদিন, হয়তো পরেরদিন, উনি নিজেই

করেন। প্রথম সাক্ষাতে হয়তো লজ্জা-সঙ্কোচটা কাটাতে পারেন নি। এটাই তো স্বাভাবিক। আর একবার যদি উনি না-ও আসেন তাতে চিকিৎসার কোনো অসুবিধা হবে না। একটা অপরাধবোধ নিশ্চয়ই ও'র মনের মধ্যে কাজ করেছে কিন্তু শুধুমাত্র ওটাই রোগের কারণ নয়। হয়তো রোগটাকে পিছিয়ে পড়তে সাহায্য করেছে। ওনার এই রোগের জন্য দায়ী প্রধানত ওনার মস্তিষ্ক, তাই এই রোগ সারাতে এত সময় লাগে। তবে বাইরের কারণ থাকলে রোগ তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। এক্ষেত্রেও সে সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপনার মতো স্বামী পেয়ে একদিকে ওর যেমন লাভ হয়েছে, নিজের ভুলের জন্য কোনো শাস্তি পেতে হয় নি — যা হয় আমাদের সমাজে ; আবার কোনোরকম শাস্তি না পাওয়ার জন্য ও'র অপরাধবোধ বা বিষণ্ণতা একটুখানি হালকা হতে পারে নি। ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, 'তাহলে আমি নির্দয় হলে কি ওর সুবিধা হতো?' 'সে কথা নিশ্চয় করে বলা যাবে না, তবে উনি নিজে হয়তো তার দাবি করতে পারতেন এই ভেবে যে, আমার ভুলের জন্য আমার প্রাপ্য শাস্তি আমি পেয়েছি। তবে এসব কথা বলার আর কোনো অর্থ নেই তা আপনিও জানেন।' ভদ্রলোক চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন, 'জানাই — বাচ্চাগুলোর জন্য বড় কষ্ট হয়। তাদের মায়ের এই অসুস্থতার জন্য ওরা কষ্ট পাচ্ছে বেশি।'

প্রকাশিত হয়েছে

উৎস মানুষ সংকলন

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে
দাম ৩০ টাকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড)
দাম ২৫ টাকা

বিবেকানন্দ অন্য চোখে
দাম ২৫ টাকা

যোগাযোগের সেতু ● মতামতের মঞ্চ
চাপা খবর ছাপার কাগজ

বি-সংবাদ

প্রথম সংখ্যায় থাকছে

সি. পি. এমের বিদ্রোহীরা এখন ● পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন : স্বপ্ন ও বাস্তব ● বামপন্থী রাজনীতির কথা-বার্তা ● পাঞ্জাবে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর দুই নাতির সেক্স র‍্যাকেট ● বিশ্বসুন্দরীর টি. ভি. চেহারে ধরতে কলকাতা পুলিশে কোর্স ছিনতাই ● যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সি. পি. এমের 'তিন কমরেড' কেলেঙ্কারিতে ● নাওডা বিলের লড়াই ● একটি অসবর্ণ বিবাহ বৃত্তান্ত

• যারা ছটি সংখ্যার জন্য সহযোগী সদস্য হতে চান তারা নিচের ঠিকানায় ২০ টাকা (৩ × ৬ + ২ টাকা অনুদান) মনি অর্ডার করুন। মনি অর্ডারের ঠিকানা। বাসুদেব ঘটক ; ৩/২৭, রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলোনী টালিগঞ্জ, কলকাতা ৭০০ ০৩৩।

পরিবেশক : জেনারেলেন্দ্রের কান্দো, বুকমার্ক'।

পত্রিকার নিয়মাবলী

পত্রিকার প্রতি কপি ৫ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক) ৬০ টাকা। যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া চলে। গ্রাহকদের সাধারণ ডাকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্টদের VP-তে পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্সি-জমা (ফেরতযোগ্য) লাগে ২৫ টাকা। কমিশন — ২৫% (১০০ কপি নিলে ৩৩⅓%)। ডাক খরচের অর্ধেক এজেন্টকে বহন করতে হয়।

টাকা UTSA MANUSH-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ অথবা M.O. করে পাঠাবেন। কলকাতার বাইরের অঞ্চলের চেক পাঠাবেন না। M.O. ফর্মের নিচের কুপনে নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর অবশ্যই লিখবেন।

ঠিকানা : সম্পাদক, উৎস মানুষ
বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৬৪

কী করব, কোথায় যাব

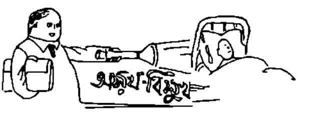

রোগ-শোক-অসুখ-বিসুখ আমাদের নিত্যসঙ্গী। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন চিকিৎসা আর ওষুধ-পত্র দুর্মূল্য হচ্ছে। বিশেষ করে মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষ অসুখে পড়লেই অসহায়, দিশেহারা বোধ করেন। এখন রোগব্যাধি ও চিকিৎসার জটিলতা বেড়েছে, তারই সঙ্গে বেড়েছে নিরাময়-ব্যবস্থার অগ্রগতি। হাজার প্রশ্ন, হাজার কৌতূহল আর আকুল অনুসন্ধানে ব্যস্ত মানুষের হাতে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ, ব্যাখ্যা, আর পথ্যের হদিশ দিতে পারলে অনেকখানি সহায়তা হবে বলে আমরা মনে করি। ...তাই একজন ডাক্তার বাবুর কলম থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য, ব্যাখ্যা, হদিশ জেনে নেব আমরা ধারাবাহিকভাবে। গত ডিসেম্বর '৯৪ সংখ্যায় ছিল 'অ্যাজমা'। এ-সংখ্যায় থাকছে 'হাইপারটেনশন'।

প রি চা ল ক ম ণ্ড লী

৫. হাইপারটেনশন

মজার ব্যাপার হলো, রক্তচাপবৃদ্ধি বা হাইপারটেনশন এমনই সাধারণ ঘটনা যে কোনো শারীরিক বিপত্তি না ঘটিয়ে বছরের পর বছর তা সহাবস্থান করতে পারে। হয়ত অন্য কারণে শরীর পরীক্ষা করতে গিয়ে বা অন্য কোনো গুরুতর অসুস্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল রোগীর হাইপারটেনশন আছে। এর থেকে এমন সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, শারীরিকভাবে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলেও আমরা মানিয়ে নিই। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসা করালে অধিকাংশ হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করে। এর চিকিৎসা না করালে সাধারণত এমনকী গুরুতর শারীরিক গোলযোগ, বিশেষত হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের গোলযোগ এবং ব্যক্তির অকাল মৃত্যু হয়।

সব হাইপারটেনশনের মধ্যে	জনসংখ্যার
☐ কোনো কারণ জানা যায় না	৯২ – ৯৪ শতাংশ
☐ কিডনির গোলযোগের কারণে	২ – ৫ শতাংশ
☐ হরমোনের কারণে	০'৫ – শতাংশ
☐ বিবিধ কারণে	০'২ শতাংশ

সমস্ত বয়সের হাইপারটেনশনের মধ্যে ৯০-৯৫ শতাংশের কারণ জানা যায় না। এবং সঠিক কারণ না জানতে পারায় এর প্রতিরোধও করা সম্ভব হয় না।

হাইপারটেনশন যাদের বেশি ক্ষতি করে

পায়ের রঙ কালো	☐ রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল
বৃদ্ধ	জাতীয় দোষ
পুরুষ	ডায়াস্টোলিক প্রেসার সবসময়
☐ ধূমপান	১১৫-এর ওপরে থাকলে
ডায়াবেটিস	হৃৎপিণ্ড, চোখ, বৃক্ক ও মস্তিষ্কের
☐ মদ্যপান	কোনো গুরুতর গোলযোগ শুরু
☐ অস্বাভাবিক দেহের ওজন (মেদবহুলতা)	হলে

ব্লাডপ্রেসার বা রক্তচাপের দুটি মাত্রা আছে। এর ওপরেরটিকে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার, আর নিচেরটি ডায়াস্টোলিক প্রেসার। পারদের চাপের তুলনায় এই চাপ মাপা হয় এবং মোটামুটি স্বাভাবিক রক্তচাপ বলতে আমরা বুঝি ওপরের চাপ ১২০-১৫০ এর মধ্যে থাকবে এবং নিচের চাপ ৭০-৯০ এর মধ্যে থাকবে। রক্তের এই চাপ রক্ষা করা দরকার হয় দেহের সমস্ত কোষকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য এবং দেহের বর্জ্য পদার্থগুলি টেনে নিয়ে আসার জন্য। একবার রক্তচাপবৃদ্ধি ধরা পড়লে পরপর অনেকদিন দিনের বিভিন্ন সময়ে মেপে তা নিশ্চিত করা দরকার। যদি দেখা যায় রক্তচাপবৃদ্ধি থেকে যাচ্ছে, কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তখন ধরে নিতে হবে ব্যক্তির হাইপারটেনশন আছে। এর গুরুত্ব অনুযায়ী হাইপারটেনশনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ণ বয়স্কের ডায়াস্টোলিক প্রেসার ৮৫-৮৯কে উঁচু স্বাভাবিক, ৯০-১০৪কে অল্পবৃদ্ধি,

১০৫-১১৪ মাত্রার বৃদ্ধি, ১১৫-এর বেশিকে বিপজ্জনক চাপবৃদ্ধি বলা হয়। তেমনি শুধুমাত্র সিস্টোলিক প্রেসারের ক্ষেত্রে ১৪০-১৫৯কে অল্পবৃদ্ধি ও ১৬০-এর ওপরকে সিস্টোলিক হাইপারটেনশন বলা হয়।

অনেক সময় হাইপারটেনশন অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে (labile) এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এদের বর্ডারলাইন হাইপারটেনশন বলা হয়। আবার খুব উঁচু রক্তচাপ ক্রমাগতভাবে বাড়তে বাড়তে একটা বিপজ্জনক পর্যায় (malignant) পৌঁছতে পারে। তবে চিকিৎসা করাচ্ছেন এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সাধারণত এই ঘটনা ঘটে না।

কেন রক্তচাপ কমতে চায় না

- □ রোগী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সহযোগিতা করছে না
- □ লবণ বেশি মাত্রায় খাওয়া
- □ দেহের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে
- □ উপযুক্ত মাত্রায় ওষুধ না খাওয়া
- □ রক্তচাপের জন্য শারীরিক দুর্বলতা কারণ রয়েছে

ওষুধের বিরুদ্ধতা করে এমন দ্রব্য নেওয়া যেমন:

- বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয়
- ওরাল পিল
- স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ
- অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যামফেটামিন জাতীয় ওষুধ

এর বংশানুক্রমিকতা আছে বলে মনে করা হয়। রক্তচাপবৃদ্ধির সঙ্গে কিডনির ত্রুটি-বিচ্যুতির একটা সম্পর্ক আছে। একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এটি দেখা যায়। তবে এ-সম্পর্কে সমস্ত কারণ-বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কোনো একটি জিনগত ত্রুটির জন্য এমনটি হয় না। অধিকাংশক্ষেত্রে অনেকগুলি জিনসমূহের অস্বাভাবিক ত্রুটি থাকে যার প্রকাশ হয় হাইপারটেনশনে। কতকগুলি পারিবেশগত কারণ ও এই অসুখের জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। যেমন বেশি লবণ খাওয়া, শরীরের অস্বাভাবিক ওজনবৃদ্ধি, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর পেশা, বড় পরিবারের ছোট্ট জায়গায় মধ্যে থাকা ইত্যাদি।

অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেছে—ঐ কারণগুলি মস্তিষ্কের স্নায়ু অঞ্চলে হাইপারটেনশন তৈরি করে, অন্যদিকে শরীরের তা কমিয়ে দেয়। আরও দেখা গেছে লবণ সবার শরীরে একরকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় না। রক্তচাপবৃদ্ধির ৬০ বছরের ক্ষেত্রে লবণের বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। তাই নির্বিচারে লবণ বন্ধ করার কথা এখন আর বলা হয় না। বলা হয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক যেন সারাদিনে পাঁচগ্রামের বেশি লবণ না খায়। সেইসঙ্গে ক্যালসিয়ামের কথাও ভাবা হয় এবং দেখা গেছে লবণ ও ক্যালসিয়াম পরস্পর সহযোগিতা করে অনেক সময় রক্তচাপ বাড়ায়। যেই যে-সব খাবারে ক্যালসিয়াম বেশি থাকে (সব রকমের দুগ্ধজাত খাবার) তা কম খাওয়াই ভালো। দুটি সাবধানতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ধূমপান বন্ধ করা এবং শরীরের ওজন যতখানি সম্ভব কমিয়ে ফেলা। সাধারণ ব্যক্তিদের রক্তচাপবৃদ্ধি না ঘটলেও এই দুটি কারণ রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। তাই অনুমান করতে কষ্ট হয় না, যাদের রক্তচাপবৃদ্ধির প্রবণতা আছে তাদের ক্ষেত্রে দেহের অস্বাভাবিক ওজনবৃদ্ধি ও বক্ষের ধূমপান কতখানি ক্ষতিকারক।

যদিও খুব কম সংখ্যক হাইপারটেনশনের কারণ জানা যায় এবং তার অধিকাংশ কারণ কিডনির গোলযোগ, তাই হাইপারটেনশন ধরা পড়লেই তা কিডনির কারণে হচ্ছে কিনা খুঁজে দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে 'ওরাল পিল' (জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বড়ি)-এর রক্তচাপ বাড়ানোর বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। আজকের দিনে মেয়েদের ওরাল পিলের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে সেইসঙ্গে মেয়েদের হাইপারটেনশনও বেড়েছে। দেখা গেছে, কিছু মহিলা ওরাল পিল খেলেই তাদের রক্তচাপ বাড়ছে। বলা হচ্ছে, যারা বর্ডারলাইন হাইপারটেনসিভ, ওরাল পিল তাদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ এই বড়ি যারা নিয়মিত নেন তাদের নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা উচিত।

হাইপারটেনশন যাদের আছে তাদের গড় আয়ু কম হয়। সাধারণত তারা হার্টের গোলযোগে মারা যায়, কিছুজনের কিডনির গোলমালও হয়। রক্তচাপ বেশি নিয়েই হার্টকে কাজ করতে হয় বলে হার্ট ব্যর্থ হতে শুরু করে এবং অধিকাংশক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার কারণে বা রক্ত সঞ্চালনের গোলযোগের জন্য রোগীর মৃত্যু হয়। হাইপারটেনশনের জন্য রোগীর শরীরের আভিক পরিবর্তনগুলি চোখের রেটিনায় ধরা পড়ে। তাই বাইরে থেকে রেটিনা পরীক্ষা করে হাইপারটেনশনের গতিপ্রকৃতি নির্দিষ্টভাবে পর্যালোচনা করা যায়।

হাইপারটেনশন রোগীর চিকিৎসা শুরু করার আগে রোগীর অবস্থা কারণ-বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন ১. বয়স, ২. শরীর মেদবহুল কিনা, ৩. আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে রোগী আসছে—বস্তি না স্বচ্ছল পরিবার, ৪. পেশা, ৫. হাইপারটেনশনের কোনো কারণ পাওয়া গেছে কিনা, ৬. কোনো পারিবারিক ইতিহাস আছে কিনা, ৭. শরীরে অন্য কোনো রোগ-যেমন ডায়াবেটিস কি রেটিনার গোলমাল, ৮. নেশা—এইসব জানার প্রয়োজন হয় রোগীর চিকিৎসা ও পরবর্তী দেখভালের জন্য। বহু বয়সের লক্ষণ উপসর্গ নিয়ে এই রোগী চিকিৎসকের কাছে আসে বা সাধারণভাবে প্রেসার দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে যে-রোগীর প্রেসার বেশি। তাই প্রত্যেকের নিয়মিত একবার অন্তত প্রেসারটা দেখিয়ে নেওয়া উচিত এবং যদি বেশি থাকে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও স্থানে কয়েকবার সেটা পরীক্ষা করা উচিত। আর উচিত দুই হাতে আলাদাভাবে, দাঁড়িয়ে ও বসে প্রেসার দেখা।

যে কোনো ব্যক্তির ডায়াস্টোলিক প্রেসার ১০-এর ওপর হলে এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সের কারোর সিস্টোলিক প্রেসার ১৬০-এর ওপর হলে, তার রোগের অনুসন্ধান ও চিকিৎসা করা উচিত। মনে রাখতে হবে, প্রেসার বেশি হলে নারীদের তুলনায় পুরুষদের এবং বয়স্কদের তুলনায় যুবকদের অনেক বেশি ক্ষতি করে। তার চিকিৎসায় এরাই সর্বাপেক্ষা লাভবান হয়। ওষুধ ছাড়াও চিকিৎসার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে যেমন—১. দুশ্চিন্তা ও

[এরপর ৪১ পাতায় →

এই সংখ্যায় থাকছে 'ভিক্ষাবৃত্তি ও আপনি' নিয়ে পাঠকদের নির্বাচিত মতামত। আগামী মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় থাকবে 'ঈশ্বর বিশ্বাস ও আপনার বিশ্বাস' নিয়ে মতামত-ভিত্তিক আলোচনা।

১. 'ভিখিরি' ও আপনি

'বাবু, একটা পয়সা দেবেন? কষ্ট করে।'—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, নড়েন না, যতক্ষণ ভিখিরিটা আপনার দিকে বাড়িয়ে দেন।

'দিন না বাবু একটা পয়সা, সকাল থেকে কিছু খাই নি।'—একটা একই অনুনয়-বিনয়। আপনি একটু সরে এসে দাঁড়ান। দেখতে দেখতে আরো দু-একটা ছোট ছেলেমেয়ে ভিখিরি।—'বাবু খেতে দেবেন। খাও খাও—। কাজ করে খেতে পারো না।' 'কেন পারবো না বাবু। কিন্তু কেউ তো কাজ দেয় না। সবাই তাড়িয়ে দেয়। দিন না বাবু একটা কিছু যোগাড় করে, যে-কোনো কাজ, যা হোক কিছু একটা, আমি করব…।'

এইবার আপনার বন্ধটা খুলে যায়। সত্যিই তো, কী কাজ এদের দেওয়া যায়! একজন রাস্তার ভিখিরিকে ঘরে নিয়ে তো তোলা যায় না। তাড়া খাড়িয়ে থাকেন, খাবার-দাবারের কারও কুলোয় নেই। আপনার সেটা আর ক-দিন? সব বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে যে কাজ দেবে, ক-দিনই বা দেবে? তারপর?

এবার আপনি কী করবেন? ও আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।

ম তা ম ত

যদি আপনি এই পরজীবী অবস্থার সমর্থক না হন, তবে অবশ্যই ভিক্ষা দেবেন না। আপনার কর্তব্য ভিক্ষাপ্রার্থীকে ডেকে বলা: ১. বেঁচে থাকা, সুস্থ ও সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে বেঁচে থাকার মানে হয়। ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্যই সুস্থ ও সর্বাঙ্গসুন্দর জীবিকা নয়। ২. মানুষ সামাজিক জীব এবং তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। ৩. আমাদের সমাজ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নাগরিক প্রতি দায়িত্ব স্বীকার করে। সুতরাং দুস্থ, পীড়িত মানুষদের উচিত সরকারের নিকট সাহায্য দাবি করা। ৪. গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের পথে যাওয়া উচিত। ৫ আইন-অমান্য আন্দোলন এক্ষেত্রে উত্তম পথ। সরকার তাদের জন্য বিনামূল্যে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। কারাগারে তারা পাবে মাথার উপর আচ্ছাদন, পরিধেয় বস্ত্র, শীতে কম্বল, অন্তত আহার ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা—সবই বিনামূল্যে। আজকাল তো শোনা যাচ্ছে কারাগারগুলি সংশোধনাগার হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে কয়েদীদের বিনোদনের জন্য T.V., V.C.P.-ও দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এমন চমৎকার ব্যবস্থা থাকতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষামাগা কোনোমতেই বুদ্ধিমান মানুষের উপযুক্ত পথ নয়।

মহেশ

হরিনাভি, রাজপুর

ভিখারী আমার কাছে খাবার জন্য পয়সা চাইলে সাধারণত আমি কোনও দোকান থেকে কোনও খাবার কিনে দিই। বেশী পয়সা খরচ হলেও সেটিকে আমি শ্রেয় মনে করি। কিন্তু যখন আমি ট্রেনে বা বাসে ভিক্ষুকদের দেখি, তখন

আসুখ-বিসুখ [৫৮ পাতার পর]

পরিশ্রমে হওয়া, ২. অল্প নুনের আহার করা, ৩. মুক্ত বাতাসে নিয়মিত শরীরচর্চা করা, ৩. অস্বাভাবিক ওজনকে কমানো, ৫ প্রেশার বাড়ার অন্য কোনো কারণ থাকলে দূর করা যেমন নেশা।

হাইপারটেনশন চিকিৎসায় রোগীর সহযোগিতা, বিশেষত পরিশ্রম বা সুশৃঙ্খল জীবনযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাপনে অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত অভ্যাস যেমন অতিরিক্ত ভোজন, ধূমপান, মদ্যপান, খাবারে অতিরিক্ত লবণ ও ক্যালসিয়াম গ্রহণ, অহেতুক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি কমাতে না পারলে চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় না, অনেক বেশি ওষুধ খেতে হয় (প্রতিটি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে) এবং এর ফলে আয়ু কমে যায়। যাদের হাইপারটেনশনের পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

অথবা ভিক্ষুকদের সাধ্যমত পয়সা দিই। তবে কোনও ক্ষেত্রেই দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করি না, কর্তব্য হিসাবে কিছুটা দায়িত্ব পালন করি। অথবা ভিক্ষুকদের জ্ঞান বিতরণ করি না। ভিক্ষা দেবার ক্ষমতা না থাকলে সরাসরি 'না' বলে দিই।

আমি জানি, সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কাজ, অনেক ব্যক্তিরাই ভিক্ষাকে সহজতম পেশা হিসাবে বেছে নেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অক্ষম ব্যক্তিরাও ভিক্ষুকে পরিণত হয়। সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। ভিখারীদের শুধুমাত্র ভালো ভালো কথা বলে জ্ঞান দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা যাবে না। আইন করে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে হবে এবং একই সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সরকার এবং বিভিন্ন গণ-সম্প্রদায় উদ্যোগী হয়ে সমস্ত ভিখারীদের কর্মের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। অন্যথায় আমার মতো অনেক ব্যক্তিকেই ত্যাগ স্বীকার করে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত।

প্রদীপকুমার দৈত্য

এগরা

□□

ভিক্ষে দেওয়া কোনো দোষ বা অন্যায় নয়। যদি কেউ ভিক্ষা চায় আর আমরা তাকে ভিক্ষা দিই, তাহলে সে অন্ততপক্ষে সেই সময়ের জন্য ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে। কিন্তু এভাবে ভিক্ষে দিয়ে আমরা ক'জনেরই বা ক্ষুধা নিবৃত্তি করাতে পারি, ক'দিনই বা পারি!

কাউকে ভিক্ষা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুধা নিবারণ করানোর পরিবর্তে আমাদের চেষ্টা করা উচিত চিরতরে যেন তার ক্ষুধা নিবারণ হয়। কিন্তু তা যদি করতে হয় তবে নিশ্চয় তাকে কাজ দিতে হবে যার মাধ্যমে সে উপার্জন করবে। কিন্তু এই কাজ পাওয়া আজকের দিনে বড়োই কঠিন ব্যাপার। চারিদিকে সবাই কাজ কাজ করে চেঁচিয়ে মরছে, কাজ আর জোটে না। কি আশ্চর্যের ব্যাপার, বলে বলে নয়, মানুষে কাজ করে খেটে খেতে চায় তবু সেটাও তাদের ভাগ্যে জোটে না।

ভিক্ষা কারো পেশা নয়। কেউ চায় না দিনের পর দিন প্রতিনিয়ত লোকের কাছে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা করতে এবং লাঞ্ছনা ভোগ করতে। দারিদ্র্য তাকে বাধ্য করে ভিক্ষা করতে। কিন্তু ভিক্ষা চাইলেই ভিক্ষা দেবে কে? বেশির ভাগ মানুষই তো দরিদ্র।

তাই আমাদের যদি নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে হয় তবে অবশ্যই কাজ করতে হবে। কিন্তু যেহেতু এই সমাজব্যবস্থায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না তাই আমাদের উচিত এটাকে পাল্টে এমন এক সমাজ গড়া যেখানে সবাই কাজ পাবে এবং নিজের প্রয়োজন মেটাবে।

বন্দনা মাইতী

প্রতাপপুর, পুরুলিয়া

□□

কাউকে ভিক্ষে দেওয়ার আগে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে ভালো যে, যাকে ভিক্ষে দেওয়া হচ্ছে তার ভিক্ষে করার পিছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি নেই, কেননা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ভিক্ষাবৃত্তি অলসের জীবিকা অর্জনের একটা রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা এই যে, একবার ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে কারো কাছে হাত পাততে আর তারা লজ্জিত হয় না। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে একবার হাত পাততে বাধ্য হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তিটি পরবর্তী কালে পেশাদার ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। কাজেই কাউকে ভিক্ষা দিয়ে তাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করার অর্থ সমাজে একজন আত্মমর্যাদাহীন নাগরিক বাড়ানো যা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। ছাত্রজীবনে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে একজন ভিখারীকে ভিক্ষে দেওয়াটা প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার বাসটা একটা নির্দিষ্ট স্টপেজে দাঁড়ানো মাত্র বাসের পাশে দাঁড়িয়ে একঘেয়ে সুরে অনুনয় করে দুটো পয়সা চাইত সে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়েই তাকে রোজ পয়সা দিতাম। কিন্তু একদিন যখন তাকে ঐ স্টপেজেই দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে দেখলাম সেদিন আমার ভুলটা ভাঙল। কষ্ট বা কম হবে কেনেটি—যারো কি জেরো। ভিক্ষাজীবী কিশোর—শুধু শুধুমাত্রে অভ্যস্ত এবং তাও বিড়ি নয়, একেবারে সিগারেট।

আমি তাই ভিক্ষে দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট মাত্রায় সতর্ক থাকি যাতে কোনো অলস ভিক্ষাজীবী প্রশ্রয় না পায়। কাজ করতে চাইলে এবং অক্ষম বার্ধক্যের না হলে কাজের কোনো অভাব হয় না। ভিক্ষে দেব তাকেই যে শারীরিকভাবে পঙ্গু—যার জীবিকার্জনের জন্য অন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই। সক্ষম ব্যক্তিকে ভিক্ষে দিয়ে তাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহ দেওয়াকে আমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলেই মনে করি।

প্রকাশ দাস বিশ্বাস

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

□□

স্বীকার করে নেওয়া ভালো যারা ভিক্ষা দেওয়াকে পরনির্ভরশীলতা, আলস্য, দুর্নীতি বাড়ার ব্যাপারে সহায়ক মনে করে ভিক্ষা দিতে চান না—আমি তাদের দলে নেই, এঁদের অনেকেরই বাস নেই। সেক্ষেত্রে দুটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। সেখানে আমার মতো আরও অনেকে উপস্থিত আছেন অথবা আমি নেহাতই একা। অপেক্ষাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি হলে আমার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ হবে:

১. ভিখারির সামনে আসামাত্র আমি দৃষ্টিকে ঘাড় নাড়ব অর্থাৎ আমি দিতে ইচ্ছুক নই অথবা 'মাপ কর' মনোভাব বুঝে নিয়ে সে যেন কেটে পড়ে।

২. দ্বিতীয়বার চাইলে আমি তার সামনে থেকে সরে পড়ব, যাতে সে আমার পিছনে

আশাটা বৃথা মনে করে অন্য ব্যাপারের দিকে ধাবিত হয়।

৩. তাও যদি সে নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে আমার পিছনে এঁটুলি পোকার মতো লেগে থাকে তবে দশ পয়সা দিয়ে বিদেয় করব অবশ্যই বিরক্তি সহকারে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঙ্গে যদি কেবল আমি একাই থাকি তবে প্রত্যেকেই তাকে দশ পয়সা দিয়ে দেব। খুচরো না থাকলে পাশাপাশি কোনো দোকান থেকে সিগারেট কিনে খুচরো করে নেব।

দুঃখিত, আমি ভিখারীদের দান দেওয়ার পক্ষপাতী নই, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে আমার যে শুধু উপার্জিত আয়ে তা অন্যের অন্নসংস্থানের মতো উটকো দিকে ব্যয় করতে পারব না। ওটা সমাজসেবীদের সংগঠনের কাজ।

অমিয়লেখা দাস

[illegible]

☐☐

প্রথমত যে ভিখারি বলে যে, 'যে কোন কাজ, আহার দিয়ে দিন আমি করব।' তার আদৌ ভিক্ষা করার মানসিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ সে নগদ পয়সা চাওয়ার পরিবর্তে কোন একটা কাজই চাইবে অথবা তার আবেদন অন্যভাবে পেশ করবে। তর্কের খাতিরে বর্ণিত ঘটনা সত্য বলে মেনে নিলেও অন্তত আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে, ভিক্ষা সাধারণত অন্ধ ও অক্ষম লোক ছাড়া দিই না। এবং ভিক্ষা না দিলেও কাউকে অযথা এই উপদেশও দান করি না যে, 'কাজ করে খেতে পার না'।

ভিক্ষা করলে একটা পরজীবী অপেক্ষমাণী মানসিকতার সৃষ্টি হয় এবং কর্মহীন অলস জীবনকেই বাঁচার রসদের বিকল্প স্বীকৃতিদান। সেই কারণেই ভিক্ষা দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলেই মনে করি। তা সত্ত্বেও যদি সত্যই কোনদিন কোন ভিখারি ছেলের সামনে এমন অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হই, তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে দ্রুত ওর হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে সরে পড়া। কারণ ইতিমধ্যে আমার মধ্যবিত্ত মন সতর্ক করে দিয়েছে যে, রাস্তার ভিখারীকে বাড়িতে এনে কাজ দেবার মতো বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেবার হঠকারিতা করো না, সুতরাং মানে মানে এই বেলা কেটে পড়।

[illegible] দেব

[illegible] (উঃ)

☐☐

ভিখারির দ্বারা বিরক্ত হন বা বিব্রত হন সবাই। প্রতিদিনের যাতায়াতের পথে আমিও বাসে ওঠা ও বাস থেকে নামার সময় ভারাক্রান্ত মোড়ে ভিখারির দ্বারা বিরক্ত হই। অনেকবার এদের জন্য সহযাত্রীর সাথে ধাক্কা খেয়েছি। বাড়িতেও ভিখারী আসে। আগে এক সময় অন্ধ খোঁড়া বা অসুস্থ দেখে এক টাকা দুটাকা ভিক্ষা দিতাম, কিন্তু এখন আর একটা পয়সাও দিই না। একবার আমার কলকাতার বাসায় প্রায়ই আসা এক ভিখারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে কাজ করতে চায় কি না। সে স্বীকার করবে। আমি তাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলেছিলাম পুরনো খবরের কাগজ কিনে ঠোঙা বানাতে; এবং ঠোঙাগুলো বিক্রি করার দায়িত্বও আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু টাকা নিয়ে চলে যাবার পর মাস ছয়েক আর আমার বাসার দিকে আসে নি। মাস তিনেক পরে একদিন তাকে টালিগঞ্জ স্টেশনে ভিক্ষা করতে দেখলাম। লোকটা আমাকে দেখে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। আমার দৃঢ় ধারণা লোকটা আমাকে চিনেছে। এখনও মাঝে মাঝে লোকটাকে ধর্মতলায়, বেহালায় এবং টালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে দেখি। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছা করে না। আরও কিছু অভিজ্ঞতার আমার কাছে একটা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে—ভিক্ষা করা মানুষের এক ধরনের বৈধ জীবিকা। স্টেশনে বাজারে মেলায় অনেক বালক শিশু এবং দুগ্ধ সন্তান কোলে মহিলাকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। এরা দারিদ্র্য সত্ত্বেও এবং সংগঠিত। ভিখারি পরিবারও আছে এদের নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, ধনী এবং শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত যুবকরা যেখানে বেকার থাকলে বিবাহ করতে সাহসী হয় না, এবং ভাল রোজগারি মানুষেও যখন একটি বা দুটি সন্তানের পর জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানে এই ভিখারিরা বিবাহ করে কিসের ভরসায় এবং এত সন্তানই বা হয় কিভাবে। অনেকে বলবেন, এরা গরীব এবং অশিক্ষিত। এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। মানুষ হলেই তার একটা বিচার বুদ্ধি থাকে, আর থাকে বলেই অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে [illegible] স্বীকৃত। আসলে এরা মানুষকে বিব্রত করে এবং অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাজকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চায়।

ছুটিতে আমি গ্রামের বাড়িতে যাই। একটু আধটু সামাজিক কাজে থাকি। নির্দিষ্ট দশ বারটি লোক প্রায়ই কিছু না কিছু আর্থিক সাহায্য চায়। বলে, এরা খেটে খাটে নইলে পেট চলে না। আমাদের মতো মানুষেরা কিভাবে পরিবার সীমিত রেখেছি জানতে চায় না, জানাতে গেলেও শুনতে চায় না। এরাও এক ধরনের ভিখারি। অভাবে নয়, স্বভাবে। কিছুই করার নেই এদের জন্যে। এদেরই নাম তৃতীয় বিশ্ব। এরা শুধু চাইতেই জানে।

প্রদীপ সানা

[illegible], হাওড়া

☐☐

ভিক্ষাবৃত্তির অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে দুটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, দারিদ্র্য এবং দ্বিতীয়ত কর্মসংস্থানের অভাব। অভাব চরম পর্যায়ে গেলেই মানুষ ভিক্ষা করতে শুরু করবে এমনটি বলা যাবে না। সভ্যসমাজে ভিক্ষা নামক পেশায় বেঁচে থাকা যায়। তবে ভিক্ষার জন্য এক বিশেষ মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। ভিক্ষা করার মানসিকতা একবার গড়ে উঠলে তাকে স্বাভাবিক কর্মজীবনযাপনে ফিরিয়ে আনা কঠিন। রাস্তায় হঠাৎ দেখা ভিখারির সঙ্গে আমার বোঝাপড়ায় অনেক

ভাতার। তাকে বাড়িতে আনায় অনেক ঝুঁকি। ভিখিরি সমস্যা একটি সামাজিক সমস্যা। তাই ব্যক্তির উদ্যোগে এর সমাধান প্রায় অসম্ভব। তবুও কিছু প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে আমরা প্রায়ই একান্নবর্তী পরিবার-চ্যুত হয়ে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। পরিবার ছোট হলেও পারিবারিক কাজের পরিধি কিন্তু মোটেও ছোট নয়। বাড়ির ছোট খাটো কাজ যেমন—ঘর ঝাঁট দেওয়া মোছা, মাছ কাটা, বাজার করা ইত্যাদি। প্রথম প্রথম এইরকম ছোট কাজে তাকে ছুটির দিনগুলোতে যুক্ত করা যেতে পারে। এবং এর মধ্যে দিয়ে তার সঙ্গে বোঝাপড়া বাড়ানো যেতে পারে। যদি সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকে তবে বাড়ির অনেক কাজই, কোনো পরিবারের জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রী বা বাড়ির বাজার হাট করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না সেগুলি করানো যেতে পারে। বিশেষত, সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে। ঝুঁকি থাকেই, তবে তার সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টার কাজটি চালিয়ে যেতে হবে। এই কাজটির জন্য কেবল তার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন নয়। তার নিবাস, ভিখিরি পর্যায়ে পৌঁছনোর কারণগুলি সহানুভূতি ও দক্ষতার সঙ্গে জানতে হবে। এই ভাবে তার ক্ষেত্রে সম্মান সঠিকভাবে পাওয়া গেলে তবেই দায়িত্বশীল কাজ দেওয়া যেতে পারে। সমস্ত ক্ষেত্রে ভিখিরি না হলেও এদের মধ্যে যারা কর্মক্ষম তাদের দ্বারা এই প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে।

কোনোরূপ কারণ হিসেবে যথেষ্ট কাজের অভাব থাকলেও অন্য ক্ষুদ্র কাজের সম্ভাবনা আমাদের চারপাশে রয়েছে। যে কাজগুলি আগে আত্মীয়-প্রতিবেশী দ্বারা হয়ে যেত, বিভিন্ন কারণে তা আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। নিকট আত্মীয়কেও ব্যক্তিগত কাজের জন্য ডাকা করে করতে পারছি না। তাই অসংখ্য ভিখিরি নামক জনগণকে এইভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ঠেকছি তো সর্বত্র দোকানদার আত্মীয়-পরিজন, সহকর্মী—সকলের কাছেই। সুতরাং আর একবার ঠকার কথা ভেবেই এই ঝুঁকি একটি সম্ভাবনা হতে পারে।

সুব্রত ঘোষাল

[illegible]পুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

☐

আমার মামার এক 'সমাজসেবী' বন্ধু বছর কয়েক আগে আমাকে বলেছিলেন: 'টি. বি. রোগীকে সাহায্যের চেয়েও এ রোগ যাতে সমাজ থেকে একেবারে নির্মূল হয়, সেদিকটাই লক্ষ্য রেখো সবার আগে।' আজ তিনি শুধু 'সমাজসেবী' হিসেবেই পরিচিত নন, একজন বড় মাপের নেতাও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর সেদিনের সেই স্বচ্ছ ভাবনার বহিঃপ্রকাশ আজ আর দেখি না; অনেকের মতে তাঁরও নীতি-আদর্শ আজ সবই প্রায় ভূলুণ্ঠিত।

"ভিখিরি ও আপনি" সম্পর্কে কিছু লিখতে বসে বন্ধুর উপরোক্ত কথাগুলো যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক মনে হলো। একটা নোংরা কাপড়ে চেহারার ভিখিরিকে প্রয়োজনে কিছু পয়সা দিয়ে সাহায্য করার বদলে 'কাজ করে খেতে পারো না' বলার উপদেশ দেওয়াটা যে এক ধরনের হঠকারিতা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, আমার ক্ষমতা কতটুকু! আমি কি পারব ভিখিরিটিকে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম কোনো কাজ পাইয়ে দিতে? পারব কি নিজের বাড়িতে বা বন্ধু-আত্মীয়ের কাছে উপযুক্ত মর্যাদায় কোনো কাজ দিয়ে সাহায্য করতে?—না। নিশ্চিতভাবেই আমি জানি, আমি পারব না। সুতরাং আমার কোনো অধিকারই নেই, যখন-তখন যাকে-তাকে মূল্যহীন কিছু জ্ঞান দান করার।

এখানে প্রশ্ন: তবে কি আমি পথে-ঘাটে ভিখিরি দেখলেই পকেটে খুচরো পয়সার অন্বেষণ করব?—না, ঠিক তা নয়। একজন আপাত সুস্থ-সবল মানুষকে বা একজন প্রতারককে আমি কখনোই ভিক্ষা দিতে চাইব না। এবং বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে কোনোরকম 'পাপবোধই' আমাকে স্পর্শ করবে না। তবে প্রকৃতই অন্ধ বা অসহায় বুঝলে তাকে দেবো কারণ, আমি যেমন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি, দেখে ওই লোকটিও। দিন বদলের ভাবনা যেমন প্রতিমুহূর্তে আমাকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি ওই লোকটিও হয়তো তার অবচেতন মনে আত্মজদের সামান্যতম সুখ, একটু শান্তি আর ভালোবাসা। তাই সেরকম লোককেই শুধু সাহায্য করতে চাইব।

হ্যাঁ, এটাই আমার অকপট স্বীকারোক্তি। এর বাইরে সুন্দর সুন্দর ভাবনার উপস্থাপনা কিংবা সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু বলতে চাওয়াটা আমার কাছে বাস্তবিকই সত্যের অপলাপ মাত্র।

সমুদ্র সান্যাল

[illegible], হাওড়া

☐☐

না, ভিখিরিকে আমি পয়সা দেব না। এবং ভিখিরি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেও আমি কিছু করতে পারি না। কারণ তা আমার সাধ্যের বাইরে। আমি আমার সীমাবদ্ধতা বুঝি। অন্য কাজ করার পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া থেকেও আমি বিরত থাকব। আমার কাছে ভিখিরি যখন পয়সা চাইবে প্রথম অনুরোধেই আমি তাকে সরাসরি জানিয়ে দেবো—'আমি আপনাকে পয়সা দেবো না'। এরপরও সে তার অনুরোধ চালিয়ে গেলে তাকে উপেক্ষা করব। তার সঙ্গে আর কোন বাক্যবিনিময় করব না। বাসস্টপের অন্যান্য 'উদার ও সহযোগী' মানুষজন তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তা দর্শকের মতো দেখব। কাউকে কিছু বলব না।

আমাকে স্বার্থপর, অমানবিক মনে হতে পারে। হোক, আমি ভিখিরিকে সাহায্য করাকে বড় কাজ মনে করি না। তাকে সাহায্য দেওয়ার অর্থই হলো তার এই নির্ভরশীল আত্মসম্মানহীন অবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা। আমি এমন উদ্যোগ নিতে পারি না। একজন মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়লেই সে ভিখিরি হয়ে যায় না। ভিখিরি হতে গেলে মানুষটিকে আত্মসম্মানবোধ খোয়াতে হয়। সে দুঃখ পেতে

পারে। কষ্ট ভোগ করতে পারে। তার দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হতে পারলে এক ধরনের আত্ম-অনুভব করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি। কিন্তু তাকে ভিখিরি হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য জোগানে লিপ্ত হব কি করে? আরো অন্য-জনের মতো তার হাতে কয়েকটা দান গুঁজে দেবো না। করুণা তো ভীষণ লজ্জা আর অপমানের। ভিখিরিদের এক সঙ্গে বসিয়ে 'নর-নারায়ণ সেবা'-র নামে-ভোজনের ব্যাপারেও আমি সমান বিরোধী। কোন একদিন কোন এক ভিখিরিকে কয়েকটা পয়সা দিয়ে কিংবা খাবার দিয়ে কী হয় শেষ পর্যন্ত? খাদ্য হিসেবে একটু বড়মানুষি হয়তো দেখানো যায়, তার বেশি নয়। এধরনের তথাকথিত সমাজসেবায় আমার আস্থা নেই। চাই সার্বিক পরিকল্পনা। যারা ভিখিরি হয়ে গেছে তাদের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। বরং অন্যদের—যারা দুস্থতার শেষ সীমায়, তাদের আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। অত্যন্ত কঠিন কাজ এটা। কারা করবে? আমার মতো যারা ভিখিরিকে কটা পয়সা দিয়ে দায়িত্ব-মুক্ত হয়ে যায় না তারাই এটা করবে।

প্রদীপ সাহা
বড়িশা, কলকাতা

পরবর্তী সংখ্যার বিষয় :

১১. বাসে-ট্রামে লেডিস সিট

দুই নিত্যযাত্রীর কথোপকথন :

পুরুষ—যা-ই বলুন, আপনাদের জন্য ওই লেডিস সিটগুলো রাখার কোনো মানে হয় না। অত্যন্ত অন্যায়।

মহিলা—অন্যায় কেন বলছেন? মেয়ে-দের ভিড়ের মধ্যে কত সুবিধা হয় ওতে বলুন তো!

পুরুষ—দিব্যি ফোকটে সুবিধা আদায় করে নেবেন আপনারা! অন্যদিকে আবার নারী-স্বাধীনতা, সমানাধিকার, সমমর্যাদা নিয়ে চেঁচাবেন! এটা অন্যায়, অনুচিত নয় বলবেন?

মহিলা—না নয়, অন্তত বাস-ট্রামের ক্ষেত্রে। অন্য বিষয়ে এই মহিলা-পক্ষপাতে আমিও আপত্তি করব, কিন্তু ভিড়ের বাস-ট্রামে কি-রকম অসভ্যতা হয় আপনি জানেন না? গাদাগাদি ভিড়ের সুযোগ নিয়ে দুশ্চরিত্র কিছু তথাকথিত ভদ্রলোক হরদম উত্যক্ত করে, অসম্মান করে মেয়েদের। ছেলে-বুড়ো বাদ নেই। অধিকাংশ মেয়ে সংকোচে প্রতিবাদ করতে পারে না, চেঁচামেচি করলে বিদ্রূপ শুনতে হয়। তখন নিজেকে অপমান লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে মেয়েদের অনেকটা ভরসা ওই লেডিস সিট। ভালো করে ভেবে দেখুন তো, আমি অন্যায় কথা বলছি কি-না!

…সত্যিই ভাবতে হয়। আপনিও ভেবে বলুন আপনার মত।

একান্ত নিজস্ব মতামতের জন্য এই দপ্তর। বক্তব্য সরল ও যুক্তিপূর্ণ হওয়া চাই। অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার একমাসের মধ্যে দপ্তরে জমা পড়া চিঠি নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবে। প্রয়োজনবোধে চিঠির অংশবিশেষ সম্পাদনা করা হতে পারে, কিন্তু পাঠকের মূল বক্তব্যের ওপর কোনোরকম সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না।

পত্রিকা-সম্পাদকমণ্ডলী

বইপত্র :

আলোচনা / পরিচয়

রোগ প্রতিরোধ কথা

সমাজের একটি অংশের জীবনমানের প্রকৃত উন্নতির কথা জানবার জন্যে আজ আর বিশেষ সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিতে হয় না। এই অংশের মানুষেরা অর্থের বিনিময়ে সুখ-শান্তি-আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এদের পরিসেবার জন্যে শহর-মফস্বল জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। প্রচারের মাধ্যমে 'নার্সিংহোম' ব্যাপারটির মধ্যে কোথায় যেন সুচিকিৎসার একটা টান মানুষজনেরা অনুভব করে। ফলে যার আর্থিক সংগতি নেই সেও সুচিকিৎসার আশায় নার্সিংহোম নামক চিকিৎসা-ব্যবস্থার খপ্পরে হয়। এ যেন এক অদ্ভুত চক্র। প্রিয়জনের রোগ মুক্তি—নার্সিংহোমে চিকিৎসা—আর্থিক চাপ—সব মিলিয়ে একটা পরিবার অসুস্থ হয়ে ওঠে।

একটা সময় গেছে যখন সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থা একটা নির্ভরতা পেত। আজ রাষ্ট্র তার কল্যাণকর তকমাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। সরকারি হাস-পাতালের পরিবেশ দিনকে দিন অসহনীয় হয়ে উঠছে। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন সাধারণ মানুষের সুচিকিৎসা পাবার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। দুর্ভোগ বাড়ছে। রোগী-ডাক্তার-প্রশাসন-আক্রোশ-ক্ষোভ-দুর্নীতি সব মিলিয়ে রোগমুক্তিকামী মানুষেরা অসহায়।

এই যখন সামগ্রিক ছবি, তখন একজন গণ-বিজ্ঞানকর্মী ও সমাজকর্মীর কী ভূমিকা হওয়া

□ 'মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা' / সুনীতিকুমার মণ্ডল

□ প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০ ০১৩

□ দাম : তিন টাকা

বাস্তুনীর ? তারা কি হাতপুতুলের মত থাকবে ? না প্রশাসনের জনস্বাস্থ্যকে গতিশীল করার জন্যে অথবা ব্যয় করা চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে সজীব করার জন্যে সক্রিয় হবে। শুধুই বিজ্ঞান চেতনার মাধ্যমে কোনো কাজ দেবে না। একদিকে চিকিৎসা-ভাবনার ভুল ধারণাগুলোকে বাতিল করতে হবে, অন্যদিকে বাতিল ব্যবস্থাকে পাল্টানোর জন্যে নতুন কিছু কথা বলতে হবে।

সুনীতিকুমার মন্ডলের 'মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা' বইটি সাড়াই দেওয়ার যোগ্য। একটা চটি বই—কিন্তু তথ্যে ঠাসা। শরীরের জটিল প্রতিরোধী ব্যবস্থাগুলোকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে পরিবেশন করেছেন। লেখক নিজে একজন একনিষ্ঠ গবেষণা কর্মী হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষের শারীরবৃত্তীয় অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। বর্তমান বইটি তারই ফলশ্রুতি বা গবেষণা কর্মীদের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। বইটির ভূমিকাপর্বে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য থেকে এ লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়।......'সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম হচ্ছে। অজানার চেয়ে এখন জানার পরিমাণ বেড়েছে। আমাদের শরীরের কাজকর্ম ও রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখন মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে।......এই লেখা বিশেষজ্ঞদের কিংবা গবেষকদের জন্য নয়। এটি সেইসব মানুষদের জন্য যারা শরীর আয়ত্বের সঙ্গে কিছুটা জানতে চায় অথচ তারা কিংবা উপযুক্ত বইপত্রের অভাব অনুভব করে রয়েছে। লেখাটি আরো বেশি করে সেইসব তরুণ-তরুণী বিজ্ঞানকর্মীদের জন্যে যারা সবকিছু বুঝে নিতে চায়, যাচাই করে নিতে চায়, যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী হতে চায়।......'

পঞ্চাশ পাতারও কম বইটিতে লেখক পাঁচটি পর্বে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া-অ্যান্টিবডি-রক্ত-নালিকা কোষ—প্রতিরোধ-সক্রিয়, অ্যানার্জি, এম. আর. টিকা সমেত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের সমস্যা, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের ছাপা বইয়ের প্রচ্ছদে একটি বিদেশী শিশুর ছবি কেমন বেমানান লাগল। এতে কোনো বাড়তি গুরুত্ব আসবে কিনা জানি না।

বইটির এত দাম কেন? সরকারি ভর্তুকি দেওয়া বইতে এত দাম হলে অন্য প্রকাশকেরা কি করবে? তাহলে কি পর্ষদ কেবল বই ছাপতেই আগ্রহী, প্রচারে নয়! বইটিতে অজস্র ছাপার ভুল। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি আর দেখতে হবে না।

পবন মুখোপাধ্যায়

অথ 'অ-ধার্মিকের' ধর্ম-কথা

ধর্মের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মের ইতিহাস বিজ্ঞান চেতনার বিরুদ্ধে অজ্ঞানের লড়াইয়ের ইতিহাস, সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের সন্ত্রাসের ইতিহাস। এই নিরিখে লেখক 'অধার্মিক' আমাদের 'ধর্মকথা' উপস্থাপনা করেছেন। সাম্প্রতিককালের বিতর্কিত ঘটনা সমূহ এবং তার ধর্মীয় সামাজিক প্রতিক্রিয়া ১১টি নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বিষয়ের প্রেক্ষাপটে রয়েছেন শঙ্করাচার্য থেকে তসলিমা, চার্বাক থেকে রামকৃষ্ণ রাও। এসব অনুসন্ধানী মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

সামাজিক ঘটনা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমরা দেখি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সময় থেকেই এই শিক্ষার ম্যানিফেস্টোরা নির্ধারিত করেছিলেন যে, শিক্ষিত ভারতবাসীদের দু-ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এক ভাগ ক্রমাগত পুরোনো ব্যবস্থা পুরোনো প্রথা আর কুসংস্কারকে বংশ পরম্পরায় আঁকড়ে থাকবে, অপর অংশ এদের আঘাত করবে। এই ভাগ করা ব্যবস্থা চলতে থাকলে তাদের শাসনকার্য পরিচালনার কাজটা অনেক সুবিধে হবে। সেক্ষেত্রে ভাগ আক্ষরিক অর্থেই সংখ্যালঘু হবে। বর্তমান ব্যবস্থাও এর থেকে আলাদা কিছু নয় তবে পরোক্ষে শঙ্করাচার্যরা এ-পারিস পালনের জন্যে এগিয়ে আসে। স্বাধীন দেশের হাত ধরার এরা 'কনসেপ্ট'—বিধান দেয় কোনটা পড়তে হবে কোনটা হবে না। কারণ প্রশাসকেরা এদের মুখ দিয়ে এসব কথা আমাদের শোনালে সম্প্রদায় থেকে বাঁচা মানুষের দ্বন্দ্বও বাড়াতে পারবে—আমরা আরো বিচ্ছিন্ন হব। পরিশেষে এই পার্থক্য আমাদের সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের পার্থক্যকে বাড়াবে। এক সময়ে এটাই প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এখন একইভাবে সরল উপন্যাসও ভূমিকা নিচ্ছে। লেখক এ-প্রসঙ্গে 'লজ্জা' উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন। উপন্যাসের লেখিকার বর্তমান ভূমিকা আমাদের এ-ব্যাপারে শঙ্কিত করেছে। তবে, প্রতিক্রিয়াশীলরা সাময় তোলে নিজেদেরই গায়ে ফেলার জন্যে কারণ যাবতীয় ঘটনাক্রম থেকে তসলিমা উপমহাদেশের সৃষ্ট ঘটনা কোনো গভীর ছাপ রাখে না।

ইসলাম, খ্রিস্টান বা হিন্দু এই সমস্ত ধর্মের মুখোশ পরোক্ষে লেখক খুলে দেখেছেন এই সংকলনের বিভিন্ন স্থানে—এই 'ধর্ম-কথা', নিঃসন্দেহে মানুষকে 'অধার্মিক' করে তুলবে। যদিও লেখক বিষয়-নির্বাচনে পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গ অস্বীকার করেন নি তবুও আশাবাদী হিসেবে '৩১ ডিসেম্বর ২০৯৪'-এর প্রতিবেদনে আমাদের অন্যভাবে দেখার সুযোগ রেখে দিয়েছেন।

পরিশেষে, উদার অথবা আক্রমণাত্মক—ধর্মের যে মুখোশই তারা আঁটুক না কেন, ধর্ম যে মিথ্যা

□ অধার্মিকের ধর্ম-কথা / ভবানীপ্রসাদ সাহু

□ উৎস সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, [illegible]।
পৃ. [illegible]।

□ দাম : তিরিশ টাকা।

চেতনা বিকশিত করে, সে-চেতনা মানুষকে তার শ্রেণীগত গণ্ডীর বাইরে এক অলীক গণ্ডীর স্বপ্ন দেখায় সেই মিথ্যা চেতনার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্যে মানুষের কাছ থেকে লেখক সবাই আশা করে থাকেন বলে মনে হয়।

সত্যব্রত ঘোষাল

প্রসঙ্গ : কানপুরের বাঁধ, দামোদর দূষণ ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

'উৎস মানুষ' পত্রিকার জুলাই '৮৪ সংখ্যার "কানপুরের বাঁধ" এবং অগাস্ট সংখ্যার "দামোদর দূষণ ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা" নিবন্ধ দুটি নিঃসন্দেহে পাঠকদের নদী প্রকল্প বিষয়ে শিক্ষণীয়।

দামোদর দূষণের কথা এবং প্রায় দামোদর-প্রকল্প বিষয়ে বহুবার বলা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় লেখা, সময়-সময় প্রকাশিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ কান দেয় না। আর সাধারণ মানুষ নির্বিকার হয়ে থেকেছে, আজও আছে।

আমি দীর্ঘ দিন দামোদর প্রকল্প সংশোধন আন্দোলনের সাথে যুক্ত; আজও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জনদরদী নদী বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য এই কাজেই জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই।

প্রাক-প্রকল্পের আগে দামোদরের জলে বিভিন্ন মিনারেল যুক্ত ছিল। ফলে কৃষিতে উপকার পাওয়া যেত এবং কোটি টাকার মাছের চারা পাওয়া যেত প্রচুর মাত্রায় অনায়াসে। এখন তা আর হচ্ছে না। বিদ্যুৎ যা উৎপন্ন হচ্ছে তাও কৃষিতে নিশ্চয়তা দিচ্ছে না।

এ বছর ডি ভি সি পাঁচবার জল ছেড়েছে। তিন বার কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন মাঠে-মাঠে যে ফসল দেখা যাচ্ছে তারও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নয়।

নিবন্ধকার চিত্ত দত্ত মহাশয় বহু পরিশ্রম করেছেন। প্রতিকারের বিষয় জানালে ভালো হতো।

ফরাক্কা থেকে ৪০ হাজার কিউসেক জল পাওয়া যাবে না বা যেতে পারে না। তার কারণ আমরাই গঙ্গার ওপর অনেক খাল কেটে সেচের জন্য জল টেনে নিচ্ছি। এর ফলে ফারাক্কা থেকে ৪০ হাজার কিউসেক জল পাওয়া যেতে পারে না। এ-কথাটা কর্তৃপক্ষ এবং সংবাদপত্রগুলি চেপে রেখেছিলেন। আর এই কথা প্রকাশ করার অপরাধে কপিল ভট্টাচার্য মহাশয়কে শাসন করা হয় এবং পিপলস ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চাকরিটা তাঁকে খোয়াতে হয়। চাকরি না করে পরামর্শদাতা বাস্তুকার হিসাবে তিনি যা রোজগার করতেন তাতেই তাঁর চলে যেত। চাকরিতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, ১টি চেক কোম্পানির সহযোগিতায় ঐ কারখানায় এদেশে ড্রেজার তৈরি করার ব্যবস্থা হতে পারে বলে। তাঁর চাকরি যাওয়ায় সে সম্ভাবনা থেকে দেশ বঞ্চিত হয়েছে।

ফরাক্কা হতে ৪০ হাজার কিউসেক জল পাওয়া গেলে কলকাতা বন্দরের নাব্যপথ আরও আগেই মজে যেত। কারণ জোয়ারের জল আর ফরাক্কার জল যেখানে মুখোমুখি হতো সেখান থেকে নদী মজতে শুরু করত। দীর্ঘ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্রবল জোয়ার নদী গর্ভে আসে তাকে ঠেকাবার শক্তি স্বল্প ভাটার জলের নেই। কারণ তার কোনো উৎস নেই। ২৪ ঘণ্টায় দুবার—জোয়ারের জল হুগলীতে আসে। জোয়ারের জলে পলি থাকে সবচেয়ে বেশি। ওপর দিক থেকে আসে যে-জল তাতে তত বেশি পলি থাকে না।

কানপুরে বাঁধ হলে ফরাক্কা আর ব্যারাজ থাকবে না। সেটা শুধু রেল ও সড়ক পথরূপে কাজে লাগবে।

কলকাতা বন্দরের নাব্যপথ রক্ষার জন্য দামোদর প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার কিছু অদল-বদল করতে হবে। আমার বিশ্বাস '৭৮ সালের বন্যার মতো আগামী আর একটি বন্যার পর কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ সে-কথা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারবে।

৪০ হাজার কিউসেক জল না পেলে কলকাতা বন্দরের নাব্যপথ রক্ষা পাবে না এ-ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল।

গঙ্গার ওপর ব্যারাজ তৈরির স্থান নির্বাচনে দেশী-বিদেশী কোনো বিশেষজ্ঞ ফারাক্কাকে সুপারিশ করেন না। বিশেষ যে-কজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের অভিমতের কথা বলা হয়েছে তার ৩ জনের রিপোর্ট সেচ-মন্ত্রী প্রয়াত অজয় মুখার্জি মারফত আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। ফারাক্কা প্রকল্পের রিপোর্টও তিনি

আমরা পাড়িয়ে দিয়েছেন। এর হয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়র ও হ্যানসন সাহেব আসেন। তাঁরা ঐ স্থানকে ব্যারাজ তৈরির উপযুক্ত না বলেই মত প্রকাশ করেছিলেন।

হুগলী জোয়ার-ভাটার নদী। তার মোহনার প্রশস্ততা বাড়বে এবং পূর্ব প্রান্তের যে প্রাকৃতিক সুযোগ ছিল তাকে কাজে লাগাতে হবে। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা উদ্ধার হলে গঙ্গা পর্যন্ত নদীপথ নাব্য হয়ে যাবে। এই ব্যারেজের হুগলীর নাব্যতা রক্ষা করা যাবে না।

কারিগরিভাবে নদীর জলকে সোজা করে বাংলাকে নদীর ক্ষতি হবে — একথা সবাই জানেন। আশা করব, 'উৎস মানুষ'-এর পাঠকরা এ-বিষয়ে মত প্রকাশ করবেন।

নদী চাই। নদী না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কথাটা জানান দিচ্ছে।

রামনাথ ঘোষ

সম্পাদক - পশ্চিমবঙ্গ নদ-নদী রক্ষা সমিতি

হবে

❑ জনগণের নেশন প্রসঙ্গে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে গণদর্পণের উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ এপ্রিল '৯৫ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ১৮ ফেব্রুয়ারি — মেদিনীপুর, ১৯ — পুরুলিয়া, ২৫ — বর্ধমান, ২৬ — বাঁকুড়া, ৪ মার্চ — হাওড়া, ৫ — হুগলী, ১১–২৪ পরগনা (দ.), ১২ — বীরভূম, ১৮ — ২৪ পরগনা (উ.), ১৯ — নদীয়া ২৫ — মুর্শিদাবাদ, ২৬ — মালদা, ১ এপ্রিল — দিনাজপুর (উ.) ২ এপ্রিল — দিনাজপুর (দ.) ৮ — দার্জিলিং, ৯ — জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার, ২২–২৩ এপ্রিল রাজ্য সম্মেলন কলকাতায়।

❑ আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯১ সোর্কিসদনে বিজ্ঞান পাঠচক্র ১৯৮০ সালের সূর্যগ্রহণের ১৫ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে। এই অনুষ্ঠানে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ-বছরের সূর্যগ্রহণ সম্পর্কেও আলোচনা থাকবে।

হয়েছে

❑ মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক এই ঘোষিত সনদ বিশ্ব ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিলংয়ে ইন্সটিটিউট ফর হিউম্যান অ্যাকশন গত সাত বছর ধরে এ-কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এবারের ১০ ডিসেম্বর ছিল সাইকেল অভিযানে পদযাত্রা, এবং গ্রাম পরিক্রমা করা হয় সারাদিনব্যাপী।

❑ সজল গোষ্ঠীর উদ্যোগে এবং বিকাশকেন্দ্র আটেক্সার সহযোগিতায় গত ২১ ডিসেম্বর '৯৪ উত্তর চব্বিশ পরগনার দাদপুরে বন্যা মোকাবিলা হতে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সভার আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নানা সংস্থা ও ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ছিল বসে আঁকো, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বস্ত্র বিতরণ ও লিটিল থিয়েটারের নাটক 'অন্ধকারের বৌ'।

❑ ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সহায়তায় ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক-এর পরিকল্পনায় সারাদেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস ১৯৯৪-এর কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে গত ৪ ডিসেম্বর '৯৪ দুর্গাপুরে বাঁকুড়া কলেজে অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান জেলা কংগ্রেস। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দূষণরোধে, এক-কথায় পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে এবারের মূল বিষয় ছিল 'পরিবেশ জানো গড়ে তোলো'। বিভিন্ন স্কুলের প্রায় দুশ জন ছাত্র-ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

❑ বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায় অনুষ্ঠিত হলো চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়ার কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১৬টি বিদ্যালয় যোগদান করে গত ১৮ ডিসেম্বর '৯৪। এই প্রতিযোগিতার প্রশ্নপত্রের বিষয় ছিল কুসংস্কার, পরিবেশদূষণ, জনস্বাস্থ্য, রসায়ন, ক্রীড়া-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। কাঁচরাপাড়ার 'গণচেতনা' নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চায়ন নাটক 'মহাজনী' পরিবেশন করে।

❑ গত ১৮ ডিসেম্বর '৯৪ চন্দননগর 'বিবর্তন' বিজ্ঞান সংস্থার পক্ষ থেকে চন্দননগরে তিনটি পথসভার আয়োজন করা হয় (লক্ষ্মীগঞ্জবাজার, বড়বাজার মোড় এবং স্টেশন-এ)। বিষয়বস্তু — নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক দমন-পীড়ন নীতি।

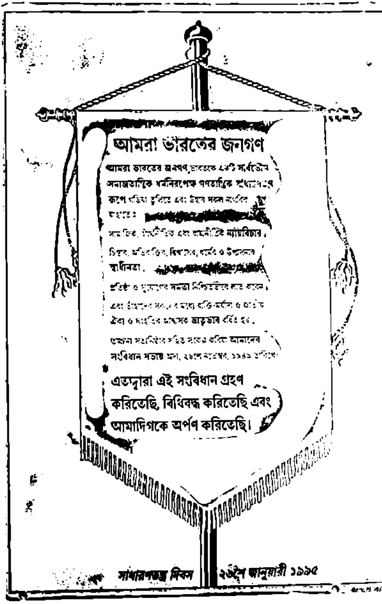
আমরা ভারতের জনগণ
এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ
করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং
আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।
সাধারণতন্ত্র দিবস
২৬শে জানুয়ারী ১৯৯৫

WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN 37275/80 Rs. 5.00

UTSA MANUSH VOL 16 NO 2 FEBRUARY 1995 পাঁচ টাকা

উৎস মানুষ প্রকাশিত রচনা সংকলন

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / ১ম খণ্ড [২৫·০০]

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / ২য় খণ্ড [৩০·০০]

বিজ্ঞানকে মুখোশ করে [২০·০০]

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে [৩০·০০]

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় [২১·০০]

প্রতিরোধ [৩২·০০]

ছেলেমিশের হাঙ্গা [২৫·০০]

শেকলভাঙা সংস্কৃতি [১৬·০০]

এটা কি ওটা কেন [১৫·০০]

স্বাস্থ্যের বৃত্ত [২০·০০]

যে গল্পের শেষ নেই [২৫·০০]

প্রমিথিউসের পথে [৮·০০]

বিবেকানন্দ অন্য চোখে [২৫·০০]

বিবেকানন্দ অন্য চোখে : একটি সমীক্ষা—আরো কিছু বিতর্ক [১৫·০০]

সাপ নিয়ে কিংবদন্তী [১৫·০০]

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ [২৫·০০]

চিঠিপত্রে যোগাযোগ : সম্পাদক উৎস মানুষ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

সরাসরি সাক্ষাতের জন্য : ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৯ (সোম–শুক্র : ১১–৬টা)

'উৎস মানুষ'-এর পক্ষে পবন কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ (ফোন : ২৪১ ৩৪৪০) থেকে মুদ্রিত।

ISSN 0971-5800
মার্চ ১৯৯৫

উৎস মানুষ

শিক্ষা-নামক পেষাই কল
এইড্‌স্‌ রোগী যাবে কোথায়
নানা মতে ঈশ্বর বিশ্বাস
সূর্যগ্রহণ কোথায় কখন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এমনটি কি ঘটতেই হবে !

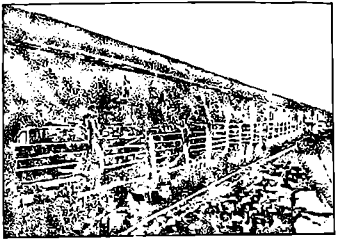

ব্যাপারটা কী দেখা যাক !

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

পূর্ব রেলে এ ধরনের ক্রিয়া-কলাপ মোকাবিলা করতে 'ইনস্ট্যান্ট অ্যাকশন গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, যাত্রীরা নিরাপত্তার প্রাথমিক শর্তগুলি মেনে চলবেন। কারণ, তাতে তাঁদের যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে।

আপনার কোন সহযাত্রী এই নিয়ম ভাঙছেন দেখলে প্রতিবাদ করুন। তাতে কাজ না হলে কর্তব্যরত রেল কর্মিদেরকে খবর দিন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাবধানতাই মঙ্গল কথা। নচেৎ, এরকম দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আর সমাজ আশঙ্কিত হতে থাকবে।

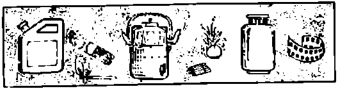

পূর্ব রেলওয়ে

নিরাপদে পৌঁছাতে আমাদের সাহায্য করুন।

ষোড়শ বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ মার্চ ১৯৯৬

সূচীপত্র

[illegible]

বাংলার নারী নিগ্রহ : সত্তর বছর আগে □ ৫৭

[illegible]

পোষ মানানোর শিক্ষা □ ৫৯

সীমারেখার সন্ধানে □ ৬৩

এবারের সূর্যগ্রহণ নির্ঘণ্ট □ ৬৫

এইডস্ রোগীর চিকিৎসা কই! □ ৬৬

প্রতিবেদন

এইডস্ নিয়ে হচ্ছেটা কী। □ ৭০

জনস্বাস্থ্য [illegible] : □ ৭১

[illegible]

[illegible] □ ৭৩

স্বাস্থ্য-বিষয়ক: কি করব, কোথায় যাব □ ৭৬

আপনার প্রশ্ন / আপনার মতামত □ ৭৮

চিঠিপত্র □ ৮১

[illegible] □ ৮২

[illegible] □ ৮৩

[illegible] □ ৮৩

উৎস মানুষ

ISSN 0971-5800

বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

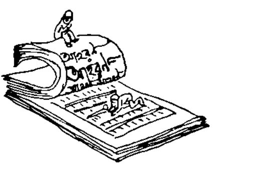

নারী নির্যাতন : সত্তর বছর আগে

পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী

[illegible] পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী 'বাংলার নারী-নিগ্রহ' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। [illegible] — স. ম.

৫ই ভাদ্র, সন ১৩৩১ সাল

(21st August, 1924)

নোয়াখালি—ফেনী

গত সপ্তাহে আমরা ফেনী নারী নিগ্রহের কথা লিখিয়াছি। সম্প্রতি তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা [illegible] হইতে তাহা প্রকাশ করিলাম। স্বাধীন ত্রিপুরা বিলোনিয়ার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] নামক জনৈক গৃহস্থ মুসলমানের ২০/২৫ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী পত্নী শ্রীমতী [illegible] খাতুনকে গত ৫ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই) সন্ধ্যার সময় তাহার অন্যমনস্কতা কালে, বাড়ীর ঘাটের সম্মুখে গরু নিতে আসা কালীন বিলোনিয়ার [illegible] গার্ড [illegible] ও আরও অনেকজন গুণ্ডা তাহাকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া আনে। স্ত্রীলোকটি বাড়ীতে দেড় বৎসর ও ৪ বৎসর বয়স্ক দুইটি ছেলে রাখিয়া আসে। ঐ তারিখ সমস্ত রাত্রি তাহারা স্ত্রীলোকটির উপর নানারূপে পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া ঐ স্ত্রীলোকটি বলে। পরদিন তাহারা তাহাকে ফেনীতে আনে এবং ফেনী থানার সে সময়ের ভারপ্রাপ্ত দারোগা [illegible] বাবু, অন্যান্য দায়িত্বশীল থানার কর্মচারী ও কনস্টেবলগণের সাহায্যে তাহাকে সরলা নাম্নী জনৈক বৃদ্ধা বেশ্যার বাড়ীতে রাখা হয়। তাহারাও তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাজারের কতিপয় ভদ্রলোক এই সংবাদ জানিতে পারিয়া স্থানীয় উকীল চৌং [illegible] সাহেবকে জানায় এবং ঐ স্ত্রীলোকটিকে পাষণ্ডদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার জাত মান রক্ষা করিতে অনুরোধ করে। [illegible] সাহেবও কর্তব্যানুরোধে স্থানীয় S. D. O. মহাশয়কে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করে। সাব ডিভিসনাল অফিসার বলেন, লোকের নিকট হইতে তাহার খবর আমি পাইয়াছি। যে পর্যন্ত কোনও মোকদ্দমা দায়ের না হয়, সে পর্যন্ত আমি কিছুই করিতে পারি না

অতঃপর আবেদ সাহেব থানার দারোগা হাফেজের রহমান মিঞাকে এক পত্র দেন। তিনি বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ছাড়া পুলিশ কিছুই করিতে পারিনা। শুনা যায় : এই পত্র দেওয়ার পর তিনি দুই দিনের ছুটী লইয়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া যান। ৩০শে জুলাই স্থানীয় মোক্তার আবদুল গণি মিঞা কতিপয় ভদ্রলোক সহ সরলার বাড়ী যান এবং স্ত্রীলোকটিকে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী আসিতে বলে এবং ইহাও তাহাকে জানায় যে, তাহার স্বামী আসিলে তাহাকে তাহার সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। স্ত্রীলোকটী যাইতে স্বীকৃত হইলে সরলা তাহাকে বারণ করে এবং মুন্সী আবদুল গণি মোক্তার সাহেব ও অন্যান্য ভদ্রলোকদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেয়। তাহার স্বামী সন্ধ্যার পর চাষী ও আত্মীয় স্বজনসহ পাহাড়ে ও জঙ্গলে তালাস করিতে থাকে। তারপর পরস্পর শুনিতে পায় যে, সে রাস্নী ও অন্যান্য গুন্ডাদের কর্তৃক অপহৃতা হইয়া ফেণী নীতা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ফেণী আসে এবং তাহার স্ত্রী যে সরলার বাড়ী আছে, তাহা জানিতে পারিয়া তখন সে তথাকার ফেরুসাসী আবদুল গণি মোক্তার সাহেবের শরণ লয়। তিনিও কাজমালি মোক্তার সাহেব চাঁদমিঞাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সরলার বাড়ী যান। তথায় যাইয়া সে বাড়ীতে প্রসন্নকুমার দারোগা ও আবদুল গণি কনস্টেবলকে দেখিতে পান। আবদুল গণি মোক্তার সাহেব, প্রসন্নবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, চাঁদমিঞার স্ত্রী কোথায় আছে, তাহাকে বাহির করিয়া দিন। ইহাতে প্রসন্নবাবু বলিলেন—তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, সে এই ঘরে আছে ; সে ইচ্ছা করিলেই যাইতে পারে। এই কথার পর চাঁদমিঞা তাহার স্ত্রীকে 'আক্কেল', 'আক্কেল' বলিয়া ডাকে। তাহার স্ত্রীও সে ডাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং তাহাদের সহিত যাইতে উদ্যত হয়। এমন সময় দারোগা প্রসন্নবাবুর ইঙ্গিতে আবদুল গণি কনস্টেবল তাহার এক হাত চাপিয়া ধরে। দারোগাবাবুও পরে আর এক হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে পুনরায় ঘরের মধ্যে লইয়া যায়। চাঁদমিঞা তাহার স্ত্রীর জন্য দাবী করে। ইহাতে দারোগাবাবু রুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়া এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদিগকে গালাগালি করিয়া তাড়াইয়া দেয়। চাঁদমিঞা দৌড়াইয়া S. D. O. কাছে যায় এবং সকল বৃত্তান্ত বলে। তিনি তাহাকে মোকদ্দমা করিতে বলেন। ইহা ভিন্ন তাহাকে তিনি আর অন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না ইহাও জানান। তাঁহার উপদেশানুযায়ী সে মোকদ্দমা করিবে বলিয়া মনস্থ করত যখন মোক্তারের সঙ্গে মোক্তার বারে পরামর্শ করিতেছে ; এমন সময় শুনিতে পায় যে, সরলা ও আবদুল গণি কনস্টেবল তাহার স্ত্রীকে কাছারীর কাছের রাস্তা দিয়া থানায় লইয়া যাইতেছে, ইহাতে সে দৌড়াইয়া তাহার স্ত্রীর নিকট যায় এবং সে কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে তাহার স্ত্রী বলে যে, সরলা ও আবদুল গণি তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য থানায় নাম লেখাইতে লইয়া যাইতেছে। তখন সে তাহার এক হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি সাহেবের কাছে নালিশ করিয়া দুষ্টদিগকে জব্দ করিব। তখন তাহার স্ত্রী তাহার সহিত যাইতে আরম্ভ করিলে আবদুল গণি কনস্টেবল তাহার আর এক হাত ধরে। তখন উভয়েই বিভিন্ন দিক হইতে স্ত্রীলোকটিকে টানাটানি করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া রাস্তায় (ঠিক কাছারীর সম্মুখে বেলা ১০টার সময়) বহুলোক জমা হয় এবং কনস্টেবলকে চাঁদমিঞার স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিতে বলে। চাঁদমিঞা ঐ সকল লোকের সাহায্যে তাহার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া যখন মোক্তার বারের প্রায় কাছাকাছি গিয়াছে, এমন সময় প্রসন্নবাবু দারোগা ১০।১২ জন কনস্টেবল সহ তথায় যাইয়া চাঁদমিঞাকে গ্রেফতার করিয়া তাহার স্ত্রীকে সহ তাহাকে থানায় আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই সংবাদ উকিল আবেদ মিঞার কাছে পৌঁছিলে তিনি দৌড়িয়া রাস্তায় আসেন এবং প্রধান উকিল কুলকিশোর বাবুকে হতভম্ব অবস্থায় রাস্তার উপর (তাহার বাসাও ঘটনাস্থল হইতে অতি নিকটে ; রাস্তার পার্শ্বে) দাঁড়াইতে দেখিয়া তাঁহাকে সহ থানায় যায়। তাঁহাদিগকে দেখিয়া চাঁদমিঞা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং শরীরের নানা স্থানে যে তাহাকে মারিয়াছে তাহা দেখায়। পরে চাঁদমিঞাকে থানা হইতে ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্ত্রীকে থানায় আটক রাখে। স্ত্রীলোকটীকে জল খাওয়ান হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ডাক্তারী পরীক্ষায় তাহাও নাকি প্রমাণ হইয়াছে। চাঁদমিঞা মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। S. D. O. নিজে মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া প্রসন্নবাবু ও আবদুল গণিকে ৩২৩ ও ৩৪১ ধারামতে চার্জ করিয়াছেন। রাস্নীর বিরুদ্ধেও সমন দিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, এই ঘটনাসম্পর্কে আরও দুই একজন দায়িত্বশীল রাজকর্মচারী (Responsible Officer) ও অন্যান্য গুন্ডাপ্রকৃতির লোক জড়িত আছেন। তাহারা আইনের চোখে ধূলি দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন।

ময়মনসিংহ

পূর্বধলা থানার অধীন বাদিকড় গ্রামের সুশীলা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক কয়েকজন দুর্বৃত্তকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিল। চারুমিহির প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুইদিনে ঐ মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া দুর্বৃত্তদের মহানুভবের আসামীরা খালাস পাইয়াছে।

চট্টগ্রাম

দৈনিক জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন, পটিয়ার অবিনাশ পাটোয়ার স্ত্রীকে বলপূর্বক অপহরণ করার অপরাধে দুদু মিঞা, নাজ্জান মিঞা, সাধু মিঞা ও চাঁদমিঞার নামী এক লোককে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

চট্টগ্রামের সাব ডিভিসনাল অফিসার মৌলবী মাহা আলী চৌধুরীর দুইটী দাসীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছে।

[২৩। ৮৭]

পোষ মানানোর শিক্ষা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

'গোপাল কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে বাড়িতে তাহা ভালো করিয়া পড়ে। প্রত্যহ পড়াশুনা দুই বেলা আগাগোড়া দেখে। …সকল বালকেরই গোপালের মতো হওয়া উচিত।'

'লেখাপড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে একদিনও মন দিয়া পড়ে না; এবং একদিনও ভালো পড়া বলিতে পারে না। …কোনও বালকেরই রাখালের মতো হওয়া উচিত নয়।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগে গোপাল-রাখাল দুজন আমাদের কাছে প্রবাদের মতো হয়ে যায়। পুস্তকটির শেষ দশটি পাঠে বিদ্যাসাগর শিশুদের কয়েকটি শিষ্টাচার শেখাতে চেয়েছিলেন। বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোপাল-রাখাল বা ভালো-খারাপ—এই একমাত্রিক টাইপের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়ে যায়।

'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগের প্রকাশকাল ১৮৫৫ খ্রি; তারও কয়েক বছর আগে ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগের লক্ষ্যও ছিল একই রকম। মদনমোহন লিখেছিলেন: 'অলস হইও না। খেলা করিও না। বেলা হইল। পড়িতে চল। …পিতামাতার কথা শুনিবে। মন দিয়া পড়িবে। বিদ্যার সমান ধন নাই।'

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মদনমোহন বা বিদ্যাসাগর যখন পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, তখন শিক্ষা বলতে বোঝাত কয়েকটি সুনীতি ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়া: বিশ্বাস করা হতো, এই নীতিগুলি ছাত্ররা জীবনে মেনে চলবে এবং এইভাবে ভবিষ্যতে তারা সুশীল-সুবোধ নাগরিক হয়ে উঠবে। সে-আমলের শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষককে মনে করা হতো সকল সদ্গুণের আধার: শিক্ষার ভেতর দিয়ে ছাত্রদের তিনি শিষ্টাচার শেখাবেন, সদুপদেশ দেবেন; ছাত্ররা সেই জ্ঞান আহরণ করে কৃতার্থ হবে। 'নীতিবোধ' নামে একটি বইও পাঠশালায় পড়ানো হতো। দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, গুরুমশাই বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' পড়াতে রাজি হলেন না; কারণ 'ওতে খালি শেয়াল, কুকুর, বাঘ ভাল্লুকের কথা। ঠাকুরদেবতাদের কথা পড়াতে হবে।' ('পল্লীচিত্র', পৃ. ৭) পশুপাখির কাহিনীকে পঠনীয় বিষয় মনে করা হতো না, কারণ তার গল্পের অংশটাকে ছাপিয়ে চেয়েও বড় হলো নীতিজ্ঞান। শিক্ষা সম্পর্কে সে-আমলের ধারণাটা ছিল এই রকমই।

আর দেড়শো বছর পরে অবস্থাটা নিশ্চয়ই বদলেছে। 'বর্ণ পরিচয়' থেকে 'কিশলয়'—পাঠ্যপুস্তকের বিবর্তনের পথেও আমরা অনেকটা এগিয়েছি। শিশুকেন্দ্রিক আর পাঠক্রম একটি আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মানে বেদীর ওপর থেকে জ্ঞানের বাণী বিতরণ, পাঠ্য বই মানে নীতি আর কর্তব্যের উপদেশমালা—এই ধারণার প্রভাবও আজও বেশ প্রবল। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক বা পিতামাতার প্রতি কর্তব্য—জাতীয় বিষয়ের ওপর রচনা লেখাতে পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আজও বড় খুশি হন। আমার এমন স্কুলে মাস্টারি করার সৌভাগ্য-ও হয়েছে, যেখানে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষার হল-এ ঢুকে গম্ভীরস্বরে বলতেন, ছেলেরা, ঠাকুরের নাম নিয়ে লিখতে শুরু করো।

জ্ঞান আর উপদেশ

আশির দশকের গোড়ার দিকে প্রাথমিক পাঠক্রম থেকে 'বর্ণ পরিচয়' তুলে দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেশ একটা জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা সকলেই খুব বিদ্যাসাগরভক্ত ছিলেন, বা যৌক্তিক পুনর্বিচার করে মত দিয়েছিলেন, এমন নয়। প্রায় দেড়শো বছর ধরে চলে আসা 'বর্ণ পরিচয়' পুস্তকটিকে ঘিরে আবেগ একটা ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে; সেই ঐতিহ্যবিষয়ে স্পর্শকাতরতাই ছিল আন্দোলনের প্রধান শক্তি। ১৯৮৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে একটা সমীক্ষা করতে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, 'বর্ণ পরিচয়' ওঁদের ভালো লাগে, কারণ 'ওই বইটাতে অনেক বেশ

আমাদের পাঠ্য পুস্তকের ঐতিহ্য হলো, জ্ঞান আর উপদেশের কথাগুলোকে গোটা গোটা করে বলে দেওয়া; আর এই করতে গিয়ে জ্ঞান-সঞ্চারের নামে আমরা শিশুদের মুখের ভাষা কেড়ে নিই। একটি শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জেনে যায়, এখন থেকে তাকে স্কুলের ভাষায় কথা বলতে হবে। জ্ঞানের যে-মন্ড আমরা তাদের মুখে ঠেসে দিই, কিছু বলতে বললে সেই অপাচ্য মন্ডই তারা আমাদের সামনে উগরে দেয়।

উপদেশের কথা আছে।'

আজ নন ফরমাল শিক্ষার একটা কাজ নিয়ে ঘুরতে গিয়ে দেখছি, কেন্দ্রকারি সাক্ষরতা কেন্দ্র 'বর্ণ পরিচয়' বইটাকেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বস্তি-অঞ্চলের শিশুদের ওপর। তাদের শিখতে শেখানো হচ্ছে, এইসব শব্দের বানান : অর্জন প্রভৃতি ঐ ছিল বিভব অনুজোজ্জ্বল অতিনিকেল। শিশুদের দৌখরে প্রশ্ন করেছি, এইসব শব্দের ব্যবহার কি ওদের জীবনে আছে? এমনকি আমাদের রোজকার জীবনেও আছে? শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কোনোদিন ভেবে দেখেন নি। জানতে চেয়েছি, 'অর্জন', 'ঐক্য', 'অনুজোজ্জ্বল'—এইসব শব্দের অর্থ কি তাঁরা নিজেরা জানেন?' তাঁরা লজ্জায় চুপ করে থেকেছেন।

এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কোনো কটাক্ষ করার অভিপ্রায় আমাদের নেই। কিন্তু এই আজব কাণ্ডটা যে এতদিন ধরে চলে আসছে, এটাই দেখিয়ে দেয়—শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা এখনও কোন্ স্তরে আছে। যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, একটা পাঠ্যবইয়ের উপযোগিতা যে দেড়শো বছর ধরে অটুট থাকতে পারে না, এই অতি সাধারণ কথাটাও আমরা ভেবে দেখি নি। বরং শিক্ষাক্ষেত্রে সারাদিন ছেলেমেয়েদের আমরা নীতিশিক্ষার পড়ানো হচ্ছে : আলস্য করিও না। মিথ্যা মহাপাপ।—এই নিষ্ঠুর কলুষ শুধু প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়। আজ তিনি জীবিত থাকলে শিক্ষার নামে মানুষের এই লাঞ্ছনা নিশ্চয়ই সহ্য করতেন না। 'বর্ণ পরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে ভুবনের গল্প আমরা ভুলি নি। শিশুপাঠে একটি নীতিকথাও যে প্রচলিত মূল্যবোধকে কতখানি আঘাত করতে পারে, বিদ্যাসাগরই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু ভুবনের গল্প রুটিনের মধ্যে পড়ে না। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের রুটিন হলো, জ্ঞান আর উপদেশের কথাগুলোকে গোটা গোটা করে বলে দেওয়া; আর এই করতে গিয়ে জ্ঞান সঞ্চারের নামে আমরা শিশুদের মুখের ভাষা কেড়ে নিই। একটি শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জেনে যায়, এখন থেকে তাকে স্কুলের ভাষায় কথা বলতে হবে। জ্ঞানের বোঝাও আমরা তাদের মুখে ঠেসে দিই, কিন্তু বলতে বললে সেই বলাটা সত্ত্বেও তারা আমাদের সামনে উগরে দেয়। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে একবার ঠিক করেছিলাম, ছাত্রদের দিয়ে বলাব—স্কুল তাদের কেমন লাগে, শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা কেমন ব্যবহার পায়। অনেক অনুরোধের পর একটি ছেলে বলতে রাজি হয়, আর মঞ্চে উঠে আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলে যায় : শিক্ষকেরা আমাদের গুরুজন। তাঁদের অনেক উপকার আছে। কত কাজ আছে। তবু তাঁরা কষ্ট করে আমাদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরে ভেবে দেখেছি, ছাত্ররা যে বলতে রাজি হয় নি, তার কারণ তারা জানত, যা তাদের মনে হয়, তা এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

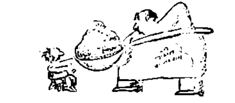

সৌজন্য : 'একলব্য', মধ্যপ্রদেশ

যে-ছেলেটি শেষ পর্যন্ত বলতে রাজি হলো, সে আমাদেরই শিখিয়ে-দেওয়া কথা আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করল।

অথচ বিদ্যালয়, শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষকদের আচরণ নিয়ে কত অভিযোগই না তাদের মনে জমা হয়ে থাকে। বিদ্যালয় নামের প্রতিষ্ঠানটি যে দুর্নীতিমুক্ত নয়, শিক্ষকরা যে প্রয়োজনে প্রতিশোধকামী হতে পারেন, অনেক শিক্ষকই যে ক্লাসে ভালো করে না পড়িয়ে প্রাইভেট টিউশন করে 'এক্সট্রা ইনকাম' করেন—এ-সব ছাত্ররা ভালোই বোঝে। আর এই ছাত্রদেরই কি-না আমরা শেখাতে যাই—বিদ্যালয় একটি পবিত্র স্থান। শিক্ষকরা গুরুজন।

খুব আন্তরিক হয়ে একবার আমার এক নিতান্ত অমনোযোগী ছাত্রকে বলতে গিয়েছিলাম : এখন তো পড়তে চাইছ না। বড় হও, তখন দেখবে, কাজকর্ম পাওয়া কত কঠিন। ছেলেটি মৃদু হেসে বলেছিল, সে আমরা জানি, স্যার। তখন তো দুঃখ পেতে হবেই, এখন একটু মজা করে নিই।...আর-একবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার হলে লক্ষ করেছিলাম, একটি ছেলে সমানে পাশের ছেলের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। কয়েকবার বারণ করেও কাজ না হওয়ায় সোজা গিয়ে তাকে বলি, আর-একবার যে কথা বললে খাতা নিয়ে নেব। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নিন। দু-বার তো কাঁদিয়েছেন; আর একবার কাঁদাবেন। কী আছে!

ঘটনাটা প্রায় আট বছর আগের। আমার ছাত্রের সেই দুঃসাহসিক সেদিনের ঔদ্ধত্যকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমরাই যে তাকে কেন কাঁদিয়েছি—এই নির্মম কঠিন সত্যটি সে অবলীলায় আমাকে শুনিয়ে দিতে পেরেছিল।

প্রকৃত অর্থে সমাজ-রাজনীতি-চেতনা আজ নিঃসন্দেহে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে-মেয়ে আজ সমাজের কর্মব্যস্ততা যে-ভাবে বোঝে, তা কিন্তু আমাদের চমকে দিতে পারে। অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইতে একটি পাঠ আছে : সুনাগরিকের কর্তব্য। নাগরিকের কী কী করা উচিত তার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে বেশ সাদামাটা সুরে; এমনও বলা হয়েছে যে, নাগরিকরা যদি ভোটে একটা অযোগ্য লোককে নির্বাচিত করে, তাহলে দোষ নাগরিকদেরই।...একবার এমন একটি দিনে বিষয়টা পড়াচ্ছি, যেদিন সকাল থেকে চলছে ভোটের গোলমাল। সত্তর জনের ক্লাসে আমার ছাত্ররা সাতাশ জন, আমার অবস্থাও তাই। তাই পড়াতে পড়াতে বইটা হঠাৎ উল্টে দিয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন করি—এই

লেসনটা কি তোমাদের একঘেয়ে, অসম্পূর্ণ মনে হয় না? ছাত্রদের তখন প্রতিক্রিয়া হয় যে, না—এ-রকম কিছু তাদের মনে হয় নি। এরপর আমি যখন বেশ উত্তেজিত হয়েই বলি, অধিকার বাদ দিয়ে কি কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যায়? ধরো, এই বিদ্যুৎ পাওয়াটা তো আমাদের অধিকার; এটাই যদি না মানা হয়, কর্তব্যের কথা শুনিয়ে লাভ কি!—ছাত্ররা যেন কিছুটা একটু ধরতে পারে; আর তারপর আমার 'প্ররোচনায়' তারা একে একে বলে যায় আমাদের যাবতীয় না-পাওয়ার কথা: বেকারি, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, হাসপাতালের অব্যবস্থা—এমন কোনো সামাজিক সমস্যা নেই যা সেদিন আমার ছাত্ররা উল্লেখ করে নি। তার মানে এই চেতনা ওদের ভেতর ছিলই; আমরাই তাদের প্রকাশ করার সুযোগ দিই নি।

শিক্ষক হিসাবে ট্রেনিং নিতে গিয়ে কতবারই না শুনেছি, শিক্ষা মানে হলো ছাত্র-ছাত্রীর ভেতর যে-ক্ষমতা সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে টেনে বের করে আনা—ব্রিং আউট। আর অভিজ্ঞতায় দেখলাম, বিদ্যালয়ে আমরা সেই ক্ষমতাটাকে দমিত করে রাখার কাজটাই করে থাকি। কথা ছিল, আমরা একটি শিশুর ব্যক্তিস্ফূর্তির উদ্দীপক হব; আর আমরা কি-না তার মনের ভাষা কেড়ে নেবার নিপীড়ক হয়ে উঠলাম। কী করে ভুলি, আমাদের দেশের শাস্ত্রেই বাক্-কে বলা হয়েছে 'অগ্নি'। একটি শিশুকে ডেকে আমরা বলতে পারতাম, বলো, তোমার নিজের কথা বলো। তুমি যখন কথা-লিখবে, মনে রেখো, শব্দগুলো তোমার হয়ে যাচ্ছে, এই শব্দের ভুবনকে তুমি মুঠোর ভেতর পেয়ে যাচ্ছ…। কিন্তু আমরা তা বলি না; শিশুদের আমরা শেখাই, তৈরি-করা উত্তর লিখতে। নচিকেতার জিজ্ঞাসা নয়, আমরা অনুসরণীয় মনে করেছি, তার পিতার যজ্ঞকেই।

কী পড়াই, কেন পড়াই

আজ থেকে দু-হাজার বছরেরও আগে প্লেটো দুঃখ করে বলেছিলেন, জুতো সেলাই শিখতে হলেও একটা শিক্ষা লাগে—রাজনীতি করতে হলে সেটাও লাগে না। শিক্ষকতার কাজটাও প্রায় সেই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। শিক্ষকের হাতে একখানি পাঠ্যসূচি ধরিয়ে দেওয়া হলো; এবার তাঁর একমাত্র কাজ ক্লাসে গিয়ে সেটি আওড়ে যাওয়া। কী পড়াচ্ছি, কাকে পড়াচ্ছি, যা পড়াচ্ছি তার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি-না, ভাবার সুযোগ নেই। নবম শ্রেণীর ইংরেজি বইতে হামফ্রে ডেভি আর মাইকেল ফ্যারাডেকে নিয়ে একটি লেখার এক জায়গায় আছে, ফ্যারাডে ডেভিকে বলছেন, বই বাঁধানোর ব্যবসা ছেড়ে তিনি বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চান; কারণ তিনি মনে করেন, ব্যবসা মানুষের চরিত্র নষ্ট করে দেয়। লেখাটা আমার ভালো লাগে। বেশ উৎসাহ নিয়ে পড়িয়েছি। গত বছর হঠাৎ মনে হয়, ক্লাসের মধ্যে এমন ছেলে তো থাকতেই পারে, যার বাবা ব্যবসাদার। ব্যবসা নিয়ে এই কটু মন্তব্যকে সে তাহলে কীভাবে দেখবে? পড়া থামিয়ে প্রশ্নটা তুলি। দুটি ছেলে জানায়, তাদের ব্যবসা আছে; অন্যরা কেউই মনে করে না যে, ব্যবসাদাররা সব সময়েই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।

বেশ বিব্রত হয়েছিলাম সেদিন। মনে হয়েছিল, প্রতি বছর এই লেখাটা পড়াতে গিয়ে আমিও তো ব্যবসা নিয়ে কত বিরূপ মন্তব্য করেছি। কোনো কোনো ছাত্র তা নিশ্চয়ই পছন্দ করে নি; কিন্তু তারা প্রতিবাদ করে নি। স্কুল তাদের শিখিয়েছে, বইতে যা লেখা থাকে তা নির্ভুল, আর শিক্ষকের মুখের বাক্য অলঙ্ঘনীয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর কোনো একটি বাংলা সংকলনে সত্যজিতের 'পাখপাখালি' থেকে কিছুটা অংশ এক সময় ছিল। একদিন শুনতে পাই, শিক্ষক সোৎসাহে সেই অংশটি পড়াচ্ছেন: বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।… আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, এই শিক্ষক কি জানেন, সত্যজিৎ এই কথাগুলি লিখেছিলেন ওরাওঁ আদিবাসীদের দেখে, আর তাঁর ক্লাসেই একটি ওরাওঁ ছাত্র আছে? সেই ছাত্রটি কি বুঝতে পারবে যে, 'বন্য' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে তার গোষ্ঠীর সম্পর্কে? যদি সে বুঝতে পেরে থাকে, শিক্ষা তো তার কাছে লাঞ্ছনা হয়ে যাচ্ছে।… পড়ানোর সময় এত কিছু আমরা ভেবে দেখি না; আর তার জন্যে কোনো সমস্যাও হয় না; কারণ ছাত্রেরা কখনই প্রতিবাদ করবে না। মুদ্রিত শব্দের এক প্রবল প্রতাপ আছে। বিদ্যালয় নামের প্রতিষ্ঠানটির ভেতরেই আছে আধিপত্যের বীজ। এই বীজ দিয়ে আমরা নিষিক্ত করে রাখি শিশুদের। এই গুপ্তবীজী পাঠকেই ইভান ইলিচ বলেছেন, 'হিডন কারিকুলাম'।

অবিধেয় অবিনয়

ছাত্র-ছাত্রীরা কী চায় আমাদের কাছ থেকে? সোভিয়েত শিক্ষাবিদ আন্তন মাকারেঙ্কোর একটা মত ছিল, শিক্ষক ছাত্রকে দু-একটা চড়চাপড় মারলে সেটা দোষের নয়, কারণ সেটা শিক্ষকের স্বাভাবিক মানবিক আবেগেরই প্রকাশ। বিচলিত শিক্ষক শাসন করলে ছাত্র এটুকু বুঝতে পারে, শিক্ষক তার প্রতি উদাসীন নন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মাকারেঙ্কো কাজ করেছিলেন যাদের বলে 'পাজি' ছেলেদের নিয়ে। তাঁর অভিজ্ঞতার তাই বিশেষ গুরুত্ব আছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সাধারণভাবে শিক্ষকের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা ছাত্ররা বোধ করে, তার তুলনা সমাজের অন্য ক্ষেত্রে বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু ছাত্ররা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না শিক্ষকের অবহেলা, ঔদাসীন্য, অবিনয়।

শিক্ষক জীবনের শুরুতে আমাকে এমন এক ক্লাসের ভার নিতে হয়েছিল, যেখানে ছাত্রেরা বেশির ভাগই দু-বছর ফেল-করা। স্কুল ধরে নিয়েছে, তারা এ-বছরও ফেল করবে এবং তখন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ছাত্ররাও তা জানে, এটাকে তারা তাদের 'নিয়তি' বলেই ধরে নিয়েছে। আরও জানতে পারি, তাদের প্রধান ভয় ইংরেজি আর অঙ্ক নিয়ে। আমার বিষয় ইংরেজি। বার্ষিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমি তাদের বলি, খুব সহজ আর ছোটো করে ইংরেজি কিছু উত্তর আমি তাদের শিখিয়ে দেব। তারা যদি কোনোক্রমে সেগুলো মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসতে পারে, আমি তাদের ইংরেজিতে পাশ করিয়ে দেব।

আমার এই প্রস্তাবটি ছাত্রদের পছন্দ হয় এবং কয়েকদিন বেশ ভালো কাজ হয়। তারপর একদিন পড়াতে গিয়ে আমি একটু ভেবে নিচ্ছি, হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমি বিরত, কিন্তু তখনও কিছু বলি নি; হঠাৎ একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোরা কী রে! এই স্যারটা আমাদের জন্যে এত করছে, আর তোরা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছিস। ……ছেলেটি যে-ভাষায় কথা বলেছিল, তা শুধু শোভন বলা যায় না। কিন্তু অন্যদিকে তার এই প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে শিক্ষকের প্রতি তার কৃতজ্ঞতাও সে প্রকাশ করেছিল। দুঃখের বিষয়, সেই ক্লাসের বেশিরভাগ ছাত্রই পাশ করতে পারল না এবং স্কুল থেকে বিতাড়িত হলো। কয়েকমাস পরে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা। তারা ইতিমধ্যে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছে। কেউ চায়ের দোকানে ঢুকেছে, কেউ বাজারে আনাজ নিয়ে বসছে। দেখলাম, কোনো রাগ বা দুঃখ তাদের নেই। আমিই বরং বললাম, তাদের যে স্কুল ছেড়ে দিতে হলো, এর জন্যে আমি দুঃখিত। শুনে তারা হেসে বলল, আমাদের কিছু হবেটবে না স্যার। আপনি আর কী করবেন। তারপর একজন আমার হাত ধরে তাদের চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

শিক্ষকের সম্মান থেকে শাসন, এমনকি প্রহার করলেও ছাত্রা তা মেনে নেয়; প্রতিক্রিয়া হয়, যখন শিক্ষকের ভূমিকাটা আর শিক্ষকের মতো থাকে না। আর একটি ছেলের কথা বলি। বেশ দুষ্টুমিতে ওস্তাদ ছেলে, সকলেই অতিষ্ঠ তাকে নিয়ে। একদিন কোনো এক দরকারে সে শিক্ষকদের ঘরে ঢুকেছে, এমন সময় এক প্রবীণ শিক্ষক তাকে ডাকলেন; আর সে আসামাত্রই 'থার্ড পিরিয়ডে কী করেছিলি।' বলেই প্রহার করে মারতে শুরু করে দিলেন। শুনতে পাই, ছেলেটি দু-হাতে মাথা ঢেকে মার সামলাচ্ছে আর বলছে — এখন মারছেন না কেন? ক্লাসে মারলেন না কেন? — তারপর সবাইকে হতবাক করে দিয়ে সেই 'নটোরিয়াস' ছেলেটি হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। ছেলেটি কেঁদেছিল, কারণ একজন শিক্ষকের সামনে এইভাবে লাঞ্ছিত হয়ে সে অপমানিত বোধ করেছিল। ঘটনাটা ক্লাসের ভেতর ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া এ-রকম হতো না। সে অপমানিত হয়েছিল, কারণ সেই মুহূর্তে ছেলেটির চোখে সেই মুহূর্তে তার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইই 'গুন্ডা' হয়ে গিয়েছিলেন।

গত বছর (১৯৯৪) ২৫ মার্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার গণিত প্রশ্ন কঠিন হওয়ার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা যখন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ জানাতে চায়, পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চালায়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পরের দিন কড়াভাবে পথ দেখিয়েছেন; কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে এই রাষ্ট্র, তার সর্বক্ষমতাশালী, গুন্ডা হয়ে গিয়েছিল। তারা বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, শত শত ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অপরাধটা অপরাধ নয়, অপরাধ হলো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যাওয়াটা। রাষ্ট্রের চরিত্র খুব নিষ্ঠুরভাবে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল সেদিন তাদের চোখের সামনে।

পরের দিন স্কুলে যাওয়ার পথে সে-বছরের পরীক্ষার্থী আমার কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়। তারা তখনও উত্তেজিত; একজন চিৎকার করে বলল, বলুন স্যার, আমরা না-হয় খারাপ ছেলে; কিন্তু ভালো ভালো ছেলেমেয়েরাও তো বলেছে, কোশ্চেন শক্ত হয়েছে; তাহলে কেন পুলিশ লাঠি চালাল। …এর কোনো জবাব আমি দিতে পারি নি; শুধু মনে হয়েছিল, 'খারাপ' ছেলেদের ওপর লাঠি চালানো যায়, রাষ্ট্রের এই যুক্তি কী চমৎকারভাবে ঢুকে গেছে ছেলেদের মনের মধ্যে; এই যুক্তি অনুসারেই তো লোকে মেনে নেয় চোর-ডাকাত বা 'সন্ত্রাসবাদীদের' পিটিয়ে মেরে ফেলার রাষ্ট্রীয় অধিকার। কেমন করে সম্ভব হলো এটা? পড়াতে পড়াতে সুযোগ পেলেই প্রশ্ন করেছি, বলো তো আমাদের দেশটা এত গরিব কেন? প্রতিবারই উত্তর পেয়েছি, আমাদের জনসংখ্যা খুব বেশি। কোথা থেকে পেল তারা এই জ্ঞান? তাদের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, রেডিও-টিভি-খবরের কাগজ আর নেতাদের ভাষণ থেকে। স্কুলে শিক্ষার ভেতর দিয়ে দেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা আমরা তাদের দিতে পারি নি। আর তাই প্রচারযন্ত্রের প্রচারকেই তারা নিজেদের উপলব্ধি বলে ধরে নিতে শিখেছে।

স্বদেশী যুগের বাঙলায় স্কুল ব্রিটিশ রাজের নিপীড়নের কারণ হয়েছিল। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে (১৯১৮) স্কুল নিয়ে অনেক উদ্বেগের কথা আছে। পুলিশের খাতায় বার বারই স্কুলের নাম উঠেছে। একটা বিশেষ সময়ে স্কুলের ভূমিকা এই রকম হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু সাধারণভাবে স্কুল রাষ্ট্রের এজেন্ট হয়ে কাজ করে। যুব-সমাজের ক্রোধ তাই বারবারই নিক্ষিপ্ত হয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ওপর, যেমন হয়েছিল আমাদের এবং আরও কয়েকটি দেশে, ষাট-সত্তরের দশকে। তাদের আক্রমণে অন্যায় অতিচার ছিল, কিন্তু তাদের উপলব্ধিতে কোনো ভুল ছিল না। জেনে বা না জেনে রাষ্ট্রের যুক্তিই আমরা শিক্ষকরা প্রচার করে থাকি। শিক্ষক-জীবনে এই উপলব্ধি আমার বারবার হয়েছে। নাগরিকের কর্তব্য বোঝাতে গিয়ে আমি যখন বলছি — আমাদের উচিত আইন মেনে চলা, তখন আমি এই কথাটা গোপন রেখে যাচ্ছি যে, সবচেয়ে বেশি আইন ভাঙে রাষ্ট্র নিজেই।

এই লেখায় বারবার উত্তম পুরুষ ব্যবহার করতে হলো বলে লেখক দুঃখিত লজ্জিত। কৈফিয়ৎ এইটুকু যে, শিক্ষা নিয়ে কোন তত্ত্বকথা নয়, পনেরো বছরের শিক্ষক জীবনে 'বিদ্যালয়' নামের প্রতিষ্ঠানটিকে আমি যেভাবে দেখেছি-জেনেছি, আমার সেই উপলব্ধির কথাই আমি বলতে চেয়েছি এই রচনায়। যে-সব অনাচার আর কষ্টে দেয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের থেকে আমি নিজেকে মুক্ত এই দাবি করতে পারি না। আমার কিশোর দিন ছাত্রদের কাছে আমি এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম।

ভ্রম সংশোধন।

'উৎস মানুষ' জানুয়ারি '৯৫ সংখ্যায় 'পাশ-ফেল' রচনায় প্রসঙ্গক্রমে (পৃ. ৭) একাদশ শ্রেণির পাঠ্য একটি ইংরেজি নাটক এখন আর পাঠক্রমে নেই বলা হয়েছে; তথ্যটি ঠিক নয়। নাটকটি এখনও পড়ানো হয়।

সীমারেখার সন্ধানে

তৃপ্তি চক্রবর্তী

সমস্যাটা আমার এক বন্ধুর। কিন্তু হয়ত আপনাদের কারো কারো এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে বা হবে। তাই প্রথমে সমস্যাটার কথা বলা যাক। ধরে নেওয়া যাক আমার বন্ধুটির নাম অতনু রায়। পেশায় সরকারি কর্মচারী, মাঝবয়েসী। একেবারে আপনার আশেপাশের পরিচিত সাধারণ দশজন নাগরিকের একজন আমাদের অতনু।

তা অতনু এক প্রতিবেশী দম্পতির উপনয়নের নেমন্তন্ন পেয়েছে। সপরিবারে যাওয়া চাই। প্রতিবেশী ভদ্রলোক বারবার বলে এসেছেন তাঁর একমাত্র পুত্রের উপনয়নে উপস্থিত থাকতে। অতনুর সমস্যার শুরু এখানেই; কিন্তু শেষ নয়। অতনু সাধারণভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি মানে না, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, নিজের সাধ্যমতো প্রয়োগ করে চলতে চায়, অন্তত চেষ্টা করে, যদিও তা নিয়ে কর্নিকোরী চিৎকারে উৎসাহী নয়। আর উপনয়নের মতো আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর (কারণ কেবল ব্রাহ্মণ বা কখনও কখনও বৈদ্যরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে পারে) এমন অনুষ্ঠানের ঘোরতর বিরোধী এবং তা অতনুর নিতান্তই অপছন্দ। তাই ঐ অনুষ্ঠানে এতটুকু যেতে ইচ্ছে করছে না। ওর স্ত্রী সুস্মিতা মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝলেও, সুস্মিতার তোলা কয়েকটা প্রশ্ন অতনুকে সাংঘাতিক সংকটে ফেলে দিয়েছে।

আসলে প্রতিবেশী হিসেবে ভদ্রলোক খুব ভালো। যদিও তার দেন-দেখে এবং গুরুদেবের প্রসাদ ভক্তির কথা অতনুর অজানা নয়, তবু অতনুর সঙ্গে ভদ্রলোকের সুসম্পর্কটাও অস্বীকার করা যায় না। এই তো, অতনুর মা যখন গতবছর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ভদ্রলোক খুব ছোটাছুটি করেছেন। তার বাড়ির ফোন অতনু নির্দ্বিধায় ব্যবহার করছে। উনি হাসপাতালে দু-রাত্তির জেগেছেন, অতনুর খালি বাড়ি পাহারা দিয়েছেন। সোজা কথায় আমরা যারা অতনুর বন্ধু বলে দাবি করি তারা কোনো দুর্যোগের সময়ে যতটা সাহায্য ওকে করতে পারি ভদ্রলোক তার চেয়ে কোনো অংশে কম করেন না। তবে হ্যাঁ, অতনুর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের কারণ যে 'ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলের ম্যাচিং', সেটা অবশ্য ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর হওয়ার কথা নয়।

সুস্মিতার প্রশ্ন ছিল এটাই। ওর মতে, দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রয়োজনে কিংবা যে-কোনো সংকটে আমাদের পাশে বন্ধু মানুষ বন্ধু হয়ে এসে দাঁড়ান। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে সামাজিক পরিকাঠামোগত সুবিধার জন্য মানুষ যেভাবে নিজে নিজেই বাঁচতে পারে, আমাদের এখানে তা সম্ভব নয়। সর্বদাই আমাদের নির্ভর করতে হয় লোকজনের ওপর, সমস্ত পরিষেবা এখানে যে পাওয়া যায় না, অথবা তা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে। অতএব মানুষই ভরসা, আর এই সময় কিন্তু যার সাহায্য নেওয়া উচিত কারটা নয় তা বিচার করা যায় না, করা সম্ভব নয়। তাই পাড়ার অতিপরিচিত মুখেদের ক্রেকর্মচারীর কাছে গিয়েও তেমন প্রয়োজনে আমাদের দাঁড়াতে হয় এবং পাড়ার লোক হওয়ার সুবাদে কিছু সুবিধাও পেয়ে থাকি। ভদ্রলোক অবশ্য সে-রকমও নন। তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে ভদ্রলোকের বাড়ির উপনয়নের অনুষ্ঠানে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটা চট করে নিয়ে নেওয়া যায় কি? সুস্মিতা সঙ্গে সঙ্গে অতনুর মামা বন্ধুদের উদাহরণ দিয়ে বলেছিল যে সেই বন্ধুরা অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের বাড়ির এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিহার করতে পারে কি? করলে, তা কী ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? কিংবা আমরা কি সামাজিকভাবে কেবল সমমনস্ক, চিন্তাশীল মানুষজনের সঙ্গেই মিশি বা তাদের কাছ থেকেই সাহায্য নিই?

সমস্যাটা আসলে এখানেই। খুব একবগ্গা মানসিকতা নিয়ে যে সমীকরণটা সহজেই দাঁড় করিয়ে ফেলা যায়, যে-সমীকরণ সূত্রে সহজেই ভদ্রলোক বা তার পুত্রের উপনয়নের অনুষ্ঠানকে বয়কট করে দেয়, একটু থমকে ভাবলে, বা দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করলে সমীকরণটা খুব সহজে উঠে আসে না। এটা একটা উদাহরণ মাত্র। এরকম ঘটনা বহুক্ষেত্রেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। যারা বিজ্ঞানকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে রাজি নন তাদের সামনে এগুলো কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। অতনুকে

শাঁখা, পলা, লোহাশোভিত দুটি হাতের একটিতে যদি টেস্টটিউব আর একটিতে যদি বিকার ধরা থাকে আপনার ছোটোখাটো ধাক্কা লাগে কি? কিংবা ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকা কোনো ছাত্রী ব্রিটেনের মেডিক্যাল ক্লাসের ফটোগ্রাফে ধরা দিলে আপনার কি কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষিত হয়?

সেই ভেলাইতে ফেলা যায় না, তাই ওর একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং ওর সিদ্ধান্ত কী হবে তা না জেনেও ওর এই দ্বন্দ্বের ব্যাপারটিকে আমরা বুঝতে পারছি, আর তাই সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছে আরও কিছু প্রশ্ন ; হয়ত বা কিছুটা অগোছালোভাবে।

একদিকে ঐতিহ্য, পরম্পরা বা রীতিনীতি, অন্যদিকে সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব বা অর্থহীন প্রথা (কিংবা কুপ্রথা)-র প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষজনের মধ্যে সীমারেখা টানার কাজটা ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে, যদিও তা নিশ্চয়ই সকলের চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে নি। শাঁখা, পলা, লোহাশোভিত দুটি হাতের একটিতে যদি ক্রেস্টোটাইম আর একটিতে যদি ঘড়ির ব্যাণ্ড থাকে আপনার ব্যাপারটা খাপছাড়া লাগে কি ? কিংবা ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকা কোনো ছাত্রী বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ক্লাসের ফটোগ্রাফে ধরা দিলে আপনার কি কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষিত হয় ? অথবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের নামের আগে স্বামী বা পাদার শব্দ কি আপনার চক্ষুশূলের কারণ হয়ে ওঠে ? যদি হয়, তাহলে সম্ভবত ঐ চিন্তা আপনাকে ছুঁয়ে গিয়ে থাকবে।

আর তখনই আপনার কাছে প্রশ্নের আকারে পৌঁছে যাবে ঐতিহ্য আর রীতিনীতির কথা। সত্যিই তো, বিজয়ার পরে প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এলে প্রণাম না করলে কেমন লাগে না, যদিও জানাই আছে বিজয়ার পরে এই একদিনই সেই প্রতিবেশী নিয়মমাফিক বাড়িতে পা রাখেন, যার সঙ্গে রাস্তাঘাটে কুশলবার্তা দু-চারটে কথা সর্বদাই হয়। আমরাও যাই প্রায় সকলেই। অথবা একই শহরের অন্য পাড়াতে থাকার যে ছোটোবোনটি থাকে, যার সঙ্গে সবসময়ই যোগাযোগ হয়েছে, সে যখন ভাইফোঁটার দিন নেমন্তন্নটা করে তখন বেশ একটু বেশি ভালো লাগে। কী বলা যাবে একে ? একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নাকি অন্য কিছু ?

আর তাই নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, বেদের অসাম্প্রদায়িকতার কথা, কেউবা হাতেখড়ি দেওয়ার পেছনকার ঐতিহ্যের কাহিনী শোনান, কেউ বা মনে করিয়ে দেন পিতৃশ্রাদ্ধ বছর বছর করার, কেউবা বলেন পিণ্ডদানের তাৎপর্য। অনেক শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং যথেষ্ট যুক্তিবাদী মানুষ ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পর্কিত আমাদের ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাদের মতে ভ্রূণ বা বিয়ের মন্ত্রাদি কিংবা তপস্কণ্ঠার অজ্ঞাই আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা রীতিনীতি এবং সংস্কৃতির অঙ্গ - মোটেই কোনো কুসংস্কার বা নিছক সংস্কার না। আবার কয়েক পাদ্রী, পুরোহিত বা ইমামেরা ধর্মের প্রতিভূ। তাদের অনুগামীরা ধার্মিক ও ধর্মভীরু। কেউ কেউ অবশ্য এদেরই ধর্মীয় মৌলবাদী বলতে চান ; কারণ তারা মনে করেন, অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হওয়ার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে নিজ ধর্মের প্রতি গভীর আস্থা ও অন্ধবিশ্বাস। যারা নিজেদের সেকুলার বলে ভাবেন বা ঘোষণা করেন, কারো কারো চোখে তারা বিধর্মী তোষণকারী, অথবা নিছকই কাপুরুষ।

তবু কথা, আবারও কথা, প্রশ্ন তোলেন বহু কম মানুষ। তাই আমাদের সমাজে স্বধর্মের গণ্ডির দিয়োপুর্ব করেও কেউ হয়ে যান রাজনীতিকের সক্রিয় নেতা, অথবা আপাদমস্তক ধর্মাচারী শুধু এবং পোশাকে লোকিও হয়েও কেউ কেউ বনে যান প্রচণ্ড সেকুলার। আর এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ক্রমাগত স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে যাওয়ায়, কট্টর বামপন্থীরা তার সদস্য বা সক্রিয় কর্মীদের বারোয়ারি পুজোর অংশগ্রহণ করাটাকে দেখে জনসংযোগের একটা ধাপ হিসেবে। অর্থাৎ এটাও পার্টির কাজ। হাতে তাগা-তাবিজ নিয়েও বিজ্ঞান আন্দোলন বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মিছিলে নেমে পড়া যায় এবং হয়ত বা তার পেছনকার তথাকথিত যুক্তিও আপনার কানে আসে। আবার এরকম প্রতিটি মানুষেই যে মনুষ্যত্ববোধ পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছে একথাও বলা যাবে না। কিছু দিন পুজোর সময় রাত-বিরেতে জোরে মাইক চালানো নিয়ে খানিক যে বচসাদ্বন্দ্বের সঙ্গে আপনার বাদবিতণ্ডা হয়েছে, একটা বন্ধের দিনে তাদেরই দু-জন যুবক বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আপনাকে গাড়ির ব্যবস্থা করে পৌঁছে দিয়েছে আপনার আত্মীয়ের বাড়ি যেখানে সহসা এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কাকে আপনি ভালো বলবেন ? এই ছেলেদের, নাকি আপনার প্রতিবেশী পুরোহিতকে যে ঐ পুজোতেও ছিল না, আবার সাহায্যেও এগিয়ে না এসে গভীর মনোযোগ সহকারে, 'উৎস মানুষ' প্রকাশিত কোনো পুস্তকে গভীরভাবে মগ্ন ছিল।

একটা সময় এইরকম আলাদা করে সাদা কিংবা কালো হিসেবে চিহ্নিত করার কাজটা সহজতর ছিল। দু'দিকের মধ্যেকার প্রাচীরটা ছিল তুলনায় স্পষ্ট। কেন আজ তা ক্রমাগত দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে ? কেনই বা অনেকক্ষেত্রে ঐ সীমারেখার সন্ধান পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে ? কিংবা হয়ত তার চেয়েও বেশি চিন্তার কারণ, ঐ সীমারেখার সন্ধানকারীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। আপনার প্রতিবেশী, সহকর্মী আত্মীয়-স্বজন অধিকাংশের কাছে এই প্রশ্নগুলির অস্তিত্ব নেই। অথবা রয়েছে নিজের অবস্থানকে সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত করার মতো সুকৌশলী জবাব। অথচ এদের অনেকেই আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী তো বটেই, কেউ কেউ হয়ত বন্ধুও। হয়ত এদের কেউ আপনার এই প্রশ্ন বোঝে, যদিও আপনার মনের মতো জবাব তাদের জানা নেই।

আর তখনই কেন জানি না, সাময়িকের জন্য হলেও মনে হয়, বিজ্ঞান আন্দোলন, যুক্তিবাদী কিয়াকর্ম, বিজ্ঞানসম্মত ধরনের সব শব্দ, শব্দ হিসেবে বড় ফাঁপা। আজকের এই ভোগবাদী মানসিকতার দাপটে বাজারে কেমন যেন 'আধ্যাত্মবাদে'র পথ নিয়ে সেগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে যারা রীতিনীতি আর যুক্তির সুবিধাবাদী মেলবন্ধন ঘটাতে পারছেন তাদের সন্ধান মিলছে বাস্তব জগতে সফল মানুষদের তালিকায়। এর মধ্যে রয়েছেন রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, আপনার আমার পরিচিত অনেক মানুষ। তাদের দক্ষতা, সাফল্য কিংবা খ্যাতি যাই বলুন, এমন সুউচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছে গেছে যে, 'রোল মডেল' হিসেবে থাকছেন তারাই, অন্য কেউ নন। সন্দেহ নেই আগেও সফল ব্যক্তিরাই আদর্শ ব্যক্তি হতেন, তবে কিছু ব্যতিক্রমী অথচ প্রচলিত অর্থে 'অসফল' মানুষেও সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় থাকতেন না, এখন কিন্তু তরুণ প্রজন্ম তাদের দিকে ফিরেও

[এর পর ৬৫ পাতায়→

এবারের সূর্যগ্রহণ নির্ঘণ্ট

পনের বছর আগে, ১৯৮০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির কথা মনে করুন। সেদিনও ছিল সূর্যগ্রহণ—কলকাতা আর বাংলার মানুষের কাছে এই বিরল নৈসর্গিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ এসেছিল—যে-সুযোগ একজন মানুষের গোটা জীবনে কদাচিৎ মেলে। কিন্তু কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের মনে পড়ে? এক অসামান্য সুন্দর প্রাকৃতিক ঘটনাকে প্রাণভরে উপভোগ করার বদলে, এর রহস্যকে অনুধাবন করার বদলে, দলে দলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ আতঙ্কে গুটিয়ে গিয়েছিল। দরজা-জানালা সব বন্ধ হয়ে যায় অশুভ রশ্মির ভয়ে, দুপুর থেকে বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে, পথে লোক কমে যায়, খাবার-দাবার-জল কেউ ভয়ে ছোঁয় না—সে এক অসভ্য অশ্লীল আচরণ। বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের কুসংস্কার আর বিজ্ঞানবোধের দৈন্য সেদিন চরম নির্লজ্জতার উদাহরণ রেখেছিল। ...সে ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় এবার। আসুন আমরা গ্রহণ দেখি ২৪ অক্টোবর '৯৫ নির্ভয়ে, আনন্দে—চোখের প্রয়োজনীয় সাবধানতা নিয়ে।

ভারতের বিভিন্নস্থানে এবারের সূর্যগ্রহণের সময়সূচী ২৪ অক্টোবর ১৯৯৫ [ভারতীয় সময় অনুসারে] সকাল

স্থানের নাম	সময় স্পর্শ			চতুর্থ স্পর্শ			পূর্ণগ্রাস স্থিতি		স্থানের নাম	সময় স্পর্শ			চতুর্থ স্পর্শ			পূর্ণগ্রাস স্থিতি	
	ঘ	মি	সে	ঘ	মি	সে	মি	সে		ঘ	মি	সে	ঘ	মি	সে	মি	সে
আগরতলা	৭	৫৫	১'৬	১০	২৩	১৮'৪	–	–	পুরুলিয়া	৭	৩৩	২৩'৩	১০	১২	৫৩'৩	০	৫১
আমতা	৭	৩১	৫২'০	১০	১৭	৫২'৩	০	৪৬	ফলতা	৭	৩২	৩৩'১	১০	১৭	৩১'১	১	১৬
উলুবেড়িয়া	৭	৩১	৪৯'৬	১০	১৬	৫৭'২	১	১০	বালেশ্বর	৭	৩২	৫৮'২	৯	৫৪	৩৭'২	–	–
এলাহাবাদ	৭	২৭	৩২'০	১০	০২	৩৩'৫	–	–	বারানসী	৭	২৭	৪৫'৬	১০	০৪	২২'৫	–	–
কলকাতা	৭	৩২	১২'০	১০	১৭	৫২'৭	–	–	বহরমপুর	৭	৩২	১৮'৩	১০	১৮	১৪'০	০	৫৩
কুলপি	৭	৩২	১০'৪	১০	৭	৫৮'৮	১	০৬	বাসন্তী	৭	৩২	৩৩'৯	১০	১৮	৩৩'৬	১	০১
চন্দ্রকোনা	৭	৩১	২৫'০	১০	১৬	৪৬'৩	১	০৭	বোম্বাই	৭	২৫	৪২'৪	৯	৪৩	১৭'৫	–	–
চুরু	৭	২৭	৫৮'৮	১০	০৪	৫৬'২	১	০৩	জব্বলপুর	৭	২৪	৪৬'১	৯	৫০	১৮'৬	০	০২
ডায়মণ্ডহারবার	৭	৩২	০৬'৭	১০	১৭	৪৭'৭	১	১০	মাদ্রাজ	৭	৩৩	৪৩'৬	১০	০১	৩৩'৮	–	–
ডাল্টনগঞ্জ	৭	২৮	৩১'১	১০	০৭	১৭'২	০	৪৩	মেদিনীপুর	৭	৩১	১৭'৪	১০	১৬	৩৩'৬	০	২০
তমলুক	৭	৩১	৫২'৭	১০	১৭	৩৯'৪	১	১০	রাঁচী	৭	২৯	৩৩'২	১০	১০	৩১'৯	০	২২
দিল্লি	৭	২৪	৫৫'৪	৯	৫২	২২'৫	–	–	হলদিয়া	৭	৩২	৩৩'৯	১০	১৭	৩৪'৯	০	২০
পুণা	৭	২৬	১৪'৫	৯	৪৭	১৭'৬	–	–									

সৌজন্য: আশিস বৃষ্ণী, 'অবজারভেশন অব ইন্ডিয়ান আকাশ অ্যাস্ট্রোনমি'।

সীমারেখার সন্ধানে

[৩৪ পাতার পর]

তাকাচ্ছে না, এবং তাদের ক্ষুদ্র অভাবকেও সেদিকে উদ্বেগ করা যাচ্ছে না।

তাই হয়ত এই সীমারেখার সন্ধান করাটাই নিরর্থক হতে চলেছে। প্রশ্ন হিসেবে এর গুরুত্বও হয়ত ক্রমাগত কমে চলেছে। সার্বিক সামাজিক বাতাবরণ ক্রমানুসারেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। তাই তাই সীমিত আর সংস্কারের টানাপোড়েনে অহেতুক হতো কিছু মানুষ সংসার যারা বেশ কম, সমাজে যাদের ভূমিকা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, তেমনই কিছু মানুষ দিশা হারা খুঁজছে, কষ্ট পাচ্ছে। তাতে ক্ষতি নেই, দুশ্চিন্তারও কোনো কারণ নেই, কেবল চিত্রে আকাশের এক কোণের কালো মেঘের একটা চিহ্ন যেমন কখনও কখনও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে, তেমন একটা ছোট্ট দুশ্চিন্তাও বোধহয় থেকেই যাচ্ছে।

এইড্‌স্ রোগীর চিকিৎসা কই!

সুজিতকুমার দাশ

এইড্‌স্ (Acquired Immuno Deficiency Syndrome : AIDS) নিয়ে কিছুদিন ধরে কেন লেখালেখি, প্রচার, সেমিনার, বিবৃতি ইত্যাদি চলছে। কেউ পড়ে, কেউ পড়ে না, শোনেও না। কিন্তু সরকারি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। বাঙালিদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সরকারি হাসপাতালে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এর থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ব্যাপারটা কী রকম চলছে। কিন্তু দেখতা পরে। এইড্‌স্ বস্তুটি কী তা অনেকেই এখন জেনে গেছেন, কিন্তু সবাই জানেন না; তাই সংক্ষেপে – ব্যাপারটা যা জানা গেছে – একটু পরিচয় দিতে হয়।

এক ধরনের ভাইরাস (Human Immuno-deficiency Virus : HIV) দেহে প্রবেশ করে একটি বিশেষ কোষকে (T_4 Lymphocyte : T-L) আক্রমণ করে এবং ক্রমশ বংশবৃদ্ধি করে একের পর এক T-L কে ধ্বংস করতে থাকে। T-L দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার; ফলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়, ভেঙে পড়ে। এর ফলে দেহ একাধিক মারাত্মক রোগের শিকার হতে পারে এবং অবশেষে মৃত্যু হয়। HIV-সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত, ও অন্যান্য দেহ-নিঃসৃত রসের মাধ্যমে ভাইরাস অন্যের দেহে সংক্রমণ ঘটায়। অর্থাৎ যৌনসংসর্গ, ইনজেকশন-এর মাধ্যমে এবং সংক্রামিত মায়ের রক্তের মাধ্যমে তার গর্ভস্থ সন্তান সংক্রামিত হতে পারে। HIV-সংক্রামিত ব্যক্তির তক্ষুনি তক্ষুনি এইড্‌স্ হয় না, হয় ৩ মাস থেকে ৭/৮ বছর পরে এমন দেখা গেছে, সংক্রামিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ শতাংশের এইড্‌স্-এর লক্ষণ দেখা দেয় সংক্রমণের ১০ বছরের মধ্যে। এইড্‌স্ হলে মৃত্যু অনিবার্য – ১ থেকে ৩ বছরের মধ্যে।

এই যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু দেওয়া হলো তার সবটুকু পুরোপুরি নিশ্চিত সত্যি নয়। সব হিসেবের মধ্যেই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার অবকাশ আছে। এমনকি, সত্যি সত্যি HIV এইড্‌স্-এর কারণ কিনা – তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। হিসেবগুলো একটু আলগাভাবে নিতে হবে। তবে এটা সত্যি যে, এইড্‌স্ রোগ হচ্ছে, এবং যাদের হচ্ছে তাদের কাউকে বাঁচানো যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার সম্ভাব্য সত্যতা অনুমান করে পরিচয়টুকু দেওয়া হলো। যা নিয়ে সন্দেহ বা বিতর্ক নেই তা হলো – এইড্‌স্ রোগের নিরাময়ের কোনো কার্যকর ওষুধ নেই, নিরোধের কোনো কার্যকর টিকাও নেই। এইড্‌স্ নিয়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগের কারণ এটাই।

কী কী লক্ষণ দেখা দিলে এইড্‌স্ সন্দেহ করবেন, কিভাবে রোগ নির্ণয় করা হয় – এসব কথা না বলাই ভালো, এগুলো কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। চিকিৎসা নিয়ে দু-একটি কথা জানা ভালো। HIV-কে মেরে ফেলার কোনো ওষুধ নেই বটে কিন্তু HIV সরাসরি মৃত্যু ঘটায় না। প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার ফলে অন্যান্য যে-সব রোগ হয় তারাই মৃত্যুর সরাসরি কারণ। এইসব রোগের অধিকাংশেরই কার্যকর ওষুধ আছে। এইড্‌স্ রোগীর যে চিকিৎসা করা হয়, তা আসলে এইসব সুযোগ সন্ধানী রোগের চিকিৎসা। এই চিকিৎসা করে রোগীকে সাময়িক কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া যায়, অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। অবশেষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়লে এই চিকিৎসাও তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। HIV-র বিরুদ্ধে যে-সব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলি এখনো তেমন কার্যকর নয়।

এইড্‌স্ রোগীর চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে স্পেশাল সংস্থা ও চিকিৎসাগার গড়া হয়েছে সেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী চিকিৎসার কোনো পরিকাঠামো নেই, সেখানকার ডাক্তাররা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মাবিধি সম্বন্ধে অবহিত নন, নার্স ও হাসপাতালকর্মীরা এ-বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ পান নি। এইড্‌স্ মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মোদ্যোগ ও কৃতিত্বের সরকারি বিবরণীতে কোনো এইড্‌স্ রোগীর চিকিৎসার বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুই

এইড্‌স্ হলে ধরে নেওয়া হয় পুরুষটি যৌনকর্মীর খদ্দের, বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে স্বামীর চরিত্রহীনতাকে দায়ী করা হয়। এটা কিন্তু এইড্‌স্-এর বিশেষত্ব নয়; সব যৌনরোগের ক্ষেত্রেই এই অনুমান প্রচলিত। কিন্তু যৌন-বহির্ভূত উপায়ে HIV সংক্রমণের কথাটা সচরাচর কেউ মনে রাখে না। এই সংক্রমণের প্রক্রিয়া বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এইড্‌স্ নিয়ে হৈ-চৈ দেখে কিছু সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি বলছে যে, এসবের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত থাকতে পারে। এইড্‌স্ এদেশের পক্ষে তেমন বিপজ্জনক নয়। কারণ,

আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রার সমকামিতা, বহুকামিতা, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক, কেন্দ্রীয় প্রস্তাবে ভূমিকা নগণ্য। এইড্‌স্‌-এর প্রতি মতাধিক নজর দেওয়ার ফলে অন্যান্য নিরাময়-যোগ্য সংক্রামক রোগের প্রতি নজর ও অর্থবরাদ্দ কমে গেছে। আসলে এটা সাম্রাজ্যবাদের রোগ এবং তাদের জন্য টিকা তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা তৃতীয়বিশ্বের দেশের ওপর চালানোর ব্যাপারেই এরকম 'গেল গেল' রব তোলা হচ্ছে, যেন মহামারী লেগে গেছে। এই দেশপ্রেমিকদের বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে, কিন্তু পুরো সত্য নেই। এদেশে যৌন সম্বন্ধের পবিত্রতা বা বিবাহবহির্ভূত যৌনজীবন নিয়ে একটা আদিখ্যেতা দেখানো হয়, বাস্তবের চিত্রটা তেমন সরল না। শুধু খবরের কাগজ পড়লেই তা বোঝা যায়। এ তথ্যও প্রমাণিত হয়েছে যে যৌনকর্মী ও যৌনব্যবসা বেড়েই চলেছে। যৌন-সংক্রমণের ভূমিকা একেবারে নগণ্য বলা চলে না। কিন্তু ধরে নিন, যৌনসংক্রমণের বিপদ সত্যিই নগণ্য। যৌন-বহির্ভূত সংক্রমণের দিকটা দেশপ্রেমিকরা ভুলে গেলেন কেন? এ দিকটা ভারতে সাংঘাতিক। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও ছুঁচ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং শল্যচিকিৎসায় কাটা-ছেঁড়ার ক্ষেত্রে রোগজীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যে-সব অবশ্য পালনীয় সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেওয়া আছে, ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পালন করা হয় না। এই কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকাশনায় এর স্বীকৃতি আছে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটি এইড্‌স্‌ রোগীর মৃত্যু নিয়ে স্টাফ অ্যাকশন ফোরাম এবং হেলথ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ রিপোর্টে বলা হয়েছে[১] যে, কলকাতার তিনটি প্রথম সারির হাসপাতালে এই সংক্রমণ-প্রতিরোধ সতর্কতা পালন করা হয় না। ক-দিন আগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক রোগীর এইড্‌স্‌ ধরা পড়াতে ডাক্তাররাই সেখানে কাজ করতে অস্বীকার করে। এই অজুহাতে যে, নির্ধারিত সতর্কতা পালন না করার ফলে অন্যান্য রোগীর তো বটেই, তাদেরও HIV সংক্রমণ হয়ে যেতে পারে। এই প্রতিরোধ সতর্কতার ব্যাপারটা তেমন একটা আহামরি কিছু বলে মনে করবেন না। সিরিঞ্জ-ছুঁচ-যন্ত্রপাতি জলে ফুটিয়ে বা অন্য উপায়ে জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা—যে কাজটা প্রায় শত এক শতাব্দী ধরে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় পালন করা হচ্ছে এবং যে-কাজটি করতে ডাক্তারি জানার দরকার নেই, সব হাসপাতাল-কর্মীরই জানার কথা। বিশেষ আধুনিক-কালের এককালীন ব্যবহারযোগ্য (disposable) যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রথার দিকে তাকান। এই ধরনের সিরিঞ্জ-ছুঁচ ইত্যাদি একবার ব্যবহার করেই ফেলে দিতে হয়, ফলে সংক্রমণের সুযোগ থাকে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একবার নয়, একাধিকবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[২] প্রতিবেদনে প্রাকটিসে তো বটেই, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি রিপোর্টে বিলাপ করা হয়েছে, "অধিকাংশ হাসপাতালেই disposable ছুঁচ ফুটিয়ে নিয়ে আবার ব্যবহার করা হয়, এই ভাবনা এখনি বন্ধ করতে হবে।"[৩]

এইড্‌স্‌-এর মতো একধরনের জন্ডিসও (Hepatitis B) রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ হয়। ভারতে ডাক্তারদের হাসপাতালকর্মীদের মধ্যে এই জন্ডিসের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সংগ্রহের আগে পরীক্ষা করে নেওয়া বাধ্যতামূলক যে দাতার রক্তে HIV বা জন্ডিসের ভাইরাস বা সিফিলিস রোগ আছে কি না। অধিকাংশ ব্লাড ব্যাঙ্কেই HIV নির্ণয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই যদিও সরকারি পুস্তকে মিথ্যা কথা চালানো আছে। যেখানে ব্যবস্থা আছে সেখানে নিয়মিত পরীক্ষা হয়, এরকম গ্যারান্টি কেউ দেবে না। দুটো উদাহরণ দিই, তাহলেই বুঝতে পারবেন। এক, সরকারি পুস্তকে জানানো আছে যে, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে HIV পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তা সত্ত্বেও ঐ হাসপাতালের রোগীর HIV পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা পাঠানো হয় এস্প্ল্যানেড হাসপাতালে। দুই, ক-দিন আগে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে HIV পরীক্ষার পরীক্ষাগার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য অধিকর্তা বলেছেন যে, গত চার বছর ধরে তিনি সর্বত্র অসত্য কথা বলে আসছেন যে, সেখানে পরীক্ষাগার রয়েছে, আসলে ছিল না। কেন এই মিথ্যা কথা বলেছেন—এই প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্য প্রশাসনের দিকপাল বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার জন্য এমন করতে হয়। কথাটা এই যে, এদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমেই HIV সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশ বাস্তব ও বিপজ্জনক। বিপদটা কেমন সেটাও জানতে হয়।

তিন

যৌন সংক্রমণের শিকার হতে পারে এক বিশেষ ধরনের জনগোষ্ঠী—সমকামী, বহুগামী, যৌনকর্মী ও তাদের খদ্দের এবং এই খদ্দেরদের স্ত্রী। এদের সংখ্যা নগণ্য না হলেও পশ্চিমী সমাজের তুলনায় খুবই কম। এদের বলা হয় ঝুঁকি-বহুল গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর মধ্যেই পড়ে মাদক-ইনজেকশন গ্রহণকারী ও নেশাখোর রক্তদাতা। এদের সংখ্যাও নগণ্য। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সিরিঞ্জ-ছুঁচ-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় যে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যাটা একবার ভেবে দেখুন। প্রশ্ন তুলতে পারেন—এদের মধ্যে কতজনের HIV সংক্রমণ হয়েছে? এর উত্তর জানা নেই, কারণ এদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয় না, কারণ এদের ঝুঁকি-বহুল মানুষ হিসাবে ধরা হয় না। কলকাতার যে-সব হাসপাতালে ভর্তি-থাকা রোগীদের মধ্যে এইড্‌স্‌ ধরা পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, হাসপাতালে থাকাকালীন একই সিরিঞ্জ-ছুঁচ-যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অন্য আরো রোগীর দেহেও HIV ঢোকার সম্ভাবনা বেশ প্রবল। কিন্তু সেইসব সহরোগীদের খুঁজে বার করে কারো সংক্রমণ হয়েছে কি-না দেখার উদ্যোগ কেউ নেয় নি। সংক্রামিত হলে, তাদের স্বামী স্ত্রীদের সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি থাকছে। আবার বিবেচনা করুন, হাসপাতালে চিকিৎসাপ্রার্থীদের মধ্যে যার দেহে HIV আছে কিন্তু ধরা পড়ে নি তার দেহ থেকে কতজনের দেহে সংক্রামিত হয়েছে বা হচ্ছে। মনে হয়, এদেশে চিকিৎসাপ্রার্থী সবাইকেই ঝুঁকি-বহুল গোষ্ঠী হিসেবে ধরা উচিত

এবং একটা গাঁজা যে, HIV যদি চিকিৎসাব্যবস্থার মাধ্যমে ছড়ায় তাহলে সংক্রমণের গতি হবে ভয়ংকর দ্রুত।

সমালোচকরা একথাও বলছেন যে, ভারতে এইড্‌স্‌-এর মোকাবিলা করার জন্য সাহেবরা যে ৩০০ কোটি টাকা দিচ্ছে তাতে সন্দেহ করার কারণ আছে। একটি রোগের জন্য এত টাকা না কি সাহেবরা আগে কখনো দেয় নি। একটি সন্দেহ — ভারতকে এইড্‌স্‌-এর টিকা পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হবে; ভারতের মানুষকে না জানিয়ে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং তার মাধ্যমে এইড্‌স্‌ আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাহেবদের ক্ষেত্রে অবশ্য কোনো সন্দেহকেই উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়; এরকম কাজ বহু'দিন ধরে তারা আগেও করেছে। কিন্তু একটা জানা ভালো যে বিশ্বে এইড্‌স্‌-এর মোকাবিলার বার্ষিক ২১,০০০ কোটি টাকা খরচের ৯৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে।

দেশদ্রোহিক হিসেবে যাদের ধরা হয় না সেই সরকারি কর্তাব্যক্তিদের কথা এবার বিবেচনা করুন। প্রথম দিকে এইড্‌স্‌কে কেউ পাত্তা দেয় নি; পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো একবার জনসমক্ষে দোষের বলেই ফেলেছিলেন যে, এইড্‌স্‌-এর চেয়ে অনেক বেশি জরুরি আন্ত্রিক রোগের মোকাবিলা করা। কিন্তু বিদেশ থেকে ডলার অনুদান আসার পর থেকে এদের 'বদলে গেছে মতো'। কেন্দ্র ও রাজ্যে আলাদা সংগঠন তৈরি হয়েছে এবং এই সংগঠনে ঢোকবার জন্য আমলা ও ডাক্তারদের মধ্যে গাড়ি প্রেরোপেরি লেগে গেছে। সম্প্রতিও এইড্‌স্‌ নিয়ে বক্তৃতার শেষ নেই। এইড্‌স্‌-এর সংক্রমণ-নিরোধ ও চিকিৎসা, HIV-সংক্রমিত ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বই ছাপানো হয়েছে। বেশির ভাগই অবশ্য সাহেবদের থেকে টোকা মনে করবেন না, তার মধ্যে মৌলিক কিছু আছে। মোদ্দা ঘটনা অন্যত্র। এইসব বইতে যে-সব কর্মসূচী, নির্দেশ, সুপারিশ, নির্দেশাবলির কথা বলা হয়েছে তা পালন করা হচ্ছে না।

চার

পূর্বোক্ত তদন্ত রিপোর্টে বলা পড়ছে যে, এইড্‌স্‌-এর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ব্যবস্থাপনা গড়িয়ে দিয়েছে তার মধ্যে বিস্তর কারসাজি রয়েছে। বিনা চিকিৎসায় যে রোগীটির মৃত্যু হলো তার কাহিনীটি মর্মান্তিক। এইড্‌স্‌ ধরা পড়ায় পরেই সরকারি স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা রোগীকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেয়। আবার ভর্তির জন্য রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে এইড্‌স্‌-প্রশাসনের মুখপাত্রী আত্মীয়দের বুঝিয়ে-ভাগিয়ে তার পরিচিত এক কবিরাজের কাছে চিকিৎসার জন্য রোগীকে পাঠিয়ে দেন। পরে প্রশ্নের উত্তরে এই মুখপাত্রী বলেন যে, অ্যালোপ্যাথিতে এইড্‌স্‌ ভালো হয় না কিন্তু কবিরাজিতে ভালো হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, তাই তিনি ঐ কবিরাজের কাছে রোগীকে পাঠিয়েছিলেন। আবার সর্বসমক্ষে ঐ কথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বি. শঙ্করানন্দও জোর উদ্ধৃত করে দেখান যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তার রাজ্যে এক কবিরাজ এক ওষুধ উদ্ভাবন করেছে এবং তা প্রয়োগ করে এইড্‌স্‌ রোগীকে নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি ঐ কবিরাজকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন এবং ঐ অলৌকিক (Miraculous) ওষুধের জন্য ঐ কবিরাজ নোবেল প্রাইজ পেতে পারে। দেশের কেলেঙ্কারিতে দুর্নীতির অভিযোগে শ্রীশঙ্করানন্দ পদত্যাগ করাতে, নোবেল প্রাইজের ব্যাপারটা হয়তো চাপাচাপা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে কিন্তু যতক্ষণ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান এইড্‌স্‌-কর্তাদের রাজত্ব থাকছে ততক্ষণ কী হয় তা বলা যায় না।

রিপোর্টে জানা গেছে যে, মুমূর্ষু অবস্থায় আবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর নার্স ও হাসপাতাল কর্মীরা কেউই রোগীর কাছে ঘেঁষত না, একটু দূরে ওষুধ রেখে চলে যেত; মৃত্যুর পর কেউ মৃতদেহ ছোঁয় নি, সৎকারের জন্য পাড়ার লোকেদের নিয়ে যাওয়া হলে তাদেরও সাবধান করে দেওয়া হয় এবং ফলে, তারাও দূরে সরে যায়। খবরটা এবং পরিচয়টা পাড়ায় জানাজানি হয়ে যায় এবং ফলে, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছোটো ভাই জীবিকা হারায় এবং জীবিকার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে। এখন উপার্জনহীন বস্তিবাসী মা ও দিদি পাড়া ছাড়ার জন্য সামাজিক চাপের শিকার এবং তাদের খাওয়া পরা কীভাবে চলছে তা হয়ত ঈশ্বরের বাবাও জানে না।

রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, এইড্‌স্‌ রোগীর চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে স্পেশাল সংস্থা ও চিকিৎসাগার গড়া হয়েছে সেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী চিকিৎসার কোনো পরিকাঠামো নেই, সেখানকার ডাক্তাররা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশাবলি সম্বন্ধে অবহিত নন, নার্স ও হাসপাতালকর্মীরা এ-বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ পায় নি। এইড্‌স্‌ মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মোদ্যোগ ও কৃতিত্বের সরকারি বিবরণীতে কোনো এইড্‌স্‌ রোগীর চিকিৎসার বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি, ভারতের কোনো মেডিক্যাল জার্নালে এইড্‌স্‌ রোগীর চিকিৎসার কোনো বিবরণ এখনো প্রকাশিত হয় নি। মোদ্দা কথাটা স্পষ্ট করে বলতে হয়। যে কোনো সংক্রামক রোগকে নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করার যে প্রক্রিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে সুপারিশ করা হয় তার অন্যতম কর্মসূচী হলো — রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি খুঁজে বার করে যাতে তার দেহ থেকে অন্য নিরোগ ব্যক্তির দেহে সংক্রমণ না হয়, তার ব্যবস্থা করা। এইড্‌স্‌ মোকাবিলায় এখানে এরকম কোনো ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে এখনো জানা যায় নি। কিন্তু সাহেবি টাকা আসছে, মোটা টাকা আসছে এবং একটু নজর দিয়ে দেখলে, মনে হয়, বামফ্রন্টপ্রেমীও স্বীকার করবেন যে টাকাকড়ি নয়ছয় হচ্ছে। অবশ্য বলতে পারেন, টাকাকড়ি নয়-ছয় হচ্ছে — এ আর এমন কী নতুন কথা হলো। তা বটে। আসল কথা হলো — লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি।

আন্ত্রিক, যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি, যাতে অনেক বেশি লোক আক্রান্ত হচ্ছে তার মোকাবিলা না করে এইড্‌স্‌-এর পিছনে টাকা ও পরিশ্রম ব্যয় করাটা অপচয় — এই প্রগতিশীল যুক্তিটা এক্ষেত্রে টেঁকে না। অন্যান্য সংক্রামক রোগের মোকাবিলা করতে কেউ বারণ করে নি। এইড্‌স্‌কে

উপেক্ষা করলেই দুরন্তবেগে ঐসব রোগের মোকাবিলা করা যাবে এমনটা নয়, আবার এইড্‌স্‌-এর দিকে নজর দিলে অন্যান্য রোগের প্রতি মনোযোগ কমে যাওয়ার কোনো কারণও নেই। এইড্‌স্‌ ধনী ও সাহেবদের রোগ—একথা ঠিক নয়, কিন্তু ঠিক হলেও কিছু যায় আসে না। সহজেই বোঝা যায় হাল টানতে না পারলে অচিরেই সর্বস্তরের মানুষের আক্রান্ত হতে কোনো বাধা নেই। আক্রান্তের সংখ্যা নগণ্য এবং সেই তুলনায় বিপুল সংখ্যায় মানুষ অন্যান্য সংক্রামক রোগে নিয়মিত আক্রান্ত হচ্ছে, সুতরাং আপাতত এইড্‌স্‌-এর প্রতি নজর না দিলেও চলে—এধরনের যুক্তিটা বিপজ্জনক। কারণ এইড্‌স্‌ রোগের চরিত্রটা একেবারে আলাদা। রোগটি সংক্রামক, যৌন ও অযৌন উভয় পথেই সংক্রমণ হতে পারে, কোনো চিকিৎসা নেই, প্রতিরোধকারী টিকাও নেই; অর্থাৎ এমন প্রকৃতির আর কোনো সংক্রামক রোগ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যৌন-বাছবিচার বা চরিত্রহীনতার কলঙ্ক, লোকলজ্জা, আতঙ্ক, সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিভীষিকা। তাই এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটাও একটু আলাদা হওয়াটাই সঙ্গত।

পাঁচ

এইড্‌স্‌ যখন ছড়িয়ে পড়ে নি, যখন আক্রান্তের সংখ্যা নগণ্য, তখনই প্রতিরোধের উদ্যোগটা প্রবল ও সর্বব্যাপী হলে ভালো হয়। কারণ রোগ নিরোধের কর্মসূচী ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার নেই। নিরোধের কর্মসূচী ব্যর্থ হলে, এইড্‌স্‌ অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়াতে থাকলে, করার আর কিছু থাকবে নেই। একথাও বলা যায় যে, নিরোধের কর্মসূচী অসম্ভব বা দুরূহ নয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে দূষিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সংক্রমণের প্রক্রিয়াটি কলঙ্কজনক, এটা এখুনি বন্ধ করা উচিত, করা সহজসাধ্য। যৌনসংক্রমণের পথ বন্ধ করার সমস্যাটি জটিল। এর সঙ্গে জড়িত প্রধান সমস্যাটি হলো বেশ্যাবৃত্তির বিষয়টি। বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা উচিত—একথা, মনে হয়, একমাত্র সন্তান ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করবে। এ-নিয়ে অনেক কথা আছে যা এই রচনার পক্ষে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক নয়। কয়েকটি কথা বলা যায়।

যৌনব্যবসার মাধ্যমে এইড্‌স্‌ ও অন্যান্য রোগ সংক্রমণ নিরোধের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলকাতার যৌনকর্মীদের মধ্যে কাজ করার একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রকল্পটি একদিক থেকে অভিনব; এখানে রোগ-নিরোধের প্রচার ও কাজ যৌনকর্মীদের দিয়েই করা হচ্ছে। দেখা গেছে যে, এইড্‌স্‌-এর খবর সেখানে পৌঁছেছে এবং নিরোধের উদ্যোগে যৌনকর্মীদের আগ্রহ আছে। বাকারই কথা, জ্ঞানদস্যুকে কে না ভয় পায়। যৌনব্যবসা বন্ধ করা বা কমানো আপাতত সম্ভব না, তাই ব্যবসা চলুক কিন্তু রোগ সংক্রমণটা আটকানো বা কমানো যাক—এই ধারণা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি চলছে। প্রকল্পের কার্যক্রম দেখে মনে হয় যে, সংক্রমণ কিছুটা কমানো সম্ভব। এটাকে ন্যূনতম কর্মসূচী বলা যায়। কিন্তু যৌনব্যবসা বন্ধ করা যায় না, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এটা সম্ভব নয়, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করতে পারলে যৌনব্যবসা চলবেই—এইসব আপ্তবাক্য-গুলি পুরোপুরি সত্যি নয়। এটা সবাই দেখেছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যত গলদই থাক না কেন, সেখানে নানাস্তরের বৈষম্য ও অনাচার সত্ত্বেও যৌনব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে, অসমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলিতে, যেমন ভারতে, যৌনব্যবসা বন্ধ করা বা কমানোর উদ্দেশ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ কখনো নেওয়া হয় নি। শুধু সমাজের এই কলঙ্ক ঢাকতে ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু আইনকানুন তৈরি হয়েছে, এই মাত্র। সত্যি কথাটা কি, যৌনব্যবসায় যারা মালিক, যারা এর থেকে মুনাফা করে, তাদের নিরস্ত্র করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না; এবং এর অর্থ হলো—আসলে এই নিষ্ক্রিয়তা মালিকদের উৎসাহ দেয়; ব্যবসা বেড়েই চলে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ঘুষ খাওয়া বন্ধ করা অসম্ভব, তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে ঘুষ খাই, যারা ঘুষ খেয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ছে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হোক—অনেকটা এইরকম। এই মানসিকতা ও কর্ম-প্রণালীর ফলে ন্যূনতম কর্মসূচীর কাজটাও আরো বেশি দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই যৌনসংক্রমণ রোধ করার উদ্যোগ সফল হবে বলে মনে হয় না।

কথা আর বাড়ানোর দরকার নেই। পুরো বিপদটা একজনেই নিজস্ব বুঝে নিয়েছেন। HIV-এর বিরুদ্ধে কোনো স্থায়ী কার্যকর ওষুধ নেই। রোগ নিরোধের টিকা নেই। এইড্‌স্‌-আক্রান্ত রোগীর যেসব সুযোগসন্ধানী জীবাণুঘটিত প্রাণঘাতী রোগ তার চিকিৎসা আছে কিন্তু এদেশে সরকারি হাসপাতালে তা দেওয়া হয় না। যৌন-সংক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। অযৌন-সংক্রমণ বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ নেই। এখনো এইড্‌স্‌ হয় নি, কিন্তু HIV-সংক্রামিত ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে তারা একঘরে ও অচ্ছুৎ হয়ে পড়ে—সমাজে তো বটেই, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছেও। এইড্‌স্‌ নিয়ে যা হচ্ছে তা হলো বাগাড়ম্বর এবং টাকার নয়ছয়। তাই এইড্‌স্‌ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তথ্যসূত্র:

১. *WHO IS AFRAIDS OF AIDS*, Iequity report of Drug Action Forum, WB & Health Services Association, WB, Jan. 1995.

২. *India Abroad*, July 16, 1994.

৩. 'Selections from *JIMA* Special Issues on AIDS', *Journal of Indian Medical Association*, Calcutta, 1994.

প্রিয় লেখকদের প্রতি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাগজের একপিঠে ওপরে-নিচে দু-পাশে মার্জিন রেখে লিখুন।
লেখার সঙ্গে আপনার পুরো নাম-ঠিকানা অবশ্যই পাঠাবেন। দুঃখিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

এইড্‌স্‌ নিয়ে হচ্ছেটা কী !

ABVA (এইড্‌স্‌ ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন) একটি স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক সংগঠন, গত ৫ বছর ধরে দিল্লিতে সক্রিয়ভাবে তাদের প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের নিপীড়িত লাঞ্ছিত যৌনকর্মী, নেশাগ্রস্ত, সমকামী ও হাজতবাসীদের প্রতি সরকারি কর্তা, পুলিশ ও অর্থপুষ্ট ক্ষমতাবানদের অত্যাচার ও অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে ABVA নানা কর্মসূচী নিয়ে।

১ ডিসেম্বর ('৯৭) ছিল 'বিশ্ব এইড্‌স্‌ দিবস।' তার ঠিক আগের দিন, ৩০ নভেম্বর, ABVA একটি জোরদার বিক্ষোভ-সভার আয়োজন করে নতুন দিল্লির NACO (National AIDS Control Organisation) অফিসের সামনে—পার্লামেন্ট ভবনের উল্টোদিকে। এই 'ন্যাকো' নামক জাতীয় সংস্থার কাছে বিক্ষোভকারীরা সম্মিলিতভাবে অভিযোগ করতে চান: ভারতে এইড্‌স্‌ প্রতিরোধের নামে যৌনকর্মীদের প্রতি হেনস্থায়, অমানবিক, অনৈতিক, অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে নির্যাতন চালাচ্ছে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তর। ন্যাকো অফিসের সামনে সেদিন ধর্না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল, তবে সেখানে পার্লামেন্ট অধিবেশন চলার জন্য ১৪৪ ধারার সমস্যাটাও ছিল।

৩০ তারিখের দুপুর ১টা নাগাদ 'ন্যাকো'-র গেটে পৌঁছে দেখি বিক্ষোভকারীদের সংখ্যার তুলনায় নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। গেট বন্ধ। অনুমতিপত্র ছাড়া কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বেলা বাড়তে বিক্ষোভকারী ABVA কর্মীবৃন্দের জমায়েত বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে সাংবাদিক আলোকচিত্রী টিভিও-ওয়ালাদের ভিড় বাড়তে দেখা যায়। পুলিশ যখন কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না; তখন জমায়েত থেকে স্লোগান ওঠে: 'সরকারি বাড়াবাড়ি চলবে না', 'মহিলা যৌনকর্মীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ কর', 'ন্যাকো মুর্দাবাদ' ইত্যাদি। এবার নিরাপত্তাকর্মী/পুলিশ সরে দাঁড়ায় গেট ছেড়ে, কোনো বাধা নেই। ভেতরে প্রশাসনিক বাড়ির দিকের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে জোরদার স্লোগান ও নিরন্তর বিক্ষোভ চলতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদল ভেতরে যায়; 'ন্যাকো'-র অধিকর্তা প্যাটিলে—এরা ডাক্তারের কাছে বাইরের লোকজনেরাই বেশি থাকবেন। প্রধান অধিকর্তা নিজেই বেশ সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন: 'NACO জোর করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একদম বিরোধী। যারা বিভিন্ন জায়গায় ওসব টেস্টিং-এর নামে জোর-জুলুম চালাচ্ছে তারা আমাদের কথা শোনে না। VHAI (Voluntary Health Association of India) আমাদের নির্দেশ মানে না. এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার…।' বক্তব্যের সমর্থনে সেই কর্তাটি কিছু 'অফিসিয়াল' চিঠি প্রতিনিধিদের দেখান।

এরপর, বিক্ষোভ-প্রতিনিধিরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে সমাবেশ থেকে 'ন্যাকো'-র উদ্দেশে শেম্‌ শেম্‌ ধ্বনি দেওয়া হয়, বলা হয়—ন্যাকো জানে না তার নিজের হাত-পা কী করছে। সমাবেশ থেকে আরো ঘোষণা করা হয়—এইড্‌স্‌-এর নাম দেখিয়ে প্রচুর অর্থ-অনুদান আদায় করার দুর্নীতিমূলক কাজ VHAI-এর মতো সংস্থাগুলি চালিয়ে যাচ্ছে; এরকম জন-বিরোধী নোংরা কাজ বন্ধ না হলে VHAI-এর দিল্লি সদর দফতরে বিক্ষোভ-ধর্না করা হবে। এই সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ অফিস থেকে বেরোচ্ছিলেন—তাদের দেখে WHO-বিরোধী স্লোগান ওঠে। …উল্লেখযোগ্য, এই ধর্নার অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা। গণমাধ্যমে এ-সংবাদ প্রচার করা হয়।

প্রসঙ্গত জানাই, এইড্‌স্‌ ভেদভাব-বিরোধী আন্দোলন (ABVA) সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে চারটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে—নিপীড়িত গোষ্ঠীগুলির প্রতি অত্যাচার, তাদের প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যকর্মীদের অপপ্রচার ও বাস্তব তথ্য নিয়ে রচিত এই পুস্তিকা। ABVA কোনো বিদেশী অনুদান নেয় না। তাদের যোগাযোগের ঠিকানা:

AIDS Vhedbhav Virodhi Andolan
P. B. No. 5308, Delhi 110 053

প্রতিবেদক : যোগীন
(নতুন দিল্লি-র বিজ্ঞান আন্দোলনকারী)

প্রকাশিত হয়েছে

ষষ্ঠ মুদ্রণ [তৃতীয় সংস্করণ]
উৎস মানুষ সংকলন
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড)
দাম : ২৫ টাকা

তৃতীয় মুদ্রণ [দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ]
উৎস মানুষ সংকলন
বিবেকানন্দ অন্য চোখে
দাম : ২৫ টাকা

ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স :

একবার মাটির দিকে তাকাও একবার মানুষের দিকে তাকাও

আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগে পশ্চিমবাংলার আর পাঁচটা অখ্যাত গ্রামের মতোই একটি গ্রাম ছিল ডানকুনি। আম, জাম আর অশ্বত্থ বটের ছায়ায় ঘেরা এ গ্রামটির মানুষজনেরাও জমিতে চাষ করে আর খাল-বিলে মাছ ধরে মোটামুটি নিরুপদ্রুপ জীবনই কাটাত।

রেলের সময় সারণীতে 'ডানকুনি লোকাল' নামের একটি গাড়ির উল্লেখ থাকায় 'ডানকুনি' নামটার সঙ্গে শহরবাসীদের একটু-আধটু পরিচয় থাকলেও ডানকুনি সংলগ্ন গোবরা, নৈটী, আকনা, পায়রাডাঙা, ভিন্ন নামের গ্রামগুলোর কোনো পরিচিতিই ছিল না। কিন্তু তাতে এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ কোনো অসুবিধা ছিল না। ওরা চাষবাস আর মাছধরা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। নিজেদের মতো করেই তারা তাদের জীবন কাটাত।

আশির দশকের গোড়ার দিকে হঠাৎই একদিন এই 'ডানকুনি' নামটি রেলের সময় সারণীর পাতা থেকে একেবারে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় উঠে এল। শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সব মানুষই জানল যে, ডানকুনি নেহাতই হেলাফেলার জায়গা নয়। এই জায়গার ওপর নজর আছে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের। এই সময়ে কেন্দ্রীয় কয়লা দপ্তর ঘোষণা করল যে, কোল-ভিত্তিক কারখানা তৈরি হবে হুগলি জেলার এই অখ্যাত গ্রামটিতে; অতএব সাজোসাজো রব। ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে থাকল ডানকুনি নামের গ্রামটির চেহারা। রোজই সরকারি গাড়ি আর বড় বড় আমলাদের আনাগোনা। মিস্ত্রি-মজুর যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আনাগোনার পর্ব সেরে একদিন তৈরি হলো 'ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স' (D.C.C.)।

যদিও নাম হলো 'ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স', কিন্তু এর সঠিক অবস্থান হলো ডানকুনির পরের স্টেশন গোবরার কাছে দিল্লি রোড এবং হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের মাঝামাঝি জায়গায়। গ্রামের অনেক মানুষের চাষের জমি নিয়ে তৈরি হলো কমপ্লেক্সের সুরম্য কার্যালয়। যাদের জমি নেওয়া হলো তাদেরকে আশ্বস্ত করা হলো এই বলে যে, তাদের প্রত্যেককে চাকরি দেওয়া হবে। সেদিনকে নতুন আলোর ঝলকানিতে গ্রামের মানুষও ঝলমলিয়ে উঠেছিল। ওরা স্বপ্ন দেখেছিল শিল্প-সমৃদ্ধ দেশের, প্রত্যাশা করেছিল অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার। কিন্তু ···

তারপর কী হলো?

গ্রামের মানুষের স্বপ্ন আর প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে ১৯৯০ সালের জুলাই-আগস্ট মাস থেকে ডি. সি. সি. তার উৎপাদন শুরু করল। শাঁখ, ঘণ্টা, ঢোল, কাঁসি, বাঁশি-বাজনা দিয়ে মহা ধুমধাম সহকারে ডি.সি.সি. বৃহত্তর কলকাতার গ্যাসের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কোল গ্যাসের উৎপাদন শুরু করল একেবারে প্রথমে। তারপরে আলকাতরা, সিনকোক ইত্যাদি আরও ১১টি উপজাত পদার্থও তৈরি হতে থাকল এই কারখানায়। তার সঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় প্রতিদিন ছড়িয়ে পড়তে থাকল কয়েক হাজার কিউবিক মিটার বিষাক্ত গ্যাস। এর ফলে প্রায় ১২ কিলো মিটার ব্যাসের এক লম্বাটে জন-অধ্যুষিত এলাকায় মারাত্মক বায়ুদূষণ ঘটতে থাকল। ফলে গোবরা, নৈটী, পায়রাডাঙা ইত্যাদি গ্রামগুলোর মানুষজনেরা অসহ্য শ্বাসকষ্ট আর খা-খাঁ বাঁধ করা চাষ নিয়ে কোনমতে আলোর নিচের অন্ধকারে জীবন কাটাতে থাকল। এই বিষাক্ত গ্যাস যে শুধু তাদের শরীর নষ্ট করে তাই নয়, নষ্ট করেছে তাদের চাষের জমি, খাবার জল। ফলে তারা দিশাহারা।

দুলত চাষের কাজের জন্য হাওড়া ও হুগলি জেলার মধ্য সীমারেখা ধরে গঙ্গা থেকে একটি খাল কাটা হয়েছিল বহু থেকে দেড় শতক বছর আগে, বালি আর উত্তরপাড়ার মাঝখান দিয়ে এই খাল সোজা চলে গেছে ডানকুনির দিকে। সেচের কাজে জল সরবরাহ করা ছাড়াও এই খালটি দু-পাশের জনবসতির অনেক কাজেই লাগে। গাঁয়ের নিরীহ মানুষদের স্নান, ঘর-গৃহস্থালির কাজ ইত্যাদিতেও এই খালের জল অপরিহার্য। তাছাড়া মাছ ধরা তো আছেই। ১৯৯০ সালে ডি.সি.সি.-র গ্যাস উৎপাদন শুরু হওয়ার পর ঐ কারখানার যত বর্জ্য পদার্থ ফেলা হতে থাকে পার্শ্ববর্তী সেই জলাভূমিটিতে, যার সঙ্গে ঐ গুরুত্বপূর্ণ খালটির সরাসরি যোগাযোগ আছে। ফলে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা তৈলাক্ত আলকাতরা ও অন্যান্য আবর্জনা এসে পড়তে থাকে খালে। আর তা মোটা সরের মতো জলের ওপর ভাসতে

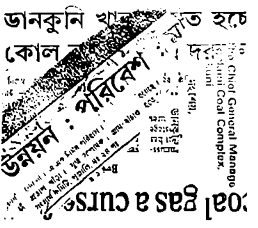

থাকে। স্থানীয় কেউ কিছু মানুষ জলে নেমে নাকডুবা দিয়ে ঐ আলকাতরা তুলে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে। আর এইসব মানুষের বেশিরভাগই নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকছে। দুধে থেকে তাদের শ্বাস, শেষ হয়ে গেছে তাদের প্রত্যাশা শুধু এখনো শেষ হয় নি তাদের জীবন-সংগ্রাম। তাই আজও তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ঐ একই কাজ করে চলেছে। ওদের সকলের মনে এখন একটাই প্রশ্ন এমন তো হওয়ার কথা ছিল না; কিন্তু কেন এমন হলো, আগে কেমন ছিল, আর এখনই বা কেমন? কি করেই বা এমন হলো এই সব জানার জন্য কিন্তু বার বার ঘোরাঘুরি করলাম ঐ-সব গ্রামগুলোয়। কথা বললাম গ্রামের প্রবীণ ও নবীন মানুষজনের সঙ্গে। সকলেরই এক কথা কারখানা তৈরির আগে এমন ছিল না। গ্রামের ঘরে ঘরে অক্লান্ত পরিশ্রম করা মহিলারাও একই কথা বললেন। 'আগের মতো আর পরিশ্রম করতে পারি না, যখন গ্যাস ছাড়ে তখন চোখ জ্বলতে থাকে, অনবরত পেটের গোলমাল, হাঁপ ধরে, মুখে খিদে হয় না। শরীরে কষ্ট হয়। ছোটো ছেলেমেয়েদের সর্দিকাশি সারে না, গা চুলকে ঘা-পাঁচড়া লেগেই আছে। গরিব মানুষ, ডাক্তার দেখাতে পারি না, এই নিয়েই দিন কাটাই।' দলের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন 'দিদি গো, আমাদের নেই ঘরে রোজগেরে মানুষের তুলনায় খাওয়ার লোক বেশি। তাই জমি থেকে চাল-ডাল কুড়িয়ে, পুকুর থেকে শাক আর গুগলি শামুক, কখনও বা দু-একটা মাছ ধরে এনে ছোটো বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতুম। কিন্তুক কারখানা হয়ে কি যে হলো, পুকুরে আর গুগলি শামুক পাই না। ধানের গোড়া জ্বলে হেজে হয়ে যায়। শাক-পাতাও আর আগের মতো পাই না, তার ওপর নাকে গ্যাস লেগে দম ফুলতে ফুলতে মরে যাই।' আরো অনেক মানুষের একই অভিযোগ শুনতে শুনতে পৌঁছলাম, দেলুয়া গোয়ালা পাড়ার ঘোষেদের কাছে – 'কারখানা হওয়ার পরে গরুর গাভিন হওয়া কমে গেছে। মাঠে ঘাস জ্বলে যাচ্ছে তাই ঘাস না পেয়ে গরুর দুধও কমে গেছে।'

এই সব অভিযোগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলাকালীন কোন্নগরের আলাপ হয়ে গেল শঙ্কর হালদার সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানলাম যে, চাঁদপুর ব্রহ্মপুরকে সুস্থভাবে বাঁচবার তাগিদে পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে ১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে তাঁরা গড়ে তোলেন গোবরা অ্যান্টি-পলিউশান ফোরাম নামের একটি সংগঠন, এবং এই সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁরা বারে বারে ডি. সি. সি. কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এলাকার পরিবেশ দূষণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে কারখানা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের প্রচুর চিঠি-পত্রের লেনদেনও হয়েছে। এই রকমই একটি চিঠি ওঁরা আমাদের দেখালেন। যে চিঠিতে ডি. সি. সি. কর্তৃপক্ষ ফোরামকে জানাচ্ছে যে, কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা জলকে তারা যথাসম্ভব শোধন করে পাশের জলাভূমিতে ফেলার চেষ্টা করে। তবে একথা সত্য যে, বৃষ্টির সময়ে সেই জল উপচে নিয়ে খালে পড়ে। এতে তাদের করার কিছু নেই (যদিও মানুষের শরীর স্বাস্থ্য ও তেল চটচটে কালো খালের জলই প্রমাণ করে যথাযথভাবে শোধন করা হয় না)। ঐ চিঠিতে তারা আরও জানিয়েছে যে, গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন ও দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল কর্তৃপক্ষ সব সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস নেয় না। ফলে উদ্বৃত্ত গ্যাস যখন এক কম্প্রেসর থেকে অন্য কম্প্রেসরে নেওয়া হয়, তখন যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে যায়। এতেও কারখানা কর্তৃপক্ষের করার কিছু নেই।

এর পরে ফোরাম বিভিন্ন সময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'স্টেটসম্যান', 'গণশক্তি' প্রভৃতি প্রথম সারির দৈনিক কাগজগুলোয় বহু লেখালেখি করেন, চিঠি-চাপাটি দেন। সরকারের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে জানানো বা কোর্টে আবেদন, ইত্যাদি করেও কোনো ফল তাঁরা এখনও পান নি। তবে এই মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য হলো, এখন আর আগের মতো রোজ সারাদিন ধরে কারখানা থেকে গ্যাস বেরোয় না। শুধু মাঝে মাঝে ভোর রাতে ঐ বিষাক্ত গ্যাস বেরোয়। আর তখন ঘুমের অবস্থায় মানুষ অসহ্য কষ্টে ছটফট করে। এ-ব্যাপারে ফোরাম একটি সময় তালিকা তৈরি করেছে। কোন্ তারিখে, কখন গ্যাস বেরোয় এবং তার স্থায়িত্ব কতক্ষণ থাকে এ-বিষয়ে ওঁদের সময় তালিকাটিও তাঁরা আমাদের দেখালেন না, কারখানা কর্তৃপক্ষ গ্রামের মানুষের কষ্টের কথা ভেবে গ্যাস ছাড়া কমিয়েছে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আসল কথা হলো, তাদের উৎপাদিত গ্যাস বিক্রির বাজার পাওয়া যাচ্ছে না, তাই উৎপাদন বর্তমানে কম হচ্ছে।

গোবরা অ্যান্টি-পলিউশন ফোরামের জনগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রভাত ভাট, প্রভাত কর্মকার, শঙ্কর হালদার প্রমুখ এঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল যে, দফায় দফায় বহু আলাপ-আলোচনা বা আবেদন-নিবেদনেও কোনো ফল না পেয়ে তাঁরা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বড় রকমের কোনোও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার সঙ্গে, গ্রামের মুষ্টিমেয় মানুষ কতদিন আর লড়াই চালাতে পারবে। ঠিক এই রকম সময়েই বালী, উত্তরপাড়া, ডানকুনি অঞ্চলের কতকগুলি বিজ্ঞান সংগঠনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় হয়। বালী খালের দূষণের কারণ খুঁজতে যাওয়া এই সব ছেলেমেয়েরা ফোরামের সদস্যদের কাছ থেকে জানতে পারে যে, শুধু খালই নয়, দূষিত হচ্ছে এলাকার বাতাস, মাটি, অন্দুর হচ্ছে মানুষের শরীর।

বর্তমানে এই সব বিজ্ঞান সংগঠনের সদস্যরা ফোরামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই দূষণ প্রতিরোধের জন্য কিছু কর্মসূচী হাতে নিতে চলেছে। ফোরামের ডাকে গত ১৫ জানুয়ারি (১৯৯৫) রিষড়া, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, ডানকুনি ও বালী অঞ্চলের বেশ কিছু বিজ্ঞানকর্মী গোবরাতে হাজির হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা থেকে একটা কথা স্পষ্ট বেরিয়ে আসে যে, এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও সংঘবদ্ধ কোনোও প্রতিবাদে তাঁরা সামিল হচ্ছেন না, কারণ ওঁদের ভয়-এর ফলে যদি ওরা কারখানা বন্ধ করে দেয়, তাহলে আবার নতুন করে তাদের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের এই ভীতির পরিপ্রেক্ষিতে, ঐদিন ঠিক

[এর পর ৭০ পাতায়→

বিধুবাবুর পাগলামি

চিত্রমিত্র

বাইরের গোলমাল কানে আসছিল। হঠাৎ এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক দরজা ঠেলে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকলেন। কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে নগরসংকীর্তনের ভঙ্গিতে দু-হাত ওপরে তুলে তিনি আওড়াচ্ছিলেন—'মার্কসবাদ লেনিনবাদ সর্বহারার মতবাদ'। সঙ্গে সম্ভবত তার স্ত্রী এবং আর একজন ভদ্রলোক তাকে সামলাতে পারছিলেন না। কোনরকম বাধা নিষেধের তোয়াক্কা না করে উনি সামনের চেয়ারটায় বসলেন। তারপর কমরেডের ভঙ্গিতে, হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এই যে কমরেড বিপ্লবের দীর্ঘজীবী হোক।' হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ওঁকে বসতে অনুরোধ করলাম। ওঁদের বাইরের রোগীরা অভিযোগ শুরু করলেন—ইনি লাইনে ছিলেন না, কোনদিন ঢুকে পড়েছেন—এঁকে যেন না দেখা হয়। অবশ্য উঠে ব্যবস্থা সামলাতে হলো।

গোলমাল শান্ত হতেই ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। উনি সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট এবং মুখে কৌতুকের ভাব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলতে শুরু করলেন, ওঁর স্ত্রী বাধা দিতে গিয়ে ধমক খেলেন। 'আপনার কত বয়েস? অনুমান হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাহলে নিশ্চয়ই দেশের জন্য সর্বত্যাগী দাদা বা অ্যাকাউন্ট খোলার দরকার হয়। আর সুযোগ পেলেই টাকা পয়সার হিসেব করেন কী কমল, কত বাড়ল, কী পেলাম কী হাতে গেল, কী চাইছি কী পাচ্ছি, কোথায় কারণা করে কাজটা মানেজ করা যায়, কার মনোরঞ্জন করতে পারলে কাজটা হবে, কাজটা হাসিল করতে গেলে কি কি কসরত করতে হবে, পরস্পরকে কিভাবে ফুসলানো যায়—।' বলতে বলতেই হো হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর বিকৃতস্বরে যেন অভিনয় উচ্চারণ করলেন :

> As flies to wanton boys
> Are we to the gods
> They kill us for their sport.

তার স্ত্রী তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। উপরন্তু তার স্ত্রীকে টেবিল থেকে পেপারওয়েট তুলে নিয়ে মাথায় মারার ভঙ্গিতে শাসাতে লাগলেন, 'খবরদার! একবারের জন্য বাধা দিলে মাথা ফাটিয়ে দেব। কোনো কথা বলবে না, চুপ করে বসে থাকো। আমাকে পাগল বানাবার চেষ্টা করছ? আমি জানি অনেকদিন ধরে তোমার এই চেষ্টা। ছেলেরা সবে সহজে কাজ হাসিল করে ফেলবে! অত সহজ নয়, এ ধান্দা সব বোঝে, সব বলতে পারে। কেন তুমি এখানে নিয়ে এসেছ জানতে পারি? তুমি জানো না ডাক্তার ভগবান ভূত হয়! তুমি আমার ভূত সাজাবে।' বলে হো হো করে আচমকা হাসতে শুরু করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে নাটক করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'কি মশাই, কি ভাবেন আপনারা নিজেদের। সব মহাপুরুষ? চুরি করেন না, অসভ্যতা করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না, শ্রদ্ধা করেন না, লোকের কাছে নিজের ঢাক পেটান না, লোককে ঠকান না, নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করেন না—অথচ দেখুন আপনারা ভদ্রলোক। কেমন সুন্দর দোমড়ানো পোশাক পরেছেন, পরিপাটি করে গুছিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শিখেছেন, কি করে কপট গাম্ভীর্য রক্ষা করতে হয় তাও শিখেছেন। এতেই আপনারা বিজয়ী, কেমন? এতদিন ধরে ঠকিয়ে এলেন বিশ্ব জুড়ে বেশ আমার মন ছিঁড়ে খাও, যার এখন চিৎকার করছেন তিমির থেকে বেঁচে ফেরো!' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে চোখ দুটো নাচাতে নাচাতে বলতে লাগলেন, 'কি, কতদিন দেখে এইসব লোক

অমকুনি কোন কথাটায় :

৭২ পাতার পর]

হয় যে, কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রথমেই এই মর্মে প্রচার করা হবে যে, কারখানা বন্ধ হোক এটা কেউই চায় না। কোম্পানি চায়, দূষণ আইন মেনে কোন ধোঁয়া তার উৎপাদন করুক। এলাকার মানুষের কষ্ট কমুক, ক্ষতিতে খাবার কমল, কমুক, খালে বিলে মাছেরা খেলা করুক। কাছাকাছি অঞ্চল থেকে যাওয়া এই সব বিজ্ঞানকর্মীরা বর্তমানে কোম্পানির পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে এই প্রচারাভিযান চালাবেন। আরো ঠিক হয় যে, এলাকার বাতাস ও জলের দূষণমাত্রা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাপানো হবে এবং কাছাকাছি অঞ্চলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কলকারখানায় কী ধরনের দূষণ ও দূষণরোধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তারো একটি তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

এই ছেলেমেয়েদের আশা যাওয়ার গ্রামের মানুষ নতুন করে প্রত্যাশা করতে শুরু করেছেন আবার সুস্থ শরীরের, সোনালী ধান ভরা মাঠের, সবুজের ছেয়ে থাকা দিনগুলির। তাঁরা বারে বারে আমাদের প্রশ্ন করেছেন 'গোটা মানুষই যদি মরে যায় তো কারখানা নিয়ে কি হবে? এমন ব্যবস্থা কি হয় না যেখানে কারখানাও থাকে, আবার মানুষও সুস্থ শরীরে বাঁচে?'

জানি না এই সব বিজ্ঞানমনস্ক ছেলেমেয়েরা এগুলো করতে পারবে, তবে গ্রামের মানুষের মতো আমরাও আশা রাখি এই সব সমাজ সচেতন কর্মীদের ওপর।

প্রতিবেদক : মধুমী ঘোষ

ঠকানো যাবনা। তারপর নিজেই উঠে পড়লেন, 'না, এসব কথা আপনাকে বলে কোনো লাভ নেই। প্রবের লিভারায় As flies...।' এইসব বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

এবার ওর স্ত্রী বললেন, 'সরি ডাক্তারবাবু। আপনি কিছু মনে করলেন না তো! আমার তো বলবার-করবার কিছু বাকি নেই তাই আপনার কাছে কথা চাইছি না। তিনমাস ধরে এইরকম ভুগছি।' 'উনি কি এই অবস্থায় বাইরে বসে থাকতে পারবেন?' 'হ্যাঁ তা পারবেন। আমার এক ভাই আছে, সে সঙ্গে থাকবে। ওকেই একমাত্র মানে। আমি বেশিক্ষণ সময় দেবো না। বাইরে রোগীরাও অধৈর্য হয়ে উঠেছে।'

ভদ্রমহিলার দিকে তখন তাকিয়ে দেখলাম স্পষ্ট। 'ঠিক আছে আপনার ভয় হবার কিছু নেই। আপনার অবস্থা আমি অনুমান করতে পারছি। তবে ওনার এই তীব্র অবস্থাটা বেশিদিন থাকবে না।' 'এত বাড়াবাড়ি সবসময় হয় না। মাঝে মাঝে বেশ ভালো থাকেন। হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে যান, তখন সামলে রাখা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তখন ওষুধও কাজ করে না। একবার ওষুধ খেয়ে দু-তিনদিন এমন রি-অ্যাকশন হয়েছিল যে ওষুধ দিতেও ভয় লাগে। হাত পা কাঁপতে লাগল, মুখটা বেঁকে গেল, মুখ দিয়ে লালা পড়ত, কিছু খেতে পারতো না—এইসব দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ওষুধ বন্ধ করে দিলাম।'

বিয়েবাড়ির খবর পাকা করেছে হবে। স্থানীয় এক স্কুলে ইংরাজি পড়ান। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পার্টি করেন। ছেলেপিলে নেই সুতরাং তাদের বাড়িই হয়ে উঠেছিল পার্টিঅফিস। 'কি বলব ডাক্তারবাবু, আজ তিনবছর ধরে পার্টি করছি। নিজের বলে কিছু জানি না। একটা ভাড়া বাড়িতে থাকি। নিজেদের একটা ফ্ল্যাট হবে বলে ওদের পার্টিরই একটা সংস্থায় কিছু টাকা জমা রেখে। তাতে আমাদের যেক সম্বল যা ছিল সব দিয়েছিলাম। সেই টাকাটা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নানান অজুহাত দেখিয়ে। কিভাবে যে টাকাটা উধাও হয়ে গেল তাও জানতেও পারলাম না। আমাকে উনি কিছু বলেন নি। এই ধাক্কাতেই উনি কেমনতর হয়ে গেলেন। এর আগে ছোটোখাটো নানান ব্যাপার লেগেই ছিল। এখন তো দুজনেই পারছেন সবাই নিজের নিজের। আর এসব উনি একেবারেই দেখতে পারেন না। বরাবরই উনি একটু জেদী, একরোখা আর ঠোঁটকাটা। কাউকে তোয়াক্কা করেন না। যাঁদের সঙ্গে মুখের সামনে কাট ক্যাট করে বলে দেন। এর জন্য লোকে যে খুব ওকে ভালোবাসে তা নয়। দেখুন, এমন অনেক কথা আছে তা সবাই জানে কিন্তু যাদের হতে হবে এই সংস্কারে আমরা একে অপরকে সে কথা বলি না। উনি সেসব মানতেন না। নিজের ব্যাপারেও উনি খুব পরিচ্ছন্ন লোক যাতে কেউ কোনো কথা না বলতে পারে। আর আজকাল তো জানেন সব কেমন শিথিল হয়ে গেছে। এসব নিয়ে সবার সাথে ওঁর ঝগড়া। আমি সামলাই, কিন্তু কত সামলাব! সব জায়গায় তো আমি থাকি না ওঁর সঙ্গে। প্রায় প্রতিদিনই দু-তিন পাড়ায় না পাড়ায় সাথে ঝগড়া হয়েছে। বুঝতে পারি একসময় সবাই ওঁকে এড়িয়ে চলেন এবং উনি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আর এই বিচ্ছিন্ন হওয়াটাও ওঁর ভালো লাগে না কেন না পার্টিকে, আদর্শকে, খুব ভালোবাসেন। তাই এমনও দেখেছি দু-চারদিন সে রাগ করে চুপচাপ বসে থাকবেন এমনও নয়। আমাকে ব্যস্ত করে তুলবেন কেন এটা হচ্ছে না, কেন ওটা হচ্ছে না, কেন কেউ তার সাথে যোগাযোগ করছে না। ওনাকে বোঝাই, যে যা করছে করুক, প্রয়োজন হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসবে। এসব কথা শুনলে তবে না। আমাকেও গালিগালাজ করেন। তবে মনটা খুব সাদা। কোথাও কোনো প্যাঁচ নেই। আর কারোর প্যাঁচ পছন্দও করেন না।' 'ওনার পরিবারে কি কোনো মানসিক রোগের ইতিহাস আছে?' একটু চিন্তা করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'পরিবার থেকে তো অনেকদিন বিচ্ছিন্ন এই পার্টির কারণেই। শুনেছি নাকি ওনার মায়ের ডিপ্রেশন না কি রোগ ছিল, কুঁয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মারা গিয়েছিলেন। এখন এই রোগী নিয়ে আপনিই বলুন ডাক্তারবাবু কী করি।'

'পার্টি ছাড়া জীবনের অন্য কোনো দিক আছে যার মধ্যে জীবনের আনন্দ বা অর্থ খুঁজে পেতে পারেন?' ভদ্রমহিলা নড়েচড়ে বসলেন, 'অন্য আর কি করবেন। স্কুলে ক'টা ক্লাশ নেওয়া আর বাড়িতে এসে কাগজ পড়া, বই পড়া। বাকি সময়টা বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ান।' 'এই যে আপনাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই এর জন্য কোনো অসুবিধা হয় না?' 'অসুবিধা আমি তো কিছু বুঝি না। দিনগুলো কেটে যায়। এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। ছেলেমেয়ে থাকলে হয়তো জীবনটা একটু অন্যরকম হতো। একটা ছেলেমেয়ে হাতে হয় একথা উনি খুব বলতেন। যে যেখানে যেতে বলেছেন, গেছেন। পয়সাও খরচ করেছেন। কারোরই কোনো দোষ পাওয়া যায় নি অথচ ছেলেমেয়ে তো হলো না। উনি মাঝে মাঝে বলেন। তখন আমার মনটাও খারাপ হয়। উনি একবার দত্তক নেবার কথাও ভেবেছিলেন—সবকিছু ঠিকঠাক। আমিই শেষপর্যন্ত বাধা দিলাম। নিজেদের চালচুলো নেই, বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াই, আর একটা ছেলেকে নিয়ে এসে কষ্ট দেওয়া।' 'ওনার কোনো হবি-টবি নেই?' 'সেও অদ্ভুত। কখনও বলেন না যে, একটা সিনেমা থিয়েটার দেখব, কি কোথাও বেড়াতে যাব, কি পাঁচজনের সাথে হৈ হৈ করব। খালি, তাতেও মনটা একটু হালকা হয়। আমি এসব করতে পারলেই বাঁচি না। কিন্তু কেউকে বলে দেখলেই গালাগালি দেবেন—পেটিবুর্জোয়াসুলভ আচরণ। অথচ সবাইকে দেখছি এরই মধ্যে ওরা ভাবছে প্রমাণ করছে, দল-আন্দোলন দেখছে, ছেলেমেয়ে মানুষ করছে—সব হিসাবই ঠিক রাখছে।'

'আচ্ছা, আপনাদের কি মনে হয় না এ-ধরনের জীবনযাপনের একটা ক্লান্তি আছে?' তিনিই বললেন। 'তবে ক্লান্তি নয় শান্তিকতা, এর বেশ'তোষ। মনে হয় নি যে তা নয়, তবে তেমন তীব্র নয়। অভ্যাসটা মানিয়ে নিতে হয়েছে। ভেবেছি এটাই ভালো। মানুষকে জড়িয়ে বেঁচে থাকা, তাদের আপদে-বিপদে পাশে থাকা। এরমধ্যে একটা গৌরব আছে, আত্মতৃপ্তি আছে, উত্তেজনা আছে।' 'তাই দিয়ে কি সারাজীবন চলে?' 'এতদিন তো চলছিল। এই বদলে না ওনার এই সমস্যাটা না হলে আমি কখনই চিন্তা করতাম না যে

এছাড়া জীবনের অন্য কোনো দিক থাকার প্রয়োজন হয়। আপনি কথাটার মধ্যে যা বোঝাতে চাইছেন সেটা যে ভাবি নি তাও নয়। তবে এও ভেবেছি, আশ্রমের আশ্রমিক বা পরিব্রাজিকাদের তাহলে জীবন কাটে কি করে? তারা তো জীবনের রঙগুলো পুরোপুরি দিক বন্ধ করে দিয়েছেন। সে তুলনায় আমরা তো তাও সংসার করছি। তারাও সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষিত মার্জিত। নিজের নিজের কাজে যথেষ্ট দক্ষ। কি সুন্দরভাবে আমায় ওরা সারাজীবন এভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে দেন। বড় বড়দের গোলমাল কিন্তু নিশ্চয়ই হয় না এভাবেই।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম। যে জীবনটা বিদ্যুৎবাবু এতদিন চালিয়ে এসেছেন ঠিক সেইভাবে কি উনি নিজেকে চালাতে পারবেন? মনে হচ্ছে এই ক্লান্তি অবস্থাটা ওঁর তাড়াতাড়ি কেটে যাবে, কিন্তু তারপরে উনি যখন পুরোনো জীবনে ফিরে যাবেন, তখন কি আগের মতো আবার মানিয়ে নিতে পারবেন। এও হতে পারে ওঁর মানসিক গঠন এমনই, যে অবস্থাতেই থাকুন ওনার এ-সমস্যা হতোই। সেক্ষেত্রে পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। অন্যদিকে জীবনের পরিবেশ যদি ওঁর এই অবস্থার জন্য কিছুমাত্র দায়ী হয় তাহলে আপাতদৃষ্টে হলেও পুনর্বাসনের অসুবিধা হবে। পরিবর্তে যদি ওঁর নিজের জীবনের কোনো ছোটো সজীব অংশ থাকে সেটাকে নাড়াচাড়া করে উনি জীবনের আনন্দ, অর্থ, উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি স্বামীজীদের যে জীবনের কথা বললেন, তা সব সময়েই ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে। সেখানে ধর্মের একটা অনির্দিষ্ট শাসন ও ভয় রয়েছে, যা সকলের 'আদর্শ' দিতে পারে না, ফলে কষ্ট পায়। ধর্ম প্রার্থনার নামে, আত্মনিবেদনের নামে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকে।' 'সব মানছি ডাক্তারবাবু, কিন্তু ও ভালো হবে তো। আমি তো দেখে ভয় পাচ্ছি। নানান জন নানান কথা বলছে। ও যদি চাকরি না করতে পারে তাহলেও তো চলবে না। কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'না না অত ঘাবড়াবার কিছু নেই — ভালো হবেন নিশ্চয়ই। একটা সমস্যা নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে, তার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। আপনারাও সাহায্য করবেন। তবে সুস্থ হয়ে উনি আবার তো সেই পরিবেশেই ফিরে যাবেন। শুধু বাড়ি আর আপিস এই নিয়ে যদি উনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তো খুবই ভালো। ওনার জীবনের সমস্যাও অনেক কমে যাবে। কিন্তু তা কি উনি পারবেন। এত বছরের বড় পরিবার নিয়ে চলতে উনি অভ্যস্ত হয়েছেন। সেই জীবনেই উনি বাঁচার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করবেন। আবার ধাক্কাও পাবেন যখন অভ্যস্ত হবে অনভ্যস্ত হবে। তখন এই কষ্টেই ঘুরে ফিরে আসতে পারে।'

এবার মনে হলো স্বর্ণরেখা দেবী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, 'তাহলে তো বেশ সমস্যার মধ্যে পড়লুম। আপনি যা বলছেন তাও সত্যি। ওকে তো আটকে রাখতে পারব না: ও বাইরের কাজে যাবেই।' 'আচ্ছা আপনারা সবাই মিলে আলোচনা করে ওঁর জন্য এমন কিছু নির্দিষ্ট করেন যাতে ব্যবস্থা করা যায় না, যাতে ওঁর আঘাত পাবার ঝুঁকি কম! কাজের সাথে তেমন ইনটারাকশন হলো না, উনি নিজের মতো কাজ করে গেলেন।' 'সে ব্যাপারে তো এখনই কিছু আপনাকে বলতে পারছি না। বাড়ি সবার সাথে আলোচনা করে দেখি।'

এমন সময় বিদ্যুৎবাবু আবার ঢুকলেন। সামনে এগিয়ে এসে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন, 'কি মশাই, আপনি যে আমার স্ত্রীর সাথে প্রেম জমিয়ে ফেললেন। কথা তো আপনাদের শেষ হয় না। ভালো, ভালো, আপনিও পরখ করে দেখুন। তবে আমি বলে রাখছি, কিছু পারবেন না। দেখছেন তো কেমন হাড়জিরজিরে চেহারা। কোন অ্যাপিল নেই — পার্টি সব রসকষ শুষে নিয়েছে। অবশ্য পার্টি সুদ্ধ বৌদি সব সমান। তা যাক্‌গে, কি কথা হলো? অসুখ সারবে তো। সেটা শ্রীমতীকে আশ্বস্ত করুন। ওনার তো এই নিয়ে রাতে ঘুম নেই। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, 'নারায়ণ'। একবার একটা নারায়ণ ধরতে পারলে বাকি জীবনটা ঠিক মেরে দেব। কি শান্তি-ওম্‌-শান্তি। তুমিই সব নারায়ণ, তুমিই সব। তোমারই তো সব মায়া প্রভু, তোমারই তো সব মায়া। নইলে এ-জগৎ সংসারে যন্ত্রণা ছাড়া কিছু আছে? কোথায় আছি জানি না, কি চাই জানি না, কোথায় যাবো জানি না, কি জানি জানি না, কি উচিত জানি না, কি ভালো জানি না, কি মন্দ জানি না। তা এসব দুর্ভোগের আপনার থেকে কে নারায়ণ ছাড়া। মন প্রাণ সঁপে দিন দেখবেন সব ঠান্ডা — ওম্‌ শান্তি, বলতে বলতেই আবার সেই নগর সংকীর্তনের ভঙ্গিতে, 'মার্কসবাদ, লেনিনবাদ সর্বহারার মতবাদ' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

স্বর্ণরেখা এখন অঝোরে কাঁদছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলেন, 'কী মানুষকে দেখেছি, আর কী দেখছি। লোকে ওকে কত সম্মান করেছে শ্রদ্ধা করেছে। আর এখন মুখে যা আসছে যা খুশি তাই বলছেন।' তাকে সান্ত্বনা দিই — 'আপনি এতো উতলা হবেন না। উনি তো আর সুস্থ থাকার এসব ঘটনা করছেন না, সেটা সবাই বোঝে। ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর তার জন্য আপনার সাহায্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।'

অনুগ্রহ করে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করবেন

গ্রাহকপদ নবীকরণের সময় □ যে কোনো অভিযোগের সময়

পত্রিকার মোড়কে (wrapper) গ্রাহক নম্বর লেখা থাকে প্রতি সংখ্যাতেই

কী করব, কোথায় যাব

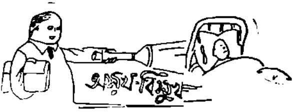

রোগ শোক-অসুখ-আপদ আমাদের নিত্যসঙ্গী। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন চিকিৎসা আর ওষুধ-পথ্য দুর্মূল্য হচ্ছে। বিশেষ করে মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষ অসুখে পড়লেই অসহায়, দিশেহারা বোধ করেন। একদিকে রোগব্যাধি ও চিকিৎসার জটিলতা বেড়েছে, তারই সঙ্গে বেড়েছে নিরাময়-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। হাজারো প্রশ্ন, হাজার কৌতূহল আর আকুল অনুসন্ধানে বিব্রত মানুষের হাতে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ, ব্যাখ্যা, আর সহায়ের হদিশ দিতে পারলে অনেকখানি সহায়তা হবে বলে আমরা মনে করি। …তাই একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কলম থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য, ব্যাখ্যা, হদিশ জেনে নেব আমরা ধারাবাহিকভাবে। গত সংখ্যায় ছিল 'হাইপারটেনশন'। এ-সংখ্যায় থাকবে 'বুকে ব্যথা বুক ধড়ফড়'।

সম্পাদকমণ্ডলী

৬. বুকে ব্যথা বুক ধড়ফড়

যে রোগগুলি আমাদের পরিচিত এবং অনেকের সর্বক্ষণের সঙ্গী, তার অন্যতম হলো বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় বা বুকের মধ্যে অস্বস্তি। এদের বড় কারণ বুকের বাঁদিকে হৃদযন্ত্রের উপস্থিতি। একথা প্রায়ই শোনা যায় – উনি 'বুকের বাঁদিকে ব্যথা' বলে বুক চেপে ধরে বসে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। হৃদযন্ত্রের অবস্থান সচেতন করলে রোগীর বুকে ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। তাই বুকের ব্যথার জন্য যেমন সতর্ক হওয়ার দরকার হয়, তেমনি আবার অযথা সচেতন হলে একরাশ দুশ্চিন্তা এসে আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। প্রয়োজন অনুযায়ী সতর্ক হলে অনেক কঠিন রোগীকে আমরা বাঁচাতে পারি বা তার জীবন প্রলম্বিত করতে পারি। আবার আগের থেকে সাবধান হলে রোগের খরচও অনেক কমে যায়। তাই বুকে ব্যথা হলেই সর্বতোভাবে জানার চেষ্টা করতে হয় সেটা হৃদযন্ত্রের রক্ত-সঞ্চালনের গোলমালের জন্য হচ্ছে কিনা।

বুকে ব্যথার সম্ভাব্য কারণ

১. হৃৎপিণ্ড ও তার রক্ত সঞ্চালন : করোনারি ধমনী, ফুসফুস ধমনী, ভাল্‌ভের অসুখ।

২. ফুসফুস : নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, নিউমোথোরাক্স, প্লুরিসি।

৩. খাদ্যনালী ও অন্ত্র : খাদ্যনালীর অসুখ, পেপটিক আলসার, পিত্তথলির অসুখ, অগ্ন্যাশয়ের অসুখ।

৪. বক্ষপিঞ্জর : আঘাত বা রোগজনিত বাত, অস্থিকোষের বাত, মাংসপেশির টান, ইনফেকশনজনিত ফোলা বা টিউমার।

শরীর পরিশ্রম করার জন্য দেহকোষের, বিশেষত মাংসপেশির, অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায় এবং অক্সিজেন রক্ত মাংসপেশী টেনে নেয়। ফলে একদিকে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধির জন্য হৃৎপিণ্ডকে বেশি কাজ করতে হয়, অন্যদিকে তার চাহিদা অনুযায়ী সে রক্ত কম পায়। তবু সুস্থ হৃৎপিণ্ড এইসব অবস্থা মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যখন চর্বি জাতীয় পদার্থ পড়ে, হৃৎপিণ্ডের ছোটো ছোটো ধমনীগুলি (যারা হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন করে) সরু হয়ে গেছে, তখন প্রয়োজনের থেকে কম রক্ত পাওয়ায় হৃৎপিণ্ড অসুস্থ হতে থাকে এবং হঠাৎ কোনো চাপের মধ্যে পড়লে (অতিরিক্ত পরিশ্রম, ভয়, উদ্বেগ) হৃৎপিণ্ড রক্ত সঞ্চালনের গুরুতর গোলযোগ সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করে যারা মারা যান তাদের প্রায় সবারই মৃত্যুর কারণ এটা। তবে এই ধমনী সরু হওয়ার সমস্যা না থাকলে কখনই শুধুমাত্র মানসিক কারণে কারোর হার্ট অ্যাটাক হয় না। রক্তসঞ্চালনের গোলমাল ছাড়া হৃদযন্ত্রে গোলমালের কারণগুলি হলো এর মায়োপ্যাথি বা জন্মগত অসুখ।

কারোর বুকে ব্যথা শুরু হলে এ-সম্পর্কে রোগের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে জানা দরকার। যেমন, আগে কখনও এমন ব্যথা হয়েছে কি-না, ঠিক কোথায় ব্যথা হচ্ছে, ব্যথা অন্য কোথাও সরে যাচ্ছে কিনা, ঠিক কী ধরনের ব্যথা (তীব্র সূচের মতো, কি ভোঁতা, কি চাপ ধরা), কতক্ষণ থাকে, কী করলে ব্যথা কমে বা কী করলে বাড়ে। শ্বাস গ্রহণ বর্জন-এর সাথে ব্যথা সম্পর্কিত থাকলে আমরা এর জন্য প্লুরা, পেরিকার্ডিয়াম বা বুকের হাড়ের কারণে প্রশ্ন করে নিই। অন্যদিকে হঠাৎ পরিশ্রম যেমন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা, দৌড়ে বাস ধরতে গিয়ে ব্যথা থাকলে এবং বিশ্রাম নিলে কমে গেলে এর প্রধান কারণ মনে করা হয় 'এনজাইনা' বা হৃদযন্ত্রে রক্তসঞ্চালনের

গোলমাল। অবশ্য অনেকসময় বাধার দরুনও কারণগুলি দূর হওয়ার পরে সামান্য অস্বস্তি নিয়েও দূর হতে পারে। অনেকসময় পেটের উপরিভাগ পরীক্ষা করে বাধার কারণ হিসাবে পেপটিক আলসার বা পিত্তথলির গোলমাল ধরা যায়।

বুক ধড়ফড়

বুক ধড়ফড় (palpitation) আমাদের পরিচিত অস্বস্তির মধ্যে একটি। একে বলা যেতে পারে হৃদস্পন্দনের সচেতনতা এবং স্পন্দনের হার, ছন্দ বা পুরো হৃদপিণ্ডের কাজ বেড়ে যাওয়ার এর উৎপত্তি হয়। বুক ধড়ফড় কখনই কোনো শারীরিক রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ নয়। এমন কি কারোর 'বুক ধক ধড়ফড় করছে' এমন প্রধান অভিযোগ হলেও খুঁজে দেখতে হয় সত্যিকারের কোনো শারীরিক গোলযোগ আছে কি-না। অন্যদিকে দেখা যায় যে, ব্যক্তির দুশ্চিন্তা হচ্ছে এবং তার মৃত্যু হৃদযন্ত্রের গোলযোগের জন্য হতে পারে বলে মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তার বুক ধড়ফড় প্রধান কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোনো ব্যক্তিকে যদি বলা যায়, তার হৃদপিণ্ডের অসুখ আছে তার বুক ধড়ফড় বেড়ে যেতে পারে। কারণ এই উদ্বেগ থেকে তার স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কাজ শুরু করে, ফলে হৃদপিণ্ডের কাজকর্ম বেড়ে যায়।

'বুক ধড়ফড়'কে রোগী বিভিন্ন নামে অভিহিত করতে পারে এবং সবক্ষেত্রেই এমন অভিযোগ থাকতে পারে যে, হৃদপিণ্ড ঠিকমতো চলছে না। তবে সবাই যে একই ধরনের অভিযোগ করেন এমন নয়। যেমন, খুব গুরুতর হৃদপিণ্ডের গোলযোগ হলেও রোগী ঠিকমতো বুঝতে পারেন না, আবার সামান্য দু-একবার হৃদস্পন্দনের ছন্দের গোলমাল রোগীর কাছে ভয়াবহরূপে দেখা দিল। সাধারণত উদ্বেগ দুশ্চিন্তা থাকলে এসব আরও বেশি প্রকাশ পায়। আর রাতে যখন দুর্‌দ্‌ নিজের সঙ্গে থাকতে হয় তখন এসব বেড়ে যায় নইলে সারাদিনে কাজকর্মের মধ্যে এসব তেমন অস্বস্তিতে ফেলে না। যাদের বহু বছরের হৃদ্‌যন্ত্রের গোলমাল থাকে তারা অনেকক্ষেত্রে এসব গোলমাল শরীরের সাথে মানিয়ে নেয়; দেখা গেছে ধারাবাহিকভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের হার বা ছন্দের গোলমাল থাকলে রোগী অনুভব করতে পারে না। অন্যথায় হঠাৎ করে হৃদ্‌স্পন্দনের সমস্যা হলে তা সাথে সাথে ধরা পড়ে। এইসব হঠাৎ করে তৈরি হওয়া হৃদ্‌স্পন্দনের সমস্যায় রোগীদের বুক ধড়ফড় বেশি হয়। অনেক সময় হৃদযন্ত্রের গোলযোগের কথা জানতে পারলেও রোগীর বুক ধড়ফড় করতে পারে, উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার জন্য। তখন চিকিৎসকেরও বুঝতে অসুবিধা হয়। অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের গোলযোগ থাকলেও চিকিৎসকদের চেষ্টা থাকে এ-সম্পর্কিত উদ্বেগ দুশ্চিন্তা যেন কমানো যায়, তাহলে রোগীর কষ্টও অনেক কম হয়।

বুক ধড়ফড়ানি চিকিৎসায় নিরাময় হওয়া কেন শক্ত, বিশেষত তা যদি উদ্বায়ু রোগের কারণে হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে রোগীকে ঠিকমতো পরীক্ষা করে আশ্বস্ত করতে পারলে তার কষ্ট লাঘব হয়। কখনো কখনো সম্মোহন-অভিভাবন চিকিৎসা (hyprotic suggestion therapy) প্রয়োজন হয় দেয়। তবে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুক্ষেত্রে বুক ধড়ফড়ানি থেকেই যায় এবং কোনো শারীরিক ক্ষতি না হলেও রোগীর কষ্ট বা অস্বস্তি অব্যাহত থাকে।

বুকের ব্যথা, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং সাধারণ কতকগুলি নিয়ম মেনে চললে ভালো ফল পাওয়া যায়।

১. উচ্চতা অনুপাতে দেহের ওজন যেন বেশি না হয়, প্রয়োজনে ওজন কমানোর জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।
২. ধূমপান, মদ্যপান বা যে কোনো ধরনের নেশার জিনিস পরিহার করা।
৩. নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা, বিশেষত যাদের রক্তচাপ বেশি থাকে।
৪. রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
৫. অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ দুশ্চিন্তা পরিহার করা এবং প্রয়োজনমত শরীর-মন হাল্কা করা বা 'রিল্যাক্সেশন' প্র্যাকটিস করা।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

পত্রিকার নিয়মাবলী

পত্রিকার প্রতি কপি ৫ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক) ৬০ টাকা। যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া চলে। গ্রাহকদের সাধারণ ডাকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্টদের VP-তে পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্সি-জমা (ফেরতযোগ্য) লাগে ৫০ টাকা। কমিশন – ২৫% (১০০ কপি নিলে ৩৩⅓%)। ডাক খরচের অর্ধেক এজেন্টকে বহন করতে হয়।

টাকা UTSA MANUSH-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ অথবা M.O. করে পাঠাবেন। কলকাতার বাইরের অঞ্চলের চেক পাঠাবেন না। M.O. ফর্মের নিচে কুপনে নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর অবশ্যই লিখবেন।

ঠিকানা : সম্পাদক, উৎস মানুষ
বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৬৪

এই সংখ্যায় থাকছে 'ঈশ্বর বিশ্বাস' নিয়ে আপনাদের বিভিন্ন মতামত। আগামী এপ্রিল '৯৩ সংখ্যায় থাকবে 'বাসে-ট্রামে লেডিস সিট' নিয়ে আলোচনা।

১০. ঈশ্বর বিশ্বাস ও আপনার বিশ্বাস

নির্মলবাবু সৎ, ধর্মনিষ্ঠ, ভদ্র মানুষ। এককালে বামপন্থী দলের সক্রিয় সমর্থকও ছিলেন, এখন ছাড়িয়া দিয়েছেন। চারপাশের অসততা আর দুর্নীতি দেখে মন খারাপ করেন, কিন্তু হতাশ হয়ে পড়েন না। সুযোগ পেলে লোকের উপকারও করেন।

নির্মলবাবু পুজো-আচ্চা করেন না, দেব-দেবী মানেন না, কিন্তু ঈশ্বর মানেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি নয়, ঈশ্বর এক শক্তির নাম—যে শক্তি জগতের সর্বত্র আছে, অনু-পরমাণুতে শক্তিশালী অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। নির্মলবাবু কখনোই মনে করেন না ঈশ্বরই সব করে দেন; আত্ম-বিশ্বাস ছাড়াও না দেখিয়ে তিনি কখনো কোনোভাবে ধর্ম নিয়ে তর্ক করেন না, কিন্তু সব অভিজ্ঞতায় পরিণত নির্মলবাবু দেখেছেন এই ঈশ্বর বিশ্বাস অনেক জোর অনেক শান্তি দেয়। এমনকি তিনি এটাও বলেন যে—ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে অনেক কুকর্ম, অনেক অনাচার চলতে পারে, কিন্তু তাতে দুর্নীতিমুক্ত সেই মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্য 'পাপকাজ' করতে ভয় পায়, মানুষের প্রতি ভালো-মন্দ দেখায়।

আপনি কী বলেন? আপনি কি নির্মলবাবুর সঙ্গে একমত? হলে বা না-হলে—কেন?

ম তা ম ত

আমি নির্মলবাবুর সহিত সম্পূর্ণভাবে একমত নই; আংশিকভাবে একমত পোষণ করি। সৎ এবং প্রগতিশীল মানুষ হইলে যে-কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সমর্থক হইয়া সততা এবং প্রগতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব নহে, অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের সক্রিয়, প্রাধান্য এবং কর্তৃত্ব প্রকাশে দলের নির্দেশিত পথে পথ চলিলেও সততা ও প্রগতিশীলতা বাস্তবায় হয় কতটুকু। সেই কারণেই 'চারপাশের অসততা আর দুর্নীতি দেখে মন খারাপ করেন'—নির্মলবাবু ভদ্রলোকের ধর্মবোধ আছে, তাই ধর্মবোধের প্রাধান্য। বাহ্যাড়ম্বরে নয়, অন্তরে ঈশ্বর ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে নিজেকে জাহির করে নেওয়ার প্রয়োজন হইত না। যে ব্যক্তি ধর্মকে বিশ্বাস করে, ধর্ম মানিয়া চলে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সেই ব্যক্তি ধার্মিক প্রগতিবাদী, সৎ মানুষ হইতে হইলে বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক হইবার প্রয়োজন হয় না, প্রকৃত ধর্মবোধে উজ্জীবিত হইলে চেতনায় যে বিকাশ ঘটে তাহাই সত্যনিষ্ঠ পথে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে—।

নির্মলবাবুর রাজনৈতিক 'প্রকৃত' জ্ঞান এবং প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসাবে জ্ঞান—এই উভয়েরই গভীরতা কম। প্রগতিবাদী সত্যনিষ্ঠ রাজনীতি করিতে হইলে নিজ জীবনে সততা, উদারতা, আত্মত্যাগের মানসিকতা থাকা দরকার। আর এই সকলই গড়িয়া ওঠে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মবোধ প্রত্যয়কে কেন্দ্র করিয়া। ধ্যান-তপস্যা 'এবং' কে করা চলে, কিন্তু ঈশ্বরকে মানিয়া দেবদেবতা না মানা সম্ভব কি? অ্যাটমের কথা ভাবিলেই বিপুল অসম্ভব শক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে বোঝা যাইবে। বিপুল শক্তি যদি সংক্ষেপে আবদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে বিপুল শক্তি নষ্ট হয় না, খণ্ডিত হয় না। শুধু প্রয়োজনে শক্তি-চরিত্রের কিছুটা পরিবর্তন হয় মাত্র। ঈশ্বর এবং দেবদেবতা ঠিক অনুরূপ সত্য। ঈশ্বর কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি নয়, কিন্তু নির্দিষ্ট মূর্তিতে ঈশ্বর খণ্ডিত হন না।

'ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে অনেক কুকর্ম, অনাচার চলতে পারে'—শুধু তাহা কেন? চারিপার্শ্বের অসততা ও দুর্নীতি যাহা এক শ্রেণীর ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী ধর্মহীন নীতিবাদী দ্বারা সৃষ্ট তাহা দেখিয়াও তো মন খারাপ করে।

দুর্নীতিগ্রস্ত-সম্পন্ন মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসী হইতেই পারে না। মুখে ঈশ্বর বিশ্বাসী থাকিয়া ভান করিতে পারে মাত্র। পাপকর্ম বিরত থাকিবার জন্য ভয় একটি উপাদান সত্য। কিন্তু অন্যদিকেও ধর্মবিশ্বাসী মানুষের অন্তরে একটি সত্যনিষ্ঠ নীতি, উদারতা আপনা হইতেই মানার মধ্যে প্রোথিত হয়। তাই দয়া, মায়া, স্নেহ-প্রীতি পরোপকারিতা, উদারতা, ক্ষমা, ত্যাগ-তিতিক্ষা কোনো বামপন্থী-ডানপন্থীর বিষয় নহে। ইহা সকলই ধর্মবোধের কারণে সম্ভব হয়।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী
শিমুরালি, নদীয়া

□□

এতকাল বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল নির্মলবাবুর সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি না। একসময় তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আজকের তথাকথিত বামপন্থীদের কার্যকলাপ তাঁকে নিরাশ করেছে বলেই তিনি বামপন্থার আদর্শ থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছেন। ওঁর এই আত্মসমর্পণ আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় বলেই মনে করি। সেই পুরোনো উদাহরণ দিতে হয়, ছুরি দিয়ে মানুষ খুন হয় বলেই ছুরি দিয়ে ফল তরকারী কাটা যাবে না এমন কথা বিশ্বাস করি কি করে? কোনো বামপন্থী দল বামপন্থা বিচ্যুত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ শুরু করলে আমার ক্ষোভ কিংবা রোষ অবশ্যই ঐ রাজনৈতিক দলের ওপর, বামপন্থার ওপর নয়। নির্মলবাবু আজ রাজনীতির আঙিনা থেকে মুখ ফিরিয়ে আপোষের রাস্তায় হাঁটতে চাইছেন। আমি এই পলায়নবাদী মানসিকতার সহযোগী হতে পারব না। সমাজের সার্বিক পতন দেখে কেউ যখন নিজেকে ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে নিজের মতো বাঁচতে চেষ্টা করে তখন তাকে সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলাই উচিত কাজ বলে বিশ্বাস করি। সুতরাং নির্মলবাবুকে সমর্থন করা যায় না।

নির্মলবাবু দেবদেবী, পুজো ইত্যাদি মানেন না। এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ভেবে বসে আছেন। তিনি জানেন ঈশ্বর ওঁর কোনো ক্ষতি করে দেবেন না। শুধু 'পাপকাজ' করা থেকে বিরত থাকলেই যদি ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতে হয় তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। মানুষ নিজেকে এমন নীতিনিষ্ঠ মানসিকতায় স্থির রাখতে পারে যে নিজের বিচারবুদ্ধির তাড়না থেকেই অনৈতিক কাজ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিতবোধ করতে পারে। সেজন্য ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব তৈরি করে মানসিক স্থিতাবস্থার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

নির্মলবাবুদের মতো লোকজন অত্যন্ত বাস্তব এবং এমন লোকের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। আমাদের উচিত এঁদেরকে ঠিক মতো বুঝিয়ে যথার্থ বামপন্থার রাস্তায় নিয়ে আসা। কেউ একক চেষ্টায় দুটিকয় ভাল কাজ করলেই সমাজের সার্বিক পরিবর্তন আনা যায় না। নির্মলবাবু মানসিকতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তথাকথিত সমাজসেবামূলক কাজে সক্রিয়তা দেখান। কিন্তু সামগ্রিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ছাড়া উদ্দেশ্যহীন এমন ভালো কাজ মানুষের দীর্ঘস্থায়ী কোনো শুভ করতেই পারে না। সুতরাং ব্যক্তিগত পুণ্য সঞ্চয়ের মানসিকতা-প্রসূত দু-চারটে সেবামূলক কাজের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো সমর্থন নেই।

নির্মলবাবু জানেন, ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই কুকর্ম দুর্নীতি কিংবা অনাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ওঁর ভূমিকা কী? কিছুই নয়। তিনি শুধু পরিবারে ব্যক্তিগত ঈশ্বরে আস্থা রেখে দু-চারটে ভালো কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু ওঁর চারদিকে ঈশ্বর ব্যবসায়ীদের বিরোধিতা করাও কি ওঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না? তথাকথিত বামপন্থীদের দুর্নীতি যদি ওঁকে বামপন্থার ব্যাপারেই বীতশ্রদ্ধ করে তোলে তবে তো এইসব অনাচারী ঈশ্বরবিশ্বাসীদের কার্যকলাপ ওঁকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী এবং প্রতিবাদী করে তুলবে। তা কিন্তু হচ্ছে না। তাই নির্মলবাবু স্ববিরোধিতায় ভুগছেন। এমন মানুষকে সমর্থন জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নির্মলবাবুদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে বিষয়টি পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে আমার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে।

প্রদীপ সামন্ত
গড়িয়া, কলকাতা

□□

ঈশ্বর কথার অর্থ কাছে আমরা বুঝি অলৌকিক কোনো শক্তি যে শক্তি আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান না হলেও যে-কোনো প্রকারে আমরা সেই শক্তির দ্বারা উপকৃত হই সেটা সশরীরে না হলেও মানসিকভাবে। তার অর্থ এই নয় যে দৈনন্দিন প্রাত্যহিক কর্মের সাথে সাথে বারে বারে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানানো বা আজ সোমবার থেকে ঠাকুরের ব্রত বা আজ বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর উপবাস — আজ শনিবার আমার মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত। খুব দুপ-দুপো ভেজে গলায় কাপড় জড়িয়ে দুবেলা গৃহদেবতার প্রতিকৃতির সামনে বসে থাকা ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়। শারীরিক অসুস্থতার থেকে মায়ের মন্দিরের জল এনে খাওয়ানো — এতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের নামে অসুস্থতার মাত্রা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিন্তু আজকাল ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসের নামে যে লৌকিক প্রচলন — যেমন জোর জুলুম করে চাঁদা তুলে দিনরাত Sexy সব গানের ক্যাসেট চালিয়ে, ভিডিও করে, ঈশ্বরের নামে যে কত অপকর্ম, অন্যায় ঘটে যায় তার হিসাব কোন্ ঈশ্বরের খাতায় কে বা জানে! বিশেষত ঈশ্বরের সন্তান নারীকেই তো লৌকিক, শারীরিক বিকৃতভাবেই বেশি নির্যাতিত হতে হয়। ঈশ্বরের নামে এইরূপ অসামাজিক অনাচার দেখে আর ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে পারি না। নির্বাক হয়ে যাই, নিজেকে সে পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হই, তাই বলে কিন্তু ঈশ্বরে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি না। নির্মলবাবুর মতো নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক ঈশ্বরে বিশ্বাস।

রিনা সামন্ত
[illegible], মেদিনীপুর

□□

ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। এমন লোক খুব কমই আছেন। তাই নির্মলবাবু ঈশ্বর মানেন না, কেন? ঈশ্বর কী এবং এর সৃষ্টি কোথায় থেকে হলো — এটা বুঝতে পারলেই — আমরা বুঝতে পারব নির্মলবাবু কেন প্রগতিশীল ও বামপন্থী হয়েও ঈশ্বর মানেন।

প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা আদিম মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাত: কেমন করে দিন হয় — রাত্রি আসে; বৃষ্টি কে দেয়? ভূমিকম্প কেন হয়?

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কে ঘটায়? জোয়ার-ভাঁটা কে করায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব দেখে আদিম মানুষের মনে প্রশ্ন – 'কে', 'কে' এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে?

সঠিক উত্তর পেত না। ভাবতো এর পিছনে কোন অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তি রয়েছে এবং সেই শক্তিই হচ্ছে – 'ভগবান'। আজও প্রকৃতির সব রহস্যকে কি আমরা বুঝতে পেরেছি? যতদিন প্রকৃতির ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকবে। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারা যাবে না! ততদিন অজ্ঞানতার নামান্তর – 'ভগবান' এ-বিশ্বাসও আমাদের থাকবে।

যে ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হয়েছে – সেইসব ব্যাপারে আর ঈশ্বর বিশ্বাস করি না। আজ আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আছে যে – রোগ হলে – ওষুধ খেতে হবে। আর ওষুধ না খেলে রোগ সারবে না। তাই নির্মলবাবু – রোগ হলে ঈশ্বরের উপর ভরসা না রেখে ডাক্তার দেখান ও ওষুধ খান।

শুধু নির্মলবাবু কেন। অনেক ডাক্তারবাবু আছেন, যারা তাদের ডাক্তারি শিক্ষাদীক্ষার জন্য – কোন জটিল রোগের চিকিৎসা ও অপারেশন করার জন্য – ঈশ্বরের উপর ভরসা করেন। ডাক্তারবাবুদের জ্ঞান – সীমাবদ্ধ জ্ঞান, কেন না, তার কেবল একটা বিশেষ শাস্ত্রের উপর জ্ঞান রয়েছে। সমাজ বিকাশের জ্ঞান – প্রকৃতির নিয়মের জ্ঞান – বস্তুজগতের কার্যকারণ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জ্ঞান – তাঁর নেই। সঠিক জ্ঞান আকাশ থেকে বা আপনা-আপনি আসে না। শুধু বই পড়লে – পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হতে পারে না। বইয়ের জ্ঞানকে প্রয়োগে নিয়ে যেতে পারলেই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হয়।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে – দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটা হচ্ছে – সব হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও অলৌকিক শক্তির দ্বারা। আর অন্যটি হচ্ছে – সব হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা। যারা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করেন – তারা জানেন প্রকৃতির দয়ার ওপর থাকলে 'মানুষের বাঁচা সম্ভব হবে না।' তাই প্রকৃতিকে জানতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে ও জয় করতে হবে। আজ আংশিক হলেও মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে। বাকিটা জয় করার জন্য প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে। চুপ করে বসে থাকলে হবে না। নিজের আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা সম্বল করে এগোতে হবে।

আর যারা ঈশ্বরকে মানেন, তারা জানেন – ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়া, করুণা ও কৃপার উপরই তাদের বাঁচতে হবে। তাই স্বাভাবিক ভাবে সে মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা হারিয়ে ফেলবে। নিজেকে ক্ষীণ, পঙ্গু ও অথর্ব ভাববে। তাই নির্মলবাবু ঈশ্বর বিশ্বাসে অনেক জোর ও শান্তি পান।

এস. রায়.
রাঁচী, বিহার

□□

চারপাশের অসততা আর দুর্নীতি দেখে মন খারাপ হলেও মুটিয়ে যাওয়াটা কোনো প্রগতিশীল মানুষের লক্ষণ নয়। 'ঈশ্বর বিশ্বাস' আর প্রগতিশীলতা এই দুই নৌকায় পা দিয়ে সঠিকভাবে খুব বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি। নির্মলবাবুর ক্ষেত্রে ঈশ্বর নামক অলৌকিক শক্তির ভরসায় মনোবল, আত্মশক্তি ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া গেলেও আমি মনে করি, 'মানুষই দেবতা গড়ে – তাহারই কৃপার পরে – করে দেব মহিমা নির্ভর।' কাজেই অসততার বিরুদ্ধে জোরালো মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, নিজেকে প্রকৃত মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্মান দেওয়া সব মানুষের ক্ষেত্রেই নিজের মানসিক সততানিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে। মানব-সভ্যতা টিঁকে আছে মানুষের শুভবুদ্ধির জোরে। প্রকৃতির নিয়মেই একদল মানুষের শুভবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে – পক্ষান্তরে অন্য আর একদল লোক আলোকিত হচ্ছে শুভ-চেতনার আলোকচ্ছটায়। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এই নৈতিক অন্যায়ের খেলা কল্পিত হচ্ছে মানসিক রোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এর সঙ্গে 'ঈশ্বর' নামক অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসটিকে গুলিয়ে ফেললে পুরো ব্যাপারটাই অস্পষ্ট হয়ে যায়। 'দেব-দেবী না মেনেও ঈশ্বর মানাটা মোটেই যুক্তিবাদী মনের পরিচয় নয় – একটা আত্মপ্রবঞ্চনার ভান বা ভাঁওতা। ঈশ্বর বিশ্বাসে জোর মেলা সম্ভব তাদের পক্ষেই – যাঁরা বাহ্যিকভাবে মানসিক দৃঢ়তা সম্পন্ন হলেও ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত কমজোরী প্রকৃতির। নির্মলবাবুর শেষ যুক্তিটাও মেনে নেবার মতো নয়। যাদের দুরভিসন্ধি নেই, তারা ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্যই পাপ কাজ করতে ভয় পায় তা নয়। অন্যায়ের ক্ষেত্রে খুব কম সময়েই অনাকাঙ্খিত 'ওপরওয়ালা'র কথা মনে পড়ে। ইউরোপের অন্ধকার যুগে যখন স্বর্গীয় বাগান বা স্বর্গের টিকিট বিক্রি করা হত তখন বিক্রেতা ভালো করেই জানত ঈশ্বর নামে কেউ শাস্তি হাতে তাদের শাস্তি দেবার জন্য বসে নেই। সাধারণ মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ওরা মুনাফা লুটেছে – এবং এ-ধরনের সমাজবিরোধী এখনও সংখ্যায় কম নয়। আমি যখন পরীক্ষায় কিছুই লিখতে পারছি না অথচ পাশের ছাত্রের খাতা দেখে লেখার এবং ভালো নম্বর পাবার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে – তখন আমি যদি দেখে লেখার সিদ্ধান্ত নিই – তাহলে তা আমার সততার প্রকৃতই নিরূপণ করবে।

উল্টো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কাজ করবে আমার নিজেরই মূল্যবোধ। মনে হবে যে দেখে দেখে লিখলে আমার প্রকৃত অবস্থাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারবো না। নিজের কাছেই নিজে অপরাধী ও মিথ্যাবাদী হয়ে উঠব। কাজেই নির্মলবাবুকে আমার পরামর্শ, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপনি নিজের মূল্যবোধের উপর আস্থা রেখে আত্মসমালোচনা করুন, তাহলেই আপনার অনাকাঙ্খিত ঈশ্বর-বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ মানসিক সন্তুষ্টি পাবেন। কারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাস মানে নিজেকে অবিশ্বাস।

প্রসেনজিৎ দত্ত
আশুতোষ কলেজ, কলকাতা।

□□

ঈশ্বর আছেন কি নেই – এ নিয়ে আবহমানকাল আলোচনা হয়ে চলেছে। মানুষের বিজ্ঞান-সাধনার ক্রমবর্ধমান দ্রুতের অনিবার্য পরিণতি – আমরা আমাদের মনের পছন্দ হয়ে গেছি যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপ্লব ঘটেছে, পাহাড়-পর্বত শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ মরছে, শিশু বিকলাঙ্গ হচ্ছে। তখন মনে হয়—ঈশ্বর নয়। আমরাই যদি আমাদের ব্যক্তি তথা সামাজিক সমস্যা দূর করতে মাথা তুলে দাঁড়াই, প্রতিবাদ করি, তাহলে এর বদলে, এর হত্যা থেমে যাবে, প্রকৃতির বিপর্যয়কে সামলানো যাবে। অর্থাৎ, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই আমরা বেঁচে থাকব। তখনই মনে হয় ঈশ্বর-বিশ্বাস নয় মানুষের ওপর বিশ্বাস আরও বাড়াতে হবে। সেই বিশ্বাসের জন্যেই একটি সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়োজন। কিন্তু, কি হবে আমার বিশ্বাসকে সবার কাছে উচ্চারিত করে? যুগযুগান্তরের সংগ্রাম মানুষ চালিয়েছে, যে সংগ্রামের নানা পর্বে মানুষ কিছু মূল্যবোধ-values অর্জন করেছে—ত্যাগ, বিনয়, সত্য, ভালোবাসার নামে। সেই মূল্যবোধগুলিকেই মাঝে মাঝে 'ঈশ্বর'-একটি নামে উপস্থাপিত করা হয়। তখন আবার মনে হয় কি প্রয়োজন আমার নিজের সততা ও সত্যবোধের জিদের ওপর দাঁড়িয়ে ওটা ঈশ্বরকে বাতিল করার? লেনিনের কথা মনে পড়ে। আমাদের ফাঁক থেকেই যায়। প্রতিবাদীদের অনেককে দেখেছি, প্রতিবাদীদের অতি সজ্জন অতি কল্যাণ পরায়ণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষকেও দেখেছি। আবার ফেলার বিষয়—ঈশ্বর-অবিশ্বাসী বিজ্ঞান চেতনা সম্পন্ন legoist লোকদের জন্যেও প্রভাবও তো আমাদের কম্যু দুনিয়ার নানা সর্বনাশের সৃষ্টি করে চলেছে, তা-ও তো দেখা যায়। কী বলব—ঈশ্বর, না ঈশ্বর নয়?

মধুবালী ঘোষ

নিমপুর, হাওড়া

□□

আমি নির্মলবাবুর সঙ্গে একমত নই। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস পরস্পরের পরিপূরক নয়, এতে বৈপরীত্য মনোভাব প্রকাশ হয়। সে কারণে নির্মলবাবু বিব্রত এবং হতাশ হয়ে পড়েছেন। প্রশ্ন হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস কেন করবো? ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছে, না মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে! ইতিহাসই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়—ঈশ্বর কথাটি উচ্চারণ করেছে মানুষই। মানুষই তার পছন্দমত মানবিক আকৃতি দিয়ে দেব-দেবীর ইমেজ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর-ভিত্তিক ধর্ম এবং ধর্ম-ভিত্তিক সমাজের সৃষ্টিকর্তা মানুষ নিজে। যারা বামপন্থী রাজনীতি করেন তারা সমাজ সংস্কারক এবং অনেকক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেন। কারণ তাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, সে কারণে জনসংযোগ এবং অভিজ্ঞতাও তাদের বেশি। এক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস হতাশার জন্ম দেয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি জীবনের কঠিন সম্মুখ হলে অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করেন, আবার অনেকে যত দ্রুত সম্ভব সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি ফলদায়ক হয়।

আমি নির্মলবাবুর মতো হতাশাগ্রস্ত না হয়ে নিজেকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যাব এবং সমস্ত মানুষকে বোঝাবো যে আমরা চাই বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ এবং সমস্ত মানুষের ঐক্য, যেখানে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই।

প্রদীপকুমার মৈত্র

কল:৫৯-৩১৩

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়:

১২. টিভি কালচার নিয়ে:

খুব ধন্দে পড়ে গেছেন আপনি, বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন।… কথা হ'ল—টিভি। যখনই কোনো আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীর বাড়ি যান দেখা করতে বা আড্ডা মারতে, দেখেন বসার ঘরে গমগম করে টিভি চলছে। অবশ্য সেই পরিবারটির ভদ্রতার অভাব নেই; চানাচুর সহযোগে চা বা কফি, হাসি-মস্করা, ঝগড়া ছাড়াই হরেকরকম বিষয় নিয়ে আলোচনা—সবই হচ্ছে—ওই টিভি'র দিকে তাকিয়ে। ওদিকে চোখ, ওদিকে মন, মুখে নিপাট যান্ত্রিক ভদ্রতা। কেমন রাগ হয়ে যায়, না? অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি যেন।…কিন্তু করবেনটা কি তাহলে? যাতায়াত সব বন্ধ করবেন? সামাজিক সম্পর্ক বা লৌকিকতা বাতিল করে একলা বেঁচে থাকবেন? নাকি ওই কৃত্রিম অবাঞ্ছিত ভদ্রতাকে মানিয়ে নেবেন—জোর করে মুখে হাসি টেনে সাজানো বানানো কথায় সময়টা কাটিয়ে দেবেন সহজভাবে! কোন্‌টা করা উচিত বলুন তো!

একান্ত নিজস্ব মতামত চাই আপনার নিজস্ব এই বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে রাখলে ভালো হয়। এক মাসের মধ্যে উৎস মানুষ দপ্তরে মতামত পাঠাবেন অনুগ্রহ করে। পাঠকের দলে কারোর ওপর কোন সম্পাদকীয় কর্তৃত্ব কাজ করবে না।

পরিচালকমণ্ডলী

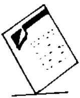

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ: ৬ ডিসেম্বরের অযোধ্যাকে মনে রেখে

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর সেই কালবেলার মধ্যাহ্নে রামের জন্মভূমি অযোধ্যায় এক মহামারী নেমে এসেছিল মধ্যযুগীয় অন্ধকার। 'রাম সেবক' উন্মাদনাধারী একদল উন্মত্ত, ধর্মান্ধ, ধর্মব্যবসায়ী মানুষের শাবল-গাঁইতির আঘাতে ধূলিসাৎ হয়

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বাবরি মসজিদ। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা — স্বাধীনোত্তর ভারতের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের ইতিহাস। দেশজোড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শতশত নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু। জাতীয় স্তরে সার্বিক বিচার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মোতাবেক ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. শংকর দয়াল শর্মা [যিনি নাকি বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার সংবাদ শুনে সাংবাদিকদের সামনে কেঁদে ফেলেছিলেন] ১৯৯৩-এর ৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের কাছে সংবিধানের ১৪৩(১) ধারা বলে জানতে চান অযোধ্যার ওই জমিতে রামমন্দির-বাবরি মসজিদের আগে কোনো 'হিন্দু মন্দির বা হিন্দুধর্মের স্থাপত্যনিদর্শন' ছিল কিনা? তারপর থেকে দীর্ঘ বাইশ মাস ধরে রাষ্ট্রপতির পাঠানো 'রেফারেন্স' নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিবেচনা করেছেন। শেষে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে এবং স্পষ্ট-ভাষায় জানিয়ে দিলেন : অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে পাঁচশো বছর আগে কোনো হিন্দু মন্দির ছিল কিনা, সে সম্পর্কে তাঁরা কোনো মতামত দেবেন না। রাষ্ট্রপতির পাঠানো 'রেফারেন্স' সরাসরি খারিজ করে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত পাঁচজন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছেন, "এই 'রেফারেন্স' অনাবশ্যক এবং অপ্রয়োজনীয়। এর কোনো জবাব দেওয়ার দরকারই নেই। সেই কারণেই আমরা 'সসম্মানে' এটি ফেরৎ পাঠালাম।" রাষ্ট্রপতির পাঠানো 'রেফারেন্স' এভাবে সরাসরি খারিজ করে দেওয়ার ঘটনা 'নজিরবিহীন'। কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্য এই পরিসরে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কেন্দ্রীয় সরকার শংকরাচার্যদের নিয়ে 'মন্দির' নির্মাণের জন্য একটি বেসরকারি ন্যাসকে পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ঝোঁক কোন্ দিকে। 'মন্দির রাজনীতির' বিন্দু বাম হাতে মধ্য নেমে পড়েছেন 'ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের' প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও, সঙ্গে উপযুক্ত দোসর 'ধর্মগুরু' চন্দ্রস্বামী।

অনিবার্যভাবে প্রশ্ন ওঠে অতঃ কিম্। মন্দির-মসজিদ বিতর্ক আবার তার পুরোনো অবস্থানেই ফিরে গেছে। কারণ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, বিতর্কিত এলাকাসহ ৬৭ একর জমির অধিগ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অবৈধ হয় নি। অধিগৃহীত জমিতে যেসব স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা চলছিল, সেগুলি আবার নিম্ন আদালত থেকে শুরু হবে এবং ওইসব মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অধিগৃহীত জমিতে কোনো কিছুই গড়া যাবে না, ভাঙাও যাবে না।' অর্থাৎ মন্দির-মসজিদ রাজনীতি বন্ধ হচ্ছে না, সমান তালেই চলবে। তাহলে বাকি থাকে একটি মাত্র পথ, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পথ। অন্য নামে অভিহিত করা যায়, মানবিকতার পথ, বিবেকের পথ। বাবরি-মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর 'উৎস মানুষ' পত্রিকায় [ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা] সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে এক অসামান্য বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক। "এমন দাবি উঠলে কেমন হয়? রাম-বাবরির বিতর্কিত অঞ্চলে আর কোনো মন্দির-মসজিদ নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ নয়। সব বন্ধ হোক। পরিবর্তে সেখানে একটি স্কুল, একটি হাসপাতাল এবং একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র—দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, নির্যাতিত মানুষের জন্য—নির্মিত হোক।" মনে হয় এই দাবিগুলি নিয়ে ভাববার উপযুক্ত সময় এবার এসেছে। 'উৎস মানুষ' যাঁরা পড়েন এবং পড়েন না, সবার ভাবনায়, চিন্তা ও চেতনায়, এই দাবি, এই ঐতিহাসিক দাবি, প্রতিধ্বনিত হোক, অনুরণিত হোক—প্রকৃত সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে।

বিজয় মুখোপাধ্যায়

হুগলি বংশী

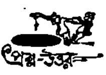

প্রশ্ন-উত্তর

এক, মাংস খাওয়ার পর দুধ খাওয়া কি উচিত, না অনুচিত? দুই, মাথা ধরার ওষুধ খাওয়া কতখানি নিরাপদ? তিন, দুধে নুন মিশিয়ে খাওয়া কি ঠিক নয়?

শান্তনু গড়িয়া
বালনান, হাওড়া

এক : প্রকৃতিতে মাংসের সাথে দুধের কোনো বিরোধ নেই সুতরাং মাংস খাওয়ার পর দুধ খাওয়া যেতেই পারে। তবে কোনো কিছু বেশি না খাওয়াই ভালো, তাহলে পাকস্থলী বা অন্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। চিকিৎসকদের কাছে কেউ কেউ অভিযোগ করেন বটে যে মাংস ও দুধ একত্রে খাওয়ার জন্য আন্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই গোলযোগের কারণ খাবারের পরিমাণ বা মশলাপাতির আধিক্য।

দুই : হঠাৎ মাথা ধরলে তৎক্ষণাৎ কাটানোর জন্য আমরা ওষুধ ব্যবহার করি। কখনো বিশ্রাম নিলে বা ঘুমিয়ে পড়লে মাথা ধরা সারে। অম্বলের অসুখ না থাকলে মাসের মধ্যে দু একটা মাথা ধরার বড়ি, বিশেষত প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ, নিশ্চয়ই নিরাপদ, বিশেষত কাজের সময়। তবু তা পারলে এড়িয়ে চলা ভালো। তবে মাথা ধরা তো হাজার কারণে হতে পারে। সুতরাং ঘনঘন বা দীর্ঘদিন মাথা ধরা লেগে থাকলে অবশ্যই

চিকিৎসককে দেখানো উচিত। কেননা অনেক ওষুধের ব্যাথি নানা ব্যাখ্যা দিয়ে ওষুধ দেয় এবং দীর্ঘদিন খাবার ওষুধ খেয়ে অবহেলা করলে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

তিন: ওষুধ নুন মিশিয়ে খেলে কোনো অসুবিধা হয় না। তবে নুন যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো, বিশেষত যারা শারীরিক পরিশ্রম কম করেন তাদের। নুনের একটা আলাদা স্বাদ আছে সুতরাং একবার অভ্যাস হলে নুন ছাড়া খেতে ভালো লাগবে না এবং তখন স্বাভাবিকভাবে নুন শরীরে যাবে। আর বাড়তি নুন শরীরের রক্তচাপবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

'অন্তরা' মানসিক স্বাস্থ্য মেলা

শীত মানে মেলা। অন্যভাবে বললে, মেলা বলে মনে পড়ে যায় শীতের কথা। এ সময়ে হরেক রকমের মেলা হয় – শিল্পমেলা, মেলা, বইমেলা – পাল পার্বণের মেলা।

বছর দুই হলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোকিপপুরে অন্তরাতে 'মানসিক স্বাস্থ্য মেলা' চলছে। আয়োজক – 'অন্তরা মানসিক স্বাস্থ্যাবাস'। এবারের মেলা বসেছিল রবিবার ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭। বিকেল দুটো থেকে রাত আটটা।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় করানো এই মেলার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিভিন্ন সংস্থা অথবা ডাক্তার স্টলে বসেছিল। এবারও 'কোয়ালিটি অব মেন্টাল হেল্থ'-এর স্টল ছিল। স্টলে মানসিক রোগ সম্পর্কে বিভিন্ন পোস্টার, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বক্তব্য, মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের আঁকা ছবি, পোড়া মাটির কাজ, সাধারণ দর্শকদের আকৃষ্ট করে।

গ্রামের সাধারণ মানুষেরা ভূতে ধরা, জিন হওয়া যে কোনো অপদেবতার দৃষ্টি নয় – এগুলো যে মানুষের অসুস্থ মনের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ তা কৌতূহলভরা চোখে ঘুরে ঘুরে দেখে। একটি স্টলে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের পর্বও চলছিল।

মেলা প্রাঙ্গণে একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। ঐ মঞ্চে 'অন্তরা'র স্বাস্থ্যকর্মীরা একটি কুসংস্কার বিরোধী নাটকও মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল ভূতে ধরা একটি ছেলে কিভাবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে উঠল। নাটক খুব উচ্চমানের না হলেও মেলার দর্শকদের টেনেছিল। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (গড়িয়া শাখা)-একটি কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান মেলা চত্বরে করেন। কচি-কাঁচা ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক হবার আহ্বান জানায়। তারা একটি কুসংস্কার বিরোধী স্টলও খুলেছিল।

মেলা প্রাঙ্গণে সংগঠকরা একটি লটারির স্টল খুলেছিলেন – সেখানে ১০ টাকার টিকিটের বিনিময়ে যে কোনো মূল্যের একটি পুরস্কার টিকিট-সংগ্রহকারীরা পাবেনই। এবং সেটা বিনিময় মূল্যের চেয়ে কম কোনোমতেই হবে না। ফলত দর্শকদের ভিড়ও উপচে পড়েছিল। সাধারণ দর্শকদের জানার কথা নয় যে, লটারির পুরস্কার হিসেবে দেওয়া জিনিসগুলো উদ্যোক্তাদের মুফতে পাওয়া বিভিন্ন সংস্থার অনুদান হিসেবে দেওয়া। এ ব্যাপারটার কোথায় যেন মূল সুরের সঙ্গে একটা ছন্দপতন ঘটেছিল। একটি মানসিক স্বাস্থ্য মেলার এই ধরনের লটারির স্টল খোলাটা কতটা সঠিক সংগঠকদের সেটা ভাবতে বলব। এছাড়া গরম গরম চপ, ঘুগনি, চা কফি মেলার আমেজকে যথেষ্টই চাঙ্গা করছিল।

রূপা

সংগঠন সংবাদ

হয়েছে

☐ ৪ অক্টোবর '৯৪-তে হুগলির 'কোন্নগর বিজ্ঞান সংস্থা' খোসাজোল হাওড়ার আমরা বসেছিল কনকশালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অন্যান্যবার দিন যখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পিতৃতর্পণের জোয়ার চলছে, ঠিক সেইদিনই আমাদের বিষয় ছিল – 'সমাজ থেকে কুসংস্কার তাড়ানো

সম্ভব?' প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনার মূল সুর ছিল – সমাজের মধ্যেই কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক কাঠামো মোটেই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার অনুকূল নয়, ফলে কেবল সংগঠন চেতনা বিকাশের পক্ষে কাজ করে, তাঁদের নিরন্তর কাজ চালিয়ে যেতেই হবে।

□ হুগলী পান্ডুয়ার রাজোল গ্রাম হীরক জয়ন্তী পর্বে বিজ্ঞান ও শিল্পমেলার আয়োজন করা হয়েছিল অধ্যাপক জ্যোতিরূপ ঘোষ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে। বিভিন্ন শিল্পীর নানা ভাবনার ছবি শিল্প প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। কৌতূহলী বিজ্ঞানসংস্থা কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী উপস্থাপন করে। হালিশহরের 'অন্য চোখে' 'মহাজ্ঞানী' নাটক পরিবেশন করে। কাঁচরাপাড়ার গণবিজ্ঞান সংগঠন 'বিজ্ঞান দরবার' কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ সন্ধানে একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সেখানে বিকল্প শক্তি ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

□ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে – ১১তম বার্ষিক বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার প্রতিযোগিতায় ২য় থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের লিখিত প্রশ্নোত্তর পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০ ডিসেম্বর '৯৫ কাঁচরাপাড়া কেন্দ্র ইন্সটিটিউটে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় ১৯৮৪ সাল থেকে উত্তর ২৪-পরগণা ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। ১১তম বর্ষে মোট ৩২টি স্কুলের ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ের লিখিত প্রশ্নোত্তর পর্বে জ্যোতিষশাস্ত্র, হস্তরেখা, গ্রহ-রত্ন, মানুষের শাস্ত্রাচার – বিষয়ে সঠিক ও [illegible] প্রশ্ন রাখা হয়। সকাল ১০টা থেকে সংস্থার কর্মীরা প্রশ্ন-উত্তরপর্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকরা গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ভ্রাতৃ-প্রতীম সংস্থার কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

□ পশ্চিম আসামের কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা নিয়ে বরাক উপত্যকা। এখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। রাজনৈতিক সন্ত্রাসও নিত্য-নৈমিত্তিক। মানুষের দৈনন্দিন জীবন চিন্তা ও চেতনায় ভরা। এখানেই ১৯৮১ সালে গড়ে উঠেছে 'শিলচর গণবিজ্ঞান সংস্থা' মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী তরুণের উদ্যোগে। সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণের লক্ষ্যে সংস্থা বরাক উপত্যকা জুড়ে এক 'কুসংস্কারবিরোধী সাইকেল পরিক্রমা'র আয়োজন করে গত ৬ থেকে ১০ জানুয়ারি '৯৬। পাঁচদিনে জেলার প্রধান শহরগুলি নিয়ে ২৫০ কিলোমিটার পথ তারা পরিক্রমা করে – যাত্রাপথে 'অলৌকিক নয় লৌকিক' এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে বিভিন্ন স্থানে। শেষদিনে, ১০, শিলচরে কুসংস্কারবিরোধী আলোচনা সভা হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দলের ভূমিকা আলোচিত হয়; স্থানীয় সিলেটি ভাষায় পরিবেশ-দূষণ-বিরোধী স্বরচিত লোকগীতি পরিবেশন করেন সংস্থার কর্মীরা।

১৪-১৬ জানুয়ারি '৯৬ ভুবনেশ্বর প্ল্যানেটোরিয়ামে ৫ম সারা ভারত 'অপেশাদার জ্যোতির্বিদদের সম্মেলন' হয়ে গেল। প্রায় দু'শ প্রতিনিধি যোগদান করেন ১২টি রাজ্য থেকে। আগামী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গবেষণামূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

□ প্রকৃতি পরিবেশ ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিয়ে কর্মরত গণসংগঠন নাগরিক মঞ্চ এক গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সভার আয়োজন করে মধ্য কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে, গত ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৬, বিকাল ৫টায়। সম্প্রতি আদালতের রায়ে শহর পর শহর অনেকগুলি শিল্প-সংস্থা পরিবেশ দূষণের অপরাধে বন্ধ হওয়ার নির্দেশ পেয়েছে। ফলে বিপুল সংখ্যক কারখানা-শ্রমিকের কর্মচ্যুতির আশঙ্কা। এতে পরিবেশ আন্দোলন এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে। এ অবস্থায়, একদিকে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা এবং অন্যদিকে পরিবেশ, দুটি দিকই কিভাবে রক্ষিত হতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি ও গণবিজ্ঞান কর্মী মতামত ব্যক্ত করেন। শেষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কাছে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ও সাধারণ সুস্থ পরিবেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য [illegible] থাকেন / দাবী পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিজ্ঞান দরবারের তথ্যকেন্দ্র

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের সংস্থা বিজ্ঞান দরবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর তথ্যকেন্দ্র গত ১০ বছর ধরে সংগ্রহ করে আসছে। আগ্রহী ব্যক্তি / সংস্থা যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ২. স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ৩. কৃষি, প্রাণীসম্পদ, খাদ্য, পুষ্টি, দুগ্ধ, মৎস-চাষ, জলাশয়, ৪. পরিবেশ দূষণ, ৫. পরিকল্পনা ও উন্নয়ননীতি, ৬. বিদ্যুৎ, জল, তাপ. কয়লা, (সৌর), ৭. পরমাণু বিদ্যুৎ ও পরমাণু বিরোধী আন্দোলন, ৮. কুসংস্কার জ্যোতিষ, বিজ্ঞানমনস্কতা, গণবিজ্ঞান আন্দোলন (খবরাখবর) গডম্যানদের বুজরুকি, ৯. মৌলবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা, দাঙ্গা, অনুপ্রবেশ সমস্যা, ১০. পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, ১১. খরা, বন্যা, অনাহার, অরণ্য, ভূমিকম্প, ১২. শিল্প দুর্ঘটনা / বিপর্যয়, ১৩. নারীর অধিকার রক্ষা আন্দোলন এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রিপোর্ট ও খবরাখবর। সাধারণ সম্পাদক বিজ্ঞান দরবার; ৫৮৬ [illegible] ব্যানার্জি রোড কাঁচরাপাড়া, উঃ ২৪ পর. পিন-৭৪৩১৪৫।

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ 866

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

'উৎস মানুষ'-এর নতুন সংকলন

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে

দাম : ৩০ টাকা

WB/EC 328 | ISSN 0971-5800 | RN 37275/80 | Rs. 5.00
UTSA MANUSH | VOL 16 NO 3 | MARCH 1995 | পাঁচ টাকা

উৎস মানুষ প্রকাশিত রচনা সংকলন

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / ১ম খণ্ড [২৫'০০]
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / ২য় খণ্ড [৩০'০০]
বিজ্ঞানকে মুখোশ করে [১০'০০]
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে [৩০'০০]

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় [২২'০০]
প্রতিরোধ [২২'০০]
ছোটদের দাঙ্গা [২৫'০০]
শেকলভাঙা সংস্কৃতি [১৬'০০]

এটা কি ওটা কেন [১৫'০০]
স্বাস্থ্যের বৃত্ত [২০'০০]
যে গল্পের শেষ নেই [২৫'০০]
প্রমিথিউসের পথে [যন্ত্রস্থ]

বিবেকানন্দ অন্য চোখে [২৫'০০]
বিবেকানন্দ অন্য চোখে : একটি সমীক্ষা—আরো কিছু বিতর্ক [যন্ত্রস্থ]
সাপ নিয়ে কিংবদন্তী [১৫'০০]
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ [২৫'০০]

চিঠিপত্রে যোগাযোগ : সম্পাদক উৎস মানুষ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

সরাসরি সাক্ষাতের জন্য : ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৯ (সোম—শুক্র : ১১—৬টা)

'উৎস মানুষ'-এর পক্ষে অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং মায়াপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৩ গৌরমোহন ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ (ফোন : ২৪১ ৩৫৪৩) থেকে মুদ্রিত।

ISSN 0971-5800
এপ্রিল ১৯৯৫

উৎস মানুষ

সাক্ষরতার শিক্ষা-দণ্ড
অশ্লীলতাও ছাড়পত্র পাবে ?
এইড্ স আতঙ্ক অমানবিক
ট্রামে-বাসে লেডিস সিট

ষোড়শ বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা □ এপ্রিল ১৯৯৫

[illegible]

[illegible]

ধর্মশিক্ষা □ ৮৫

নিকৃষ্ট শিক্ষা : নিপীড়ন ৮৮

গুলি-অঞ্জলি □ ৯২

[illegible]

তারা, তুমি লাল হয়ে উঠছ কেন □ ৯৫

আকাশ থেকে ঘুরে এলে … ৯৬

অন্য আলো—জ্যোতিষ □ ৯৭

[illegible] □ ৯৮

[illegible] □ ১০০

[illegible] □ ১০৩

[illegible] □ ১০৪

[illegible] □ ১১২

উৎস মানুষ
ISSN 0971-5800
বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

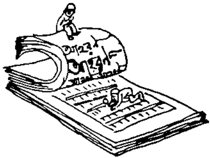

ধর্মশিক্ষা

রাজশেখর বসু

[illegible]

আমাদের দেশে সব রকম দুষ্কর্ম আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। চুরি ডাকাতি প্রতারণা খুন জোচ্চুরি ইত্যাদি দেশব্যাপী হয়েছে, অনেক রাজপুরুষ আর ব্যবসাদার সংসারটি কর্মে অসাধুতা প্রকট হয়েছে, জনসাধারণের আচরণেও অসংযম আর গুণ্ডামি দেখা দিয়েছে, ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত হয়েছে। অনেক সরকারী অফিসে কাজ আদায়ের জন্যে চিরকালই আমাদের ঘুষ দিতে হত। এখন তাদের জুলুম বেড়ে গেছে, উপরওয়ালাদের বললেও কিছু হয় না, তাঁরা নিম্নতনের শাসন করতে ভয় পান।

প্রাচীন ভারতে চোরের হাত কেটে ফেলা হত। বিলাতে দেড় শ বছর আগে সামান্য চুরির জন্যেও ফাঁসি হত। রাজা রতন রাও কুলনারীহরণের জন্যে নিজের পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এই রকম কঠোর শাস্তির ভয়ে দুর্বৃত্তরা কতকটা সংযত থাকত, কিন্তু একেবারে নিরস্ত হত না।

সমাজরক্ষার জন্যে যথোচিত দণ্ডবিধি অবশ্যই চাই, কিন্তু তার চাইতেও চাই এমন শিক্ষা আর পরিবেশ যাতে দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি না হয়। অনেকে বলেন, বাল্যকাল থেকে ধর্মশিক্ষাই দুষ্প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। রিলিজন এডুকেশনের জন্যে বিলাতে আইন আছে, সকল খ্রীষ্টান বালকবালিকাকে বাইবেল পড়তে হয় এবং তৎসম্মত ধর্মোপদেশ শুনতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান মাত্রেই এই শিক্ষা অত্যাবশ্যক মনে করেন। কিন্তু যুক্তিবাদী র‍্যাশনালিস্টরা (যাঁদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা মনীষী আছেন) বলেন খ্রীষ্টীয় বা অন্য কোনও ধর্মের ভিত্তিতে ম্যারালিটি বা সামাজিক কর্তব্য শেখানো শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকরও বটে, তাতে বুদ্ধি সংকীর্ণ হয়।

বাল্যকাল থেকে সুনীতি আর সদাচার শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, এ সম্বন্ধে মতভেদ নেই। কিন্তু সেকিউলার বা লোকায়ত ভারতবর্ষের প্রচার জন্যে এই শিক্ষার ভিত্তি কি হবে? শিক্ষার্থীর সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র, অথবা সাম্প্রদায়িকতানিরপেক্ষ শুদ্ধই নীতিশাস্ত্র?

সেকিউলার শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। কোনও বা নির্দিষ্ট বিষয়ে আস্থা না থাকলে সেকিউলার হয় না। হিন্দুধর্ম ঠিক সেকিউলার নয়, কারণ তার বাঁধা-ধরা কোনও নেই। কিন্তু যেমন মুসলমান আর খৃষ্টীয় ধর্ম, তেমনি জৈন শিখ বৈষ্ণব আর ব্রাহ্ম ধর্মও সেকিউলার। ভারতীয় ছাত্র যদি মুসলমান খৃষ্টান জৈন শিখ বৈষ্ণব ব্রাহ্ম ইত্যাদি হয় তবে তার সাম্প্রদায়িক রুচি অনুসারে তাকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু ছাত্রকে কিংবা মিশ্র সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে কি শেখানো হবে? শুধু অল্পবয়স্কদের জন্যে ব্যবস্থা করলে চলবে না, প্রাপ্তবয়স্করাও যাতে কুকর্মপ্রবণ না হয় তার উপায় ভাবতে হবে।

ধর্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ অতি ব্যাপক – যা প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজ হিতকর বিধিসমূহই ধর্ম, যাতে জন-সাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় তাই ধর্ম। ইংরেজিতে gentleman এর একটি বিশিষ্ট অর্থ – chivalrous well-bred man। জেন্টেলম্যান বা সজ্জনের যে লক্ষণাবলী, তা যদি অনুরূপে প্রসারিত করা হয় তবে তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে। শুধু শুদ্ধ বেশ, ভদ্র আচরণ, মার্জিত আলাপ, সত্যপালন, দুর্বলকে রক্ষা করা ইত্যাদি ধর্ম নয়, শুধু চুরি বা পরস্বাপহরণ ত্যাগও ধর্ম নয়। স্বাস্থ্য রক্ষা বিদ্যা উপার্জন সদাচার সুনীতি বিনয় (discipline) প্রীতিশ্রমযোগে আয়ত্ত পরোপকার প্রভৃতিও ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে সুপরিকল্পিত অনুশীলন ও সামঞ্জস্য বিবৃত করেছেন তাই ধর্ম। মানুষের পালনীয় ধর্মের এমন সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আর কেউ বোধ হয় করেন নি।

ভারতীয় বিদ্যার্থী সেকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা পেত তাকে তখনকার হিসাবে সর্বাঙ্গীণ বলা যেতে পারে। বৈদিক ক্রিয়া আর শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান ritual-এর সঙ্গে সদাচার আর সামাজিক কর্তব্যও শিক্ষণীয় ছিল। এখন গুরুগৃহের স্থানে স্কুল-কলেজ হয়েছে, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তায় আস্থা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এখনকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অত্যল্প, ধর্ম বা সামাজিক কর্তব্য শেখাবার তাঁদের সময় নেই, যোগ্যতাও নেই।

ধর্মশিক্ষার জন্যে কেউ কেউ দুটিবাসের ব্যবস্থা করে থাকেন। ছেলেরা নির্ধারিত গায়ত্রী জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, স্তোত্রপাঠ, গীতা-অধ্যয়ন ইত্যাদি করবে। ছেলেরা মহাশালী পাঠশালার অনুকরণে নানা রকম ব্রতপালন আর শিল্পচর্চা করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি শোনাবার ব্যবস্থা হবে। সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আর তাঁর প্রতি ভক্তি যাতে হয় তার চেষ্টা করা হবে।

পাশ্চাত্য দেশেও দুর্নীতি বেড়ে গেছে। অনেকে বলেন, স্বর্গ-নরকে সাধারণের আস্থা কমে যাওয়াই নৈতিক অবনতির কারণ। Pie in the sky and hell fire, অর্থাৎ পরলোকে গিয়ে পুণ্যবান স্বর্গীয় পিষ্টক খাবে আর পাপী নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবে, এই বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় খৃষ্টীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায় – Jesus Christ can save to the uttermost! ফ্রেমে বাঁধানো অনুরূপ আশ্বাসবাক্য দেশী ছবির দোকানে পাওয়া যায় – 'একবার হরিনামে যত পাপ হরে, পাপিষ্ঠের সাধ্য নাই তত পাপ করে।' কিন্তু এই সব বাণীতে কোনও ফল হয় না, কারণ জনসাধারণ ইহসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

দুর্নীতিবৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। বোধ হয় একটি প্রধান কারণ, জুয়াড়ী প্রবৃত্তি বা gambling spirit-এর প্রসার। লোকে দেখছে, দুষ্কর্মাদের অনেকেই ধরা পড়ে না, যারা ধরা পড়ে তাদেরও অনেকে শাস্তি পায় না। অতএব দুষ্কর্ম করে নিরাপদে লাভবান হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এক শ জন দুষ্কর্মীর মধ্যে যদি পঁচাত্তর জন সাজা না পায় তবে সেই পঁচাত্তরের মধ্যে আমারও স্থান হতে পারে, অতএব আইনের ভয়ে পিছিয়ে থাকবে কেন? ঝুঁকি না নিলে কোনও ব্যবসাতে লাভ হয় না, দুষ্কর্মও একটা বড় ব্যবসা। লোকনিন্দা গ্রাহ্য করবার দরকার নেই, আমি যদি ধনবান হই তবে আমার দুষ্কর্ম জানলেও লোকে আমাকে খাতির করবে।

অনেকের সংস্কার সহজে যুচে যায় না, স্বর্গ নরকে বিশ্বাস কমে গেলেও পাপের জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধ অনেকের আছে এবং তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় তারা সুসাধ্য উপায় খোঁজে। বিস্তর লোক মনে করে, গঙ্গাস্নান, একাদশী পালন, দেব-বিগ্রহ দর্শন, গো-ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ সেবা, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি করলেই পাপস্খালন হয়। হরিনাম-কীর্তনে বা খৃষ্ট-স্মরণে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই উক্তির সঙ্গে উহ্য থাকে – আগে অনুতপ্ত হয়ে পাপকর্ম ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু লোকে কুকর্মের অভ্যাস ছাড়তে পারে না, মনে করে ভগবানের নাম নিলেই নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে। রোজ ডায়াবেটিক যেমন মিষ্টান্ন খায় আর ইনসুলিন নেয়।

আইনের ফেসাদে পড়লে লোকে যেমন উকিল মোক্তার আশ্রয় করে, তেমনি অনেকে পাপস্খালনের জন্যে গুরুর শরণ নেয়। সেকেলে কুলগুরু পুরুত প্রতিপত্তি এখন কমে গেছে, আধুনিক জনপ্রিয় সাধু-মহাত্মারা গুরুর স্থান নিয়েছেন। তাঁরা একসঙ্গে বিপুল জনতাকে উপদেশ দেন, যেমন গৌতম বুদ্ধ দিতেন এবং একালের রাজনীতিক নেতারা দেন। অনেকে মনে করে, আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি, গুরুকে যদি ভক্তি করি আর ধন জন তাঁর কাছে যাই তা হলে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। আমাদের দেশে সাধুসন্তের আবির্ভাব চিরদিনই হয়েছে, জনসাধারণের কাছে তাঁরা ভক্তি শ্রদ্ধাও প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু এখনকার জনপ্রিয় গুরু-গুরুবীর সাবধানে যে বিপুল জনসমাগম হয় তা বোধ হয় বুদ্ধ আর চৈতন্যদেবের

করলেও দেখা যায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীরামকৃষ্ণেরও এমন হতভাগা হয় নি।

একদিকে গত্যন্তরহীন ভুবনে আস্তিক্য, অন্যদিকে দুষ্কর্মের দেখাশোনা মানুষ, এই দুই-এর মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ আছে কি? একথা বলা যায় না যে গরুচোর বেড়ে যাওয়ার ফলেই দুষ্কর্মের প্রবৃত্তি বেড়ে গেছে, কিংবা গরুচোর জাল ফেলে চুনো পুঁটি দুই কাতলা সংগ্রহ করছেন। সাধুসজ্জনবাসী ধার্মিক সজ্জন এখনও অনেক আছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন হতে পারে যে দুষ্কর্ম বৃদ্ধির ফলেই সাধু মহাত্মা গুরুর চাহিদা বেড়ে গেছে, বিনা আয়াসে পাপমুক্ত হবার মতলবে এখন অসংখ্য লোক গুরুর শরণ নিচ্ছে।

তবু অন্ধ বিশ্বাস আতান চোর দুষ্কর্মের ইত্যাদি দুষ্কৃতির লোক অনেক আছে। তথাপি দেখা যায়, যারা স্বভাবত ভক্তিমান তারা প্রায় পাপ দুষ্কর্মে রত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকলে কোনও লোককে যেমন পণ্ডিত বা সংগীতজ্ঞ করা যায় না, তেমনি কৃত্রিম উপায়ে অন্যকে ভক্তিমান করা যায় না। মানুষের নৈতিক কিংবা কর্ম করলে বা জোর আবৃত্তি করলে চরিত্র পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। পুরোহিত মন্ত্র পড়ান — অপবিত্র বা পবিত্র যে কোনও অবস্থায় যদি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করা হয় তবে বাহ্য আর অভ্যন্তর শুচি হয়ে যায়। কেবল নাম স্মরণেই যদি দেহশুদ্ধি আর চিত্তশুদ্ধি হত তবে লোকে অতি সহজে নিষ্পাপ জীবন লাভ করত। গোঁড়া আচার-নিষ্ঠ বীরপুরুষও কত মন্দ হতে পারে তার অনেক চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়।

যে স্বভাবত সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিমান আর জিজ্ঞাসু, সে নিজের রুচি অনুসারে ভক্তি কর্ম বা জ্ঞানের চর্চা করে। দুর্দান্ত বিদ্যাসাগর প্রায় নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতন কর্মবীর পরোপকারী সমাজহিতৈষী অল্পই জন্মেছেন। গান্ধীজী ভক্ত বিশ্বাসী, নেহরুজী অভক্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু দুজনেই অসাধারণ লোকহিতৈষী সাধুপুরুষ।

মনুর নামে বলে খ্যাত একটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

পরস্পরভয়াৎ কেচিৎ পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।

রাজদণ্ডভয়াৎ কেচিৎ যমদণ্ডভয়াৎ পরে॥

সর্বেষামপি চৈতেষাম্ আত্মভয়াৎ বধ।

আত্মা সর্বাথয়ো যেন মকতলা করোতি কিম্॥

—কোনও কোনও পাপমতি পরস্পরের ভয়ে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, কেউ রাজদণ্ডের ভয়ে, কেউ বা যমদণ্ডের ভয়ে। কিন্তু সকল পাপকের উপরে শাসন করে আত্মা বা অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ যে সংযমিত করেছে বধ তার কি করবে?

মোট কথা, ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তঃকরণের সংযম বা বিনয়ন, disciplining the mind। এই বিনয়নের উপায় অন্বেষণ করতে হবে।

[শেষাংশ আগামী সংখ্যায়]

বিধিসম্মত ঘোষণা

প্রকাশক : পবন কুমার মুখোপাধ্যায় (সা.)

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪

প্রকাশস্থান : ঐ

প্রকাশকাল : মাসিক

স্বত্বাধিকারী : 'উৎস মানুষ' সমিতি

ঠিকানা : ঐ

মুদ্রক : পবন কুমার মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণস্থান : যানজক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে)

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে সত্য।

স্বা : পবন কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

পত্রিকার নিয়মাবলী

পত্রিকার প্রতি কপি ৫ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক) ৬০ টাকা। যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া চলে। গ্রাহকদের সাধারণ ডাকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্টদের VP-তে পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্সি-জমা (ফেরতযোগ্য) লাগে ৩০ টাকা। কমিশন – ২০% (১০০ কপি নিলে ৩৩⅓%)। ডাক খরচের অর্ধেক এজেন্টকে বহন করতে হয়।

টাকা UTSA MANUSH-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ অথবা M.O. করে পাঠাবেন। কলকাতার বাইরের অঞ্চলের চেক পাঠাবেন না। M.O. ফর্মের নিচে কুপনে নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর অবশ্যই লিখবেন।

ঠিকানা : সম্পাদক, উৎস মানুষ

বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৬৪

সাক্ষরতার নামে

নিকৃষ্ট শিক্ষা : নিপীড়ন

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় অসুখ হলে ডাক্তার দেখাব। হাতুড়ে চিকিৎসাতে বিপদ আছে। তুক-তাকে রোগ সারে না। অবোধ বা অবুঝ হলে চলে না। অসুখ কেন হয়? জানতে হবে। অসুখ যেন কম হয়। হলে অনেক কষ্ট।

এই কথাগুলি লেখা আছে সাক্ষরতার একটি পাঠ্যবইয়ে, পড়ানো হচ্ছে বয়স্ক নারী-পুরুষদের। উদ্দেশ্য : ছ মাসের মধ্যে তাদের 'ব্যবহারযোগ্য সাক্ষরতায় পৌঁছে দেওয়া।' প্রকল্পের নাম : জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান বা ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন।

১৯৮৮ সালে সাক্ষরতা মিশনের কাজ যখন শুরু হয়, সারা দেশে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা হিসেব করা হয়েছিল ১১ কোটি। মিশন সাত বছরে অন্তত আট কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে এবং কী ধরনের প্রাথমিক পাঠ্যবই (প্রাইমার) তৈরি হবে, তার একটা কাঠামো-ও স্থির করে দেয়। বলা হয়েছিল, সাক্ষরতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন লিখতে-পড়তে, হিসেব করতে শেখে যায়। তাদের দৈন্যের কারণ এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কীভাবে তার নিরসন করা যায়, তা উপলব্ধি করতে শেখে : পরিবেশ সংরক্ষণ, জাতীয় সংহতি, নারী-পুরুষের সমতা, ছোটো পরিবারের প্রয়োজনীয়তা – এইসব মূল্যবোধের চেতনাও যেন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে।[১]

সাক্ষরতা মিশনের এই নির্দেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে পাঠ্য-পুস্তক রচনার কাজটি করেছেন বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ। লিখতে-পড়তে শেখার প্রধান তিনটি পুস্তকের নাম : সাক্ষরতার প্রথম পাঠ / দ্বিতীয় পাঠ / তৃতীয় পাঠ। এই রচনার প্রথমে উদ্ধৃত পাঠ্যাংশটি পাওয়া যাবে প্রথম পাঠের ২১ পৃষ্ঠায়। শরীর কীভাবে ভালো রাখা যায়? —এই প্রসঙ্গে বয়স্ক নারী-পুরুষকে শেখানো হয়েছে : 'শিশুদের ঠিক সময়ে টিকা দেব'; 'জল শোধন করব'; 'কী খাবার খাব? কম খরচে ভাল খাবার'; 'শরীর ভাল রাখব। ডাক্তারের খরচ কমাব। টাকা বাঁচাব।' (১ম, পৃ. ৩৪)

সাক্ষরতা আন্দোলনের একটি প্রধান স্বীকার্য হলো, নিরক্ষরতা আর অজ্ঞতা এক নয়। একটি নিরক্ষর নারী / পুরুষ ফাঁকা মন নিয়ে সাক্ষরতা-কেন্দ্রে আসে না। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তার অনেক কিছুই শেখা হয়ে যায়। সে হয়ত এক-দুই লিখতে পারে না, কিন্তু মোটামুটি হিসেব করতে জানে। একটা গোটা শব্দ লেখার ক্ষমতা হয়তো তার নেই; কিন্তু শব্দটির অর্থ এবং প্রয়োগ তার জানা আছে। তার এই অসম্পূর্ণ অগোছালো জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে, মর্যাদা দিয়ে তৈরি হবে সাক্ষরতার পাঠক্রম। এই নীতি বয়স্ক নারী-পুরুষের বেলায় বেশি করে প্রযোজ্য, কারণ তাদের অভিজ্ঞতা আরও বেশি।

পড়লেই বোঝা যায়, যাদের মুখে বসানো হয়েছে, কথাগুলো তাদের নয় : এগুলি লিখেছেন পুস্তক-প্রণেতারা। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, নিরক্ষর নারী-পুরুষ 'অবোধ অবুঝ'; তারা নিজেদের ভালো-মন্দ নিজেরা বোঝে না। তাদের বোধ জাগাতে হবে। পুস্তকগুলির ছত্রে ছত্রে তাই নির্দেশ-উপদেশ আর অনুশাসন – অমুকটা-তমুকটা 'করতে হবে' আর 'জানতে হবে'। কয়েকটি নমুনা :

'পরিবার বড় হলে বিপদ। কেন বিপদ? আয় বাড়াতে হবে। সবজি বাগান করব। জানতে হবে।' (১ম, পৃ. ৬)

'পঞ্চায়েতের জোর বাড়াব। গ্রামকে বড় করব।' (১ : ১০)

'মাটি, গাছপালা, বাতাস, জল, পশুপাখি, মানুষ এ সব নিয়েই পরিবেশ। পরিবেশ দূষণ দূর করতে হবে।' (১ : ২১)

'পরিবেশের দোষ বা দূষণ অনেক রকম। জলের দোষ। বাতাসের দোষ। মাটির দোষ। পরিবারের দোষ। সমাজের দোষ। এইসব দূষণ জানতে হবে। দূর করতে হবে।' (১ : ২৬)

'আজকাল কাজের ধরন পালটেছে।…নতুন ধাঁচের কাজ শিখতেই হবে। এসব জানা দরকার।' (১ : ৩৭)

'আমাদের অনেক দুঃখ, অনেক বাধা। সেসব দূর করতে হবে। জোট বাঁধতে হবে। রোজগার বাড়াব। ভয় করব না।' (১ : ৪০)

'ধুলো আর ধোঁয়া থেকেও অসুখ করে।…ধোঁয়াহীন চুলো করা খুব সহজ। কী করে করতে হয় শিখতে হবে।' (১ : ৪১)

'শরীর ভাল রাখার শিক্ষা নিতে হবে। মা ও শিশুর কল্যাণের কথা জানব। সংসারে সবাই

১. 'যোজনা' সেপ্টেম্বর [illegible]

সাক্ষরতার প্রথম পাঠ

জনসংখ্যাবৃদ্ধিকেই গরিব মানুষের দুর্দশার একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করে দিলে সমাজের ধনবৈষম্য এবং অন্যান্য নিয়মগুলি নিয়ে আর আলোচনার দরকার হয় না ; বরং ওই উপপাদ্যের প্রমাণ থেকে এমন অনুসিদ্ধান্ত টানা যায় যে, নির্বোধ গরিবের দল কাঁড়িকাঁড়ি বাচ্চার জন্ম দিয়ে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনে। নিজেদের ভালোমন্দ ওরা নিজেরা বোঝে না।

হাত লাগাব।' (২ : ১৮)

মূক মানে মূঢ় নয়।

সাক্ষরতা আন্দোলনের একটি প্রধান স্বীকার্য হলো, নিরক্ষরতা আর অজ্ঞতা এক নয়। একটি নিরক্ষর নারী / পুরুষ ফাঁকা মন নিয়ে সাক্ষরতা-কেন্দ্রে আসে না। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তার অনেক কিছুই শেখা হয়ে যায়। সে হয়ত এক-দুই লিখতে পারে না, কিন্তু মোটামুটি হিসেব করতে জানে। একটা গোটা শব্দ লেখার ক্ষমতা হয়ত তার নেই ; কিন্তু শব্দটির অর্থ এবং প্রয়োগ তার জানা আছে। তার এই অসম্পূর্ণ অগোছালো জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে, মর্যাদা দিয়ে তৈরি হবে সাক্ষরতার পাঠক্রম। এই নীতি বয়স্ক নারী-পুরুষের বেলায় বেশি করে প্রযোজ্য, কারণ তাদের অভিজ্ঞতা আরো বেশি। তাদের অক্ষরজ্ঞান না থাকতে পারে ; কিন্তু তাদেরও একটা জীবনদর্শন আছে—ন্যায়-নীতি, উচিত-অনুচিতের ধারণা আছে। সাক্ষরতার শিক্ষা-পদ্ধতি তাই ছক বাঁধা নয়, নন ফরমাল : উদ্দেশ্য : শিক্ষণ নয়, শিখন। শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ শিক্ষাদান নয়, শিখতে সাহায্য করা—শিক্ষার্থীদের কথা শোনা, তাদের নিজস্ব জ্ঞানধারণা-উপলব্ধিগুলোকে বোঝা ; তারপর খোলামেলা আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে তাদের একটা উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করা।

নন ফরমাল শিক্ষা নিয়ে গত তিন দশক ধরে পৃথিবীতে প্রচুর কাজ হয়েছে—সে-সব কথা আমাদের অজানা নয়। পাওলো ফ্রেয়ার এবং ইভান ইলিচের রচনা অনেকেই পড়েছেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কোর 'লার্নিং টু বি' সংকলনটিও খুবই মূল্যবান। আমাদের দেশে এ বিষয়ে সবচেয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন জে. পি. নায়েক। নন ফরমাল শিক্ষার ধারণা এক হিসেবে আমাদের দেশে নতুনও নয়। শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রে রবীন্দ্রনাথ নন-ফরমাল শিক্ষার একটি প্রক্রিয়াই শুরু করেছিলেন। গান্ধীজির 'নঈ তালিম' বা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রণালীও ছিল নন ফরমাল। বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা ষাট-সত্তর বছর আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুস্তকগুলিতে এইসব চিন্তার কোনো ছাপ-ই প্রায় নেই। এখানে শিক্ষার্থীকে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয়েছে 'অবুঝ' : তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে যোগাযোগ দরকার, বাঁচার জন্য যে জোট বাঁধতে হয়, এইসব কথাও বয়স্ক নারী-পুরুষকে বোঝানো দরকার মনে করা হয়েছে :

'সমাজ মানে যোগাযোগ :—লোকে লোকে যোগাযোগ। যোগাযোগ দরকার।' (১ : ১)

'একা আমরা দুর্বল। পরস্পরেতে আমাদের জোর। সমাজে আমাদের জোর। মিলেমিশে থাকতে হবে।' (১ : ১৬)

একতাই বল—এই নীতিজ্ঞানটি শেখার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সেই বৃদ্ধ কৃষক আর তার ঝগড়াটে ছেলেদের গল্প। রহিম নামের কৃষকটি গল্পের শেষে শোনায় : 'তোমরা এর থেকে শেখ। যদি এক হও, তোমাদের জোর বাড়বে। কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।' (৩ : ২১)

মনে রাখা ভালো, এই বই তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে গণ-আন্দোলনের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে এবং বর্তমান সরকার দাবি করে থাকেন, গ্রামে তাঁরা একটা নতুন চেতনা আনতে পেরেছেন। শিক্ষার্থীদের

মধ্যে গ্রামের লোকই বেশি। আর সেই কৃষিজীবী নারী-পুরুষদের শহুরে কাঁচের দেওয়া হয়েছে : শাকসব্জিতেও প্রচুর গুণ। ওদের কাছেই এসব শোনানো যায়।' এবং 'ওটা কলমূল ধুয়ে খেতে হবে। না ধুলে অসুখ করতে পারে। ছোট ছোট পোকা আছে। এসব পোকা আমরা দেখতে পাই না।' (১ : ৩৩, ৩৬)

শিক্ষার্থীরা বয়স্ক নারী-পুরুষ; অনেকেই সন্তানের পিতা মাতা। আর সেই শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে : 'শিশুকে জন্ম দেওয়া সহজ। তাকে ঠিকমত লালন-পালন করা তত সহজ নয়।' (২ : ১৭) কল্পনা করে নিন : সন্তানের পিতা-মাতাকে এই জ্ঞানটি শিক্ষেন হয়ত কোন কুড়ি-বাইশের এক যুবক।

'ছোট পরিবার নীতি'

সাক্ষরতা মিশনের নির্দেশ ছিল, ছোট পরিবার নীতি শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে থাকবে। সেই নির্দেশ পালিত হয়েছে এইভাবে, এইসব কথা পড়িয়ে-শুনিয়ে :

'পরিবার ছোট রাখাই ভাল। বেশি ছেলেপুলে হলে অনেক বিপদ। ছেলেমেয়েরা ভাল খেতে পাবে না। সব সময় অসুখ-বিসুখ করবে। স্বভাব বেড়ে যাবে।' (১ : ৬৮)

'পরিবার কত বড় করব? শিশু পরিবারে এলে তাকে ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারব? তাকে কাপড়জামা দিতে পারব? তাকে ঠিকমত খেতে দিতে পারব?' (২ : ১৭)

'এক সংসারে অনেকগুলি খাওয়ার লোক থাকলে সংসারে সর্বনাশ ডেকে।' (২ : ২০)

এইসব উপদেশ আর হুঁশিয়ারিও যথেষ্ট নয় মনে করা হয়েছে; আর তাই দ্বিতীয় পাঠে নিয়ে আসা হয়েছে একটি গোটা গল্প : 'নীলা জ্বলল কেন?' গল্পের বউ নীলা পাঁচ ছেলেমেয়ের মা : আবার প্রসব করতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের এক দাদা এই ঘটনায় চিন্তিত; তিনি সেইদিনই বিকেলে একটি সভা ডেকেছেন। সভায় পুরুষের লোকদের পলার কাছে তার প্রথম প্রশ্ন : 'পলা, উঠে দাঁড়া। দাঁড়িয়ে বল্ তোর কটা ছেলেমেয়ে।' পলা উত্তর দিল। এরপর দাদা বললেন, 'বোস, এবার আমি বলব।' দাদা বলে যান, পলা কতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন; সে জানে না যে, 'বছর বছর বাচ্চা হলে মায়ের শরীর খারাপ হয়ে যায়।' এরপর গ্রামের এক প্রবীণা বলে গেলেন; সভা শাসাচ্ছেন পলার কাছে তাঁর প্রশ্ন : 'নীলার পেটে বছর বছর বাচ্চা আনা কি ন্যায় কাজ হয়েছে? এই কি তোমার পুরুষ মানুষের।' উপদেশ : 'বিয়ে করে তাড়াতাড়ি আটখানা হলে চলবে না। বুঝতে হবে বৌয়ের শরীরের কথা। জানতে হবে, কী করে ছেলেপুলের জন্ম ঠেকাতে হয়।' (২ : ১৯-২১)

বয়স্ক শিক্ষার পাঠক্রমে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই একটি আলোচনার বিষয় হবে – তা নিয়ে বিতর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু এখানে বিষয়টিকে যে-ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য তাঁদের বোঝা নয়, শাসন করা; গরিব মানুষকে গোঁয়ারগোবিন্দ বলে দেখানো যে, তাদের যেন বেশি সন্তান না হয়। শাসনের ভঙ্গির এতই প্রবল যে, বোঝানো দায় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার আর দরকার হয় নি। এই প্রকরণের পিছনে আসলে হয়ত গেছে আরও গভীর এক উদ্দেশ্য।

জনসংখ্যাবৃদ্ধিকেই গরিব মানুষের দুর্দশার একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করে দিলে সমাজের বৈষম্য এবং অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে আর আলোচনার দরকার হয় না; বরং ওই উপদেশের প্রমাণ থেকে এমন সিদ্ধান্তে টানা যায় যে, নির্বোধ গরিবেরা দল কাঁড়ি কাঁড়ি বাচ্চার জন্ম দিয়ে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনে। নিজেদের ভালো-মন্দ ওরা নিজেরা বোঝে না। ঠিক এই কথাগুলোই বলা আছে এইভাবে :

'আমরা অনেকভাবে দুখি। নিজেদের দোষেই বেশি দুখি। লেখাপড়া জানি না বলে দুখি। কাজের কায়দা জানি না বলে দুখি। অনেক কারণে দুখি। কিন্তু কারণের জন্য সমাজ দায়ী। সরকারী কাজকর্ম দায়ী। সে-সবও বদলাতে হবে।...কিন্তু কারণ আমরাই দূর করতে পারি। যেমন লেখাপড়া না জানা। কাজের কায়দা না জানা। আমাদের অধিকার না জানা। আইন না জানা। ছোট পরিবারের সুবিধা না জানা।' (১ : ৪০)

অনুচ্ছেদটিকে একটু ভেঙে দেখা যাক। 'অনেকভাবে' ভোগার জন্যে প্রথমে দায়ী হলো গরিব মানুষ নিজেই; তারপর সমাজ কাঠামোর প্রসঙ্গ এল, হঠাৎকরে জুড়ে দেওয়া হলো তার পরিবর্তনের কথাও; শেষে আবার এসে গেল কর্তব্যের তালিকা : লেখাপড়া জানতে হবে, আইন-অধিকার বুঝতে হবে। (যেন এইসব পড়া খাঁড় সংক্রান্ত বাজারে পাওয়া যায়; শুধু জনগণ বোঝে না, তাই এ-সবের সুযোগ নেয় না।)

একই সুর পাওয়া যাবে এই অনুচ্ছেদটিতেও :

'আমরা অনেক খা খাই। অনেক দুঃখ পাই। তার জন্যে কিছুটা আমরা দায়ী। কিছুটা সমাজ দায়ী। তবে জানা বা দৈব দায়ী নয়। যে দায়ী বা যারা দায়ী তাদের জানব। জোট বাঁধব।' (১ : ৫১)

সমাজ 'কিছুটা' দায়ী স্বীকার করে নিয়ে বামপন্থার পরিচয় দেওয়া হলো; দৈব দায়ী নয় বলে একটু যুক্তিবাদের মিশেল দেওয়া হলো। তারপরেই এসে গেল স্লোগান : জানতে হবে। জোট বাঁধতে হবে। পড়ে দেখুন এই অংশটি :

'গাছপালা না থাকলে অনেক বিপদ। খরা দেখা দেয়। বন্যা কমে না। আমরা গাছপালা লাগাব। কাটব না।' (১ : ৫১)

এখানেও পরিবেশ ধ্বংসের জন্যে দায়ী হলো গ্রামের মানুষই। তৃতীয় পাঠের এক জায়গায় (পৃ. ১০-১১) কারখানার কারণে দূষণের উল্লেখ আছে আর সমাধান দেওয়া আছে এ-রকম : 'আমরা নিজেরা বুঝব। অন্য উপায় অন্যদেরও বোঝাব। দূষণ কমানো র জন্য জোরালো জনমত গড়তে হবে।'

আবার দেখুন এই অনুচ্ছেদগুলি :

'দেশের মানুষ সমান হবে। পুরুষ ও মেয়ে সমান হবে। ছেলে আর মেয়ে সমান হবে। ধর্মের ভেদ থাকবে না। জাতির ভেদ থাকবে না। দেশ বড় হবে।' (১ : ১৬)

'আমরা দেশকে গড়ে তুলব। পরিবার গড়ে তুলব। সমাজে কোনো ভেদ থাকবে না।' (১ : ১৭)

এই রকম মাস্টারি ভঙ্গিতে কিছু উপদেশ আর জ্ঞানের কথা শোনালেই কি মানুষ সেগুলো জীবনে প্রয়োগ করতে পারে? অথবা – উল্টো দিক থেকে দেখলে – এইসব ভালো ভালো কথা কি সত্যিই মানুষের জানা নেই? জানা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা সেগুলি প্রয়োগ না করে, তার কারণ নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আছে। কিন্তু সেই অনুসন্ধান কোথায়? বিষয়গুলিকে যদি সমস্যা হিসাবে উপস্থিত করা হতো, আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে সমস্যাগুলিকে উলটে-পালটে বিচার করার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে কিন্তু সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুসন্ধান আর অনুধাবনের কাজটাও হয়ে যেতে পারত। দুঃখের বিষয়, সেই সুযোগ এখানে নেই।

উত্তর চব্বিশ-পরগনার কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে বইগুলি নিয়ে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের মতে, বিষয়গুলি ঠিকভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে; মানুষকে যে মিলেমিশে থাকতে হয়, এটাও 'ওরা' বোঝে না – বোঝাতে হবে। এটাও বলতে হবে যে, দুটো বাচ্চাকেই যখন ওরা মানুষ করতে পারে না, তখন ওদের চার-পাঁচটা বাচ্চা হওয়া উচিত নয়। জানতে চেয়েছিলাম, কোনো শিক্ষার্থী যদি প্রশ্ন করেন, দুটো বাচ্চা থাকলেই যে তারা খেতে পরতে পাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? – তাহলে কী উত্তর দেওয়া হবে। শুনে একজন শিক্ষিকা বিরক্ত হয়ে বললেন, এ-সব প্রশ্ন আপনিই তুলছেন; আমরা এতদিন পড়াচ্ছি, আমাদের কেউ এই রকম কোনো প্রশ্ন করে নি।

সন্দেহ নেই, মন খুলবার পদ্ধতি যদি সত্যিই প্রয়োগ করা হতো, তাহলে বোধহয় এ-রকম প্রশ্ন উঠতই। গরিব মানুষের বহুসন্তানের কারণ তাদের অজ্ঞতা – এটা খুবই একপেশে ধারণা! অন্য দিকের যুক্তিও আছে। যেমন, বেশি ছেলেমেয়ে হওয়া মানে সংসারে বেশি কাজের লোক পাওয়া। এছাড়া অপুষ্টি বা রোগের কারণে সন্তানের মৃত্যুর ভয়-ও গরিব পরিবারে অনেক বেশি। ছোটো পরিবারের কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে, কিন্তু এইসব যুক্তি এড়িয়ে গিয়ে নয়। দু-দিকের যুক্তিকেই সামনে রেখে একটি প্রশ্নের বাস্তবতাকে প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া, তারপর প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন, অনুসন্ধান আর অনুচিন্তার ভেতর দিয়ে একটা বোধে পৌঁছনোর এই যে প্রক্রিয়া – পাওলো ফ্রেয়ার যাকে বলেছিলেন 'প্রশ্নের শিক্ষা প্রক্রিয়া' – একথা সাক্ষরতার একটা খুব বড় দিক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে হিসাবে ধরেই নেওয়া হয়েছে, নিরক্ষর মানেই নির্বোধ। তাদের শোনাতে হবে দামী দামী সব জ্ঞানের কথা। তাই সাক্ষরতা মিশনের নির্দেশ অনুসারে জাতীয় সংহতির বোধ জাগাতে চেওয়া হয়েছে এই রকম অনুভবাণী

পড়িয়ে :

'এই দেশের নাম ভারত। নানা জাতি আছে। নানা ধর্ম আছে। নানা ভাষা আছে। তাহলেও আমরা এক।' (১ : ২৪)

'ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ধর্ম নিয়ে রাষ্ট্র কখনো মাথা ঘামায় না, ভারতের মানুষ যে যার মত ধর্ম মানেন। ভারতে সব মানুষ সমান, নারী ও পুরুষের মর্যাদা সমান।' (৩ : ১০)

নারী-পুরুষের সমতার কথা পুস্তকগুলিতে বহুবারই আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গের সঙ্গে নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে যুক্ত করা হয়েছে, এটা অবশ্যই একটা ভালো দিক। কিন্তু সমতার প্রশ্নটিকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে বিষয়টির জটিলতাও ধরা পড়ে না। দুটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। প্রথম পাঠের এক জায়গায় (পৃ. ৬৮) বলা হয়েছে :

'আজকাল দিন পালটেছে। মেয়েরাও বাপের মান রাখছে। বাবা-মাকে দেখছে। তারা রোজগার করছে।... ছেলে আর মেয়েকে আলাদা করলে আমরা ভুল করব।'

মেয়ের স্বাধীনতার চেয়ে বাপের মানটাই যেন এখানে বড় হয়ে গেল; কিংবা আজকাল মেয়েরা রোজগার করছে বলেই যেন তাদের মর্যাদা দিতে হবে। রোজগার না করলে যেন তাদের মর্যাদা পাবার অধিকার নেই। প্রায় একই রকম সুর দ্বিতীয় পাঠেও (পৃ. ১৮

'ছেলে মেয়ের মতোই সম্পদ হবে যদি আমরা তাকে ঠিকমত শিক্ষা দিই।'

শিক্ষার সুযোগ-না-পাওয়া মেয়ে কি তাহলে পরিবারের বোঝা হয়ে থাকবে?

এ-রকম দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা আরো উদ্ধৃত করা যায়। ইতিমধ্যে একটি পত্রিকায় দেখলাম, ভারতে সাক্ষরতা কার্যক্রমে লোকসংস্কৃতি-মাধ্যম ব্যবহার হচ্ছে যেন তাঁরা সম্পূর্ণ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ব্যবহারের একটি নমুনা দেখুন। যেমন নারী-পুরুষকে পরিচ্ছন্নতা শেখানোর জন্যে বাঁধা হয়েছে এই গান :

'ও ভুলুয়া মা, ভুলুয়া মা। আমরা নোংরা থাকব না। আমরা যদি নোংরা থাকি। মানুষ তো আর থাকবে না।'

(সূত্র : 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, [illegible])

সাক্ষরতার নামে মানুষকে অপমান করার দৃষ্টিভঙ্গির স্পর্শ পুস্তকগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা একটি সামাজিক প্রতিবাদের বিষয় হতে পারে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাশকার্ডের পেছনে এক চিকিৎসক গ্রামবাসীদের বুঝিয়েছেন : 'পুকুরের জল মানুষ নিজেরাই ব্যবহার করে নোংরা করে ফেলে। ফলে সে জলে লক্ষ লক্ষ রোগজীবাণু ঘুরে বেড়ায়। ঐ জলে তাই অসুখ হয়। কখনোই নোংরা জল পান করা উচিত নয়।'

দয়া করে অনুচ্ছেদটি আর-একবার পড়ুন, তারপর পাশে রাখুন এই তথ্যটি : আমাদের দেশে আজও লক্ষ লক্ষ গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থাই নেই।

শ্লীল-অশ্লীল

সুমন্ত সান্যাল

প্রকাশ্যে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন এদেশে গর্হিত কাজ। অন্তত মোটামুটি তাই এখনও আছে। কিন্তু সাহেবদের দেশে সদর রাস্তার ওপরে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষেরাও চুমু খায়। পুলিশ তা নজরও করে না।

আমাদের দেশে পঞ্চাশের দশকে অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা অনৈতিক বলে মনে করত। এখন আর তা করে না। ছেলেমেয়েরা কন্ডোমের বিজ্ঞাপন দেখে ফেলতে পারে আশঙ্কায় কেউ খবরের কাগজ কেনা বা টিভি খোলা বন্ধ রাখছে না। তাতেও না।

অর্থাৎ, এক দেশে যা শ্লীল আর এক দেশের বিবেচনায় তা-ই অশ্লীল। আবার একই দেশে আজ যা অনৈতিক বলে নিন্দিত কাল তা বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকৃত। তাই শ্লীলতা বা নৈতিকতার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কিন্তু যার সংজ্ঞা দেওয়া যাচ্ছে না তার কি অস্তিত্বই নেই? উদাহরণ, যারা বিজ্ঞানের খবর রাখেন তারা জানেন যে, জিনিস, ক্রিয়া ইত্যাদি পদের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করে দার্শনিকেরা বিভ্রান্তির আওতায় পড়ে গেছেন।

অন্য পক্ষে, আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে পদার্থকে নির্ভুলভাবে চিনতে পারাই কাজের কাজ — তাদের সংজ্ঞা দেওয়া নয়। সংজ্ঞা ছাড়াই তাদের চেনা যায় — চেনানোও যায়। একই ভাবে শ্লীল-অশ্লীলের পার্থক্য করা অসম্ভব নয়।

রাজশেখর বসু রচিত চলন্তিকায় শ্লীল-এর অর্থ বলা হয়েছে 'শিষ্ট, ভদ্র' এবং অশ্লীল মানে 'লজ্জাজনক, কাম বিকারক, কুৎসিত, জঘন্য, কুরুচিপূর্ণ'। এতগুলো অর্থে অশ্লীলতার আলোচনা করতে চাই না। তাই অশ্লীলতার পরিবর্তে ইংরাজি পর্ন শব্দটি এখন থেকে ব্যবহার করব এই নিবন্ধে।

The Concise Oxford Dictionary-তে *Porn* (বা *Pornography*)-এর মানে দেওয়া হয়েছে — the explicit description or exhibition of sexual activity in literature, films etc., *intended to stimulate erotic rather than aesthetic or emotional feelings.* অর্থাৎ পর্ন বলতে বোঝাবে এমন রচনা — নাটক, ছবি, নৃত্য-গীত ইত্যাদি — যার উদ্দেশ্য হলো যৌন-কামনা জাগানো, নান্দনিক অনুভূতি জাগানো নয়।

বৃত্ত দুটি দেখুন [পরের পাতায়] :

নিঃসন্দেহে, কখ অংশটুকুকে কেবল ক বা কেবল খ বলে শনাক্ত করা শক্ত। কিন্তু তার বাইরের কিছুটা অংশটুকুকে নিশ্চিতভাবে ক বা খ বলে চিনতে অসুবিধে নেই। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত যা লিখেছেন তার অর্থ দাঁড়ায় কখ-র অস্তিত্ব ক ও খ-এর পৃথক অস্তিত্ব অপ্রমাণ করে।

ফলে দুর্বল চিত্তের যেসব লোক পর্নের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে বাস্তব যৌনক্রীড়া থেকে তা পূরণ করার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়। তারা যৌন সঙ্গীও বারবার পাল্টায় — তাতেও অবাস্তব কামনা চরিতার্থ হয় না। ফলে তারা আবার পর্নে ফিরে গিয়ে বানিয়াদের পকেট ভারি করে। তাই বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন দাউদ ইব্রাহিম, হাজী মাস্তানের মত পাপী অপরাধীরা হিন্দি সিনেমা তথা পর্ন-ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা খাটায়।

ওঁদের বক্তব্য হলো: 'নৈতিকতার মাস্তানি' ছাড়ুন, নিজেরা শোওয়ার ঘরে বসে টিভি আর ভিডিও পর্ন দেখছেন অথচ সাধারণ মানুষের বেলায় বাকি নেই। একে তো পর্নের সংজ্ঞা দিতে পারছেন না, তার ওপরে নিজেরা পর্নে আসক্ত হয়ে পর্ন বন্ধ করার কথা বলছেন — লজ্জা করে না আপনাদের? আসলে যে-সুখ নিজেরা করছেন তার ভাগ অন্যদের দেবেন না, এটাই আপনাদের কুমতলব। সাম্যবাদীদের মতো যত পর্ন চলে, চলুক না; আপনারা জানেন না যে, ডেনমার্কের মতো দেশে পর্ন সহজলভ্য হওয়ায় সেখানে যৌন অপরাধ কমে গেছে!

এই বক্তব্য একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। একথা ঠিক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, আজ সকলেই পর্ন দেখছে। কারণ, বিজ্ঞাপনে পর্নের ছড়াছড়ি। কিন্তু প্রথমত, পর্ন দেখলেই সবাই তাতে আসক্ত হয় না, এবং দ্বিতীয়ত, পর্নে আসক্ত ব্যক্তিকে পর্ন বন্ধ করার দাবি না জানাতে দিলে এইড্‌স-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকেও বলতে দেওয়া যায় না, 'আমি যে-ভুল করেছি তা যেন আর কেউ না করে — একজনের বেশি যৌন সঙ্গী রাখবেন না।' এইড্‌স-এ আক্রান্ত একজন প্রখ্যাত খেলোয়াড় তাই বলে বেড়াচ্ছেন।

পর্ন প্রকৃত যৌন সুখ দেয় না — বরং তা বিনষ্ট করে। খেয়াল করে দেখুন, পর্ন আসলে জীবন থেকে ফ্যান্টাসি মাত্র। পর্নের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বাস্তবে নারীদের নারীত্ব পর্নের মতো

উত্তেজক নয়। পর্ন ধরে নিয়ে ছিল যে—পরিবেশ ঠিকমতো হবে বলা হচ্ছে তারা সাধারণে প্রবৃত্ত থাকে—এমনকি কলকাতার বস্তির কলতলায়—অর্ধ নগ্ন হয়ে স্নান করার সময়ে একে অন্যের দিকে তাকালেও আদিম বোধ করে না। অন্যভাবে দার্শনিক তাঁর একাধিক রচনায় ঠিকই বলেছেন, পর্ন হল কৌশিক্যাল পিওর স্টাফ্। দেহের নারী থেকে যেন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাষ্পকেও বের করে নিল যা পড়ে থাকে তাই হলো পর্ন।

একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে যৌনতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি—কিন্তু পর্ন আদৌ নয়। কনজিউমারইজমের (ভোগবাদ) সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পর্ন সমাজে অনুপ্রবেশ করে। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অ্যালান বর্গ দেখিয়েছেন যে, মানুষ কনজিউমারইজম নিয়ে জন্মায় না।

কনজিউমারিস্ট সমাজে দুটি শব্দ বলা হলো, এক, 'নো-ননসেন্স বিজনেস' এবং, দুই, 'কাস্টমার ইজ সুপ্রিম'। অর্থাৎ, প্রথমে যদি কাস্টমার হয়, যদি মাল ওঠাতে হয়, তাহলে সুনীতি-দুর্নীতির ধারণাকে নর্দমায় ফেলে দাও, এবং ক্রেতা যা চায়, তা দেখে তার ভালো-না-মন্দ হবে সে-বিবেচনা শিকেয় তুলে, তাকে তাই দিয়ে ঘরে মাল ওঠাও। এই হলো নো-ননসেন্স বিজনেস।

নো-ননসেন্স বিজনেস এখানেও থেমে থাকে না। এই 'দর্শন' ব্যবসায়ীকে বলে, প্রথমে দেখ তুমি কী দিতে পার, তারপর যদি দেখ, ক্রেতা তা এখনও চায় না, তা হলে তা তাকে চাইতে শেখাও, এবং তারপরে তাকে তাই দাও। এই অর্থে, কাস্টমার ইজ সুপ্রিম।

উদাহরণত, অপটিক নামের একটা চোখের 'ওষুধের' বিজ্ঞাপনে এক সময়ে বলা হতো, মনে রাখবেন, "আপনার সারা জীবনের জন্যে মাত্র একজোড়া চোখ। তাতে সব সময়ে ধুলো-ময়লার সঙ্গে রোগ জীবাণু ঢুকছে। চোখে নিয়মিত অপটিক দিয়ে তা রক্ষা করুন।'

যে-কথাটা বিজ্ঞাপনে বলা হতো না তা হলো সামর্থ্য সুস্থ রাখার জন্যে পরিষ্কার ঠান্ডা জল যে-কাজ করে অপটিক তার চেয়ে বেশি কিছু করে না। আবার চোখ অসুস্থ হলে যেমন ঠান্ডা জল যথেষ্ট নয়, তেমনি অপটিকও কাজের নয়। তখন দরকার রীতিমত চিকিৎসার।

বিজ্ঞাপনদাতারা যেমন অবাস্তব ভয় দেখিয়ে অকেজো তৈরি জিনিস বিক্রি করে, পর্ন ব্যবসায়ীরা তেমনি বাস্তবে-পূর্ণ-করা-যায় না এমন সব আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে তাদের মাল বিক্রি করে। নানান রকমের পোশাক পরিয়ে, অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি করিয়ে, বাছাই-করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরে আলোক-সম্পাতের সাহায্যে অবাস্তব স্বপ্ন দিয়ে, প্রকারে যথাযথ দাম নিয়ে পর্ন সৃষ্টি করে কেবল আর্ত। পর্ন কিন্তু কখনই তৃপ্তি দেয় না।

ফলে দুর্বল চিত্তের অনেক লোক পর্নের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা বাস্তব যৌনক্রিয়া থেকে তা পূরণ করার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়। তারা যৌনসঙ্গীও বারবার পাল্টায়—তাতেও অবাস্তব কামনা চরিতার্থ হয় না। ফলে তারা আবার পর্নে ফিরে গিয়ে ব্যবসায়ীদের পকেটে তাদের

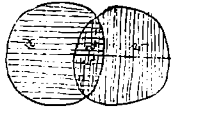

ভরে। তাই দুঃখও অনুচিত হয় না যখন দাতা ইত্যাদি, তারা সাধ্যমতো মতো দামী অন্তর্বাস কিনে কিনেনা তথা পর্ন-ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা খাটায়।

পর্ন ব্যবসায়ীরা তাদের অন্যদের বুঝতে দেয় না যে, যে-কামনা তারা তৈরি করে বিক্রি তা কেবল অস্বাভাবিক নয়—অমানবিকও। পর্ন দেখায় পাশবিক যৌনতা, যা মানুষের পক্ষে কখনই অর্জন করা সম্ভব নয়। মানবিক যৌনতা নানান দিক থেকে যথার্থ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে পাশবিক যৌনতা বৈচিত্র্যহীন।

একই প্রজাতির (species) পশুদের মধ্যে যৌনতার যে পার্থক্য হয়, মানুষে-মানুষে যৌনতার পার্থক্য হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া, পশুর যৌন-আবেগ ও সন্তান উৎপাদনের (procreation) প্রয়োজনীয়তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিবিড় সম্পর্ক থাকে। পক্ষান্তরে, সন্তান উৎপাদনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, মানুষের যৌন আবেগ তার তুলনায় অনেক বেশি। শারীরিক অপুষ্টির জন্যে তার সবটা কখনই সমর্থন করে মেটানো সম্ভব নয়। অথচ পর্ন সবসময়েই যৌন আবেগ অনন্ত রাখার স্পৃহা জন্মায়। সেই ফ্যান্টাসিতেই ডুবে থাকার চেষ্টা করে পর্নদ্রষ্টা।

ফ্রয়েডও সেক্স বলতে কেবল প্রত্যক্ষ যৌনক্রিয়া বা সেক্স পার্টনারদের বোঝান নি। যে-ব্যাপক ফ্রয়েডিও অর্থে সেক্স বহুবিধ মানবিক আচরণকে প্রভাবিত করে তার অনেকটাই চরিতার্থ হয়, অপ্রত্যক্ষ যৌনতায় (যেমন শিল্পের মূর্ছনাশীলতায়) ভর দিয়ে। (আমি সাইকোলজিস্টদের কথা তুলছি না—কারণ সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত)।

তবে সবাই মানবেন যে, এক, প্রকৃত সাহিত্য শিল্প, নাটক, নৃত্যগীত ইত্যাদি বিশেষ অর্থে যৌনস্পর্শযুক্ত হতে পারে এবং, দুই, স্ত্রী-পুরুষের যৌন পার্থক্য সত্ত্বেও তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে প্রথমত ও প্রধানত মানুষ এবং, অতএব, দুজনের মধ্যে নিছক মানুষ হিসেবে মেলামেশা, কথাবার্তা, মান-অভিমান এমনকি সম্ভবত বন্ধু-বিচ্ছেদের মধ্যেও মানবিক যৌন আবেগ অনন্ত চরিতার্থতা পায়।

বিবেচনা করলে বোঝা যায়, যে পর্ন একই সঙ্গে চটকদার ও প্রতিবিম্ব যৌনতা—কৃত্রিম সেক্স ও কেমিক্যাল পিওর সেক্স। পর্ন যে অমানবিক তা প্রমাণ করার জন্যে এই দুটি কারণই যথেষ্ট।

মানুষের যৌন জিনিস অপেক্ষাকৃত কল্পনারী, কিন্তু তার প্রকৃতি

(যথা নাচনগে) তুলনায় অনেক দীর্ঘ। তার মিলনের পূর্ণতা নির্ভর করে একদিকে একে অন্যকে তৃপ্তি দেওয়ার এবং অন্যদিকে গোপনীয়তা (privacy) রক্ষার ওপরে। মানুষ পশুর মতো হয়েছে, বা সর্বজনসমক্ষে, মিলিত হয়ে সুখ পায় না। অথচ পর্ন সেই কামনাই তৈরি করে।

অথচ, পাশবিক যৌন সুখের তুলনায় মানবিক যৌন সুখ অনেক উন্নত। মানবিক মিলনের জন্যে একে অন্যকে ভালো করে বুঝতে হয়, কিন্তু একজনের আচরণে বা কথাবার্তায় তুলনা করলে মিলন ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্যর্থ মিলন শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনে। এই অবসাদ জমতে থাকলে জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে, শান্তিতে থাকি মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে দম্পতি মাত্রেই সাইকোলজিস্টের শরণাপন্ন হয়। ডেনমার্ক তেমনি একটি দেশ।

এই প্রাবন্ধিক ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করছেন — স্কুল থেকে মাস্টার্স স্তর পর্যন্ত। তা ছাড়া, ১৯৬৯ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সে কলকাতার একজন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ড. ... সিংহ-র কাছে মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণও পেয়েছিলাম। সেই সুবাদে কিছু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে, লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে না পারার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে, আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। তাদের মধ্যে একজনের উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব। তার নাম ধরে নিন অনিল।

অনিল যখন আমার কাছে আসে তখন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে টিভি ঢোকে নি। দমদম অঞ্চলের ঠাকুরে ছেলেটির বাবা মিস্ত্রি এবং মা নার্স। একমাত্র সন্তান অনিলকে খুব যত্ন করে পড়াশোনা করিয়েছেন। সে তৎকালীন প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করার পরেও ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হতে পারে নি। সে স্পেশাল অনার্স পরীক্ষা দিয়ে, তার পরে এম এ পাশ করে অধ্যাপনা করে মা-র দুঃখ উপশম করতে চায়।

অনিল কিন্তু পড়ায় একেবারেই মন দিতে পারে না। সে প্রায় রোজ হিন্দি সিনেমা দেখতে যায়। প্রত্যেকবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে 'এই শেষ — আর না', কিন্তু অফিসের পরে নিজেকে সামলাতে পারে না, সিনেমা হাউসের দিকে এগোয়। অনেক ছবিই সে দু-তিনবার করে দেখে। পয়সা নষ্ট হয় — আরও নষ্ট হয় সময়। যদি বা কখনও বই নিয়ে বসে তো পড়া মাথায় ঢোকে না। সিনেমার দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

আমি একজন মনো চিকিৎসকের সঙ্গে অনিলের যোগাযোগ করে দিই। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়। তারপরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে, আমি তার চিকিৎসা চালানোর ওপরে জোর দিই। অনিল হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে। বলে, 'হিন্দি বই আমাকে খাবে।' তার কথায় বুঝতে পারি যে সে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে — 'আমি খারাপ জায়গায় না গিয়ে পারছি না, স্যার।'

কিছুকাল পরে জানতে পারি, অনিল আত্মহত্যা করেছে।

অনিল কেবল উদাহরণ নয়। সামান্য কিছুদিন আগে কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ খবর দিয়েছে যে, সোনাগাছিতে যৌনকর্মীদের সঙ্গে যারা রাত্রিবাস করে তাদের ৪০ শতাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্র। সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান। এদের সকলে আত্মহত্যা করবে বলে মনে হয় না। তবে ওরা অনেকেই এইড্স রোগে মরবে — তা ঠিক।

এইড্স প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে সঙ্গত কারণে স্কুল স্তর থেকে যৌন শিক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে। কিন্তু তার পাঠক্রম কী হবে? জনবাদ, রাষ্ট্রবাদ ও মুক্তবাজারবাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে কি তার পরীক্ষায় এইরকম প্রশ্ন দেওয়া হবে?

১। 'নৈতিকতার খাজানি' কাকে বলে বুঝিয়ে দেখ।

২। প্রমাণ কর যে পর্ন বন্ধ করা মানে পবিত্র মানুষকে বঞ্চিত করা।

৩। প্রমাণ কর যে দুর্বল চিত্তের লোকদের পর্ন দেখতে দিলে কারো কোনো ক্ষতি হয় না। ...... ?

উৎস মানুষ-এর আড্ডা ১৯৯৫

অবশেষে হচ্ছে—সারাদিন ধরেই

১৮ জুন □ রবিবার □ রানী ভবানী স্কুল হল

সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত

প্রধান আলোচনার বিষয়:

'দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের দ্বন্দ্ব'

এ 'আড্ডা' সবাইকে নিয়ে, তাই আমন্ত্রণ সকলের।

খরচ-খরচা ও অনুষ্ঠানসূচীর বিস্তৃত বিবরণের জন্য আগামী সংখ্যার পত্রিকায় নজর রাখুন।

ভাদর, তুমি লাল হয়ে বইছ কেন

কাহিনী আছে, যাদবদের বংশে হত্যাকাণ্ডের জন্য জীবনভর ধরা নাকি লাল হয়ে গিয়েছিল। না, গুজরাতের ভাদর নদীর কূলে কোনো বংশ হয়েছে বলে জানা যায় নি তবু তার ধারা বইছে লাল। গুজরাতের ১২৮ কিলোমিটার লম্বা ভাদর নদী, একদা মানুষের আশা ভরসার নদী, আজ নিশ্চিতভাবে পরিবেশের প্রতিকারহীন ক্ষতি করে, যাবি দায় মৃত্যু রাজকোট জেলা দিয়ে বয়ে নিয়ে পোরবন্দরের কাছে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

এ কি করে সম্ভব হলো? গুজরাতের এই সৌরাষ্ট্র এলাকা চিনাবাদাম চাষের জন্য বিখ্যাত! এখানকার একটি শহর জেতপুর। ভাদর নদীর কূলে অবস্থিত এই জেতপুরে একটি নতুন ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে উঠেছে। শিল্পটি হলো সুতি ও রেশম শাড়ি ছাপার ও রং করার কারখানা। এক জেতপুরে শহরেই প্রায় ১২০০ কারখানা গড়ে উঠেছে। এইসব কারখানাগুলি মিলিয়ে দৈনিক গড়ে ৩,০০,০০০ শাড়ি ছাপা ও রং করা হয়। এইসব উৎপাদিত শাড়ির গড় যদি ৭৫ টাকা দাম হয়, তাহলে এই শিল্প থেকে জেতপুরের বছরে আমদানি হয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এই জেতপুর ছাড়াও ভাদর নদীর দুই কূলে আরো ৫০০ ছোট বড় কারখানা গড়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে এই শিল্প থেকে সৌরাষ্ট্রে এই এলাকার আয় প্রায় তিনশো কোটি টাকা।

এই শিল্প এই এলাকায় নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধি এনেছে। শুধু জেতপুর শহরেই প্রায় ৫০,০০০ মানুষ এই শিল্পে নিযুক্ত। একজন এই শিল্পে নিযুক্ত মানুষ আট ঘণ্টা কাজ করে প্রায় ১০০ টাকা দৈনিক রোজগার করে। একজন পাটীদার টেক্সটাইল-এর মালিক ও জেতপুর ডাইং এন্ড প্রিন্টিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ধনজিভাই প্যাটেল। তিনি আরো জানান—এই শিল্পে কোনো শক্তি, যেমন বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার নেই।

প্যাটেল যা বলেন নি সেটা হলো—এই শিল্পে প্রয়োজন হয় প্রচুর জলের যা তীব্র খরা-পীড়িত সৌরাষ্ট্রের পক্ষে যোগান দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, একটি শাড়ি ছাপাতে ও ধুতে প্রায় ১০ লিটার জলের প্রয়োজন। দৈনিক ৩,০০,০০০ শাড়ি প্রস্তুত করতে চাই দৈনিক ৩০ লক্ষ লিটার জল। সৌরাষ্ট্রের পক্ষে এ জলের যোগান প্রায় স্বপ্ন। তাই ভাদর নদীর জল অবাধভাবে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহৃত জল অর্থাৎ বর্জ্যজল নিকাশির কোনো ব্যবস্থা না থাকায়, আবার তা নদীতে ফেরত দেওয়া হয়। তাই ভাদর বইছে লাল। আর ভাটির মানুষ এই বর্জ্য লাল জল রোজ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। নদীর ভাটিতে অবস্থিত ধোরাজী শহরের অধিবাসী শান্তিলাল আজমেরা এই লাল জলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। তাঁর প্রশ্ন, কী মূল্য দিয়ে জেতপুরে হাজার মানুষের রুজির ব্যবস্থা হচ্ছে? পরিবেশের এই ক্ষতির দাম দিতে হবে কতো প্রজন্ম ধরে ভাটির মানুষকে শুধু নয়, জেতপুর ও রাজকোটের মানুষকেও। ধোরাজী শহরের মানুষেরা এই লাল জলের এখনি প্রতিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন।

ভারতীয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার-এর রাজকোট বিভাগীয় ডিরেক্টর নরসিং শাহ বলেন, পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আগে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এখনি সজাগ হওয়া প্রয়োজন। এ কথা কোনো অত্যুক্তি নয়।

পরিবেশ রক্ষার সমাজ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট কোম্পানির মত রাজকোট শহরও এই সমস্যায় জর্জরিত। তবে জেতপুরের মানুষেরা এই পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বতোভাবে দায়ী। গত বছর খরার সময় প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩০ লক্ষ লিটার জল ও লক্ষ শাড়ি ছাপার আর ধোয়ার জন্য যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জেতপুরের কারখানাগুলি এই সমস্যার সমাধানে শহরের সীমানার ভেতর ছোটো ছোটো পুকুর তৈরি করে। আর সেই জল দিয়ে শাড়ি ধোয়া চলতে থাকে। এর ফলে এই লাল জল চুঁইয়ে মাটির তলে যেতে থাকে। আর ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হতে থাকে। এ বছর বর্ষা ভালো হয়েছে কিন্তু জেতপুরের সর্বনাশ রোধ হয় নি। ফলে জল চুঁইয়ে মাটিতে বসতে থাকে। এ ছাড়াও যে সব কৃষিজীবী মানুষের ক্ষেতে সেচের জন্য কুয়া ছিল—তারা খরার সময়ে নগদ মূল্যে শাড়ি ধোয়ার জন্য জল বিক্রি করেছে। তারা চিন্তাও করেনি যে ঐ জল ব্যবহার করে কুয়োর কাছে শাড়ি ধোয়ার ফল কী বিষময় হতে পারে। এই বর্জ্যনিকাশির ব্যবস্থা না থাকায় ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হতে থাকে। প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীর দুধারে ভূ-গর্ভস্থ জল দূষিত হয়ে গেছে! ৭৫-৮০ ফুট পর্যন্ত গভীর হ্যান্ড পাম্পের টিউব-ওয়েলে লাল জল উঠছে।

জেতপুরের ডাক্তার এন. এম. বামরোলিয়ার মতে, এই দূষিত জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই জল ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগ আর শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা বেড়ে চলেছে। দীর্ঘকাল এই দূষিত জল ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারও হতে পারে।

জেতপুর, ধোরাজী আর রাজকোটের জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জল অত্যন্ত দূষিত। সাসপেন্ডেড কণার (suspended solid) পরিমাণ কোনো মতেই ১০০-র বেশি হওয়া উচিত নয় কিন্তু তার পরিমাণ এই জলে ৫০০। দ্রবীভূত কণার (dissolved solid) পরিমাণ ৬,০০০ যা কোনো মতেই ২,০০০-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। সোডিয়াম (Sodium)-এর ৩০ মিলিগ্রাম, যা হওয়া উচিত ০·২ মিলিগ্রাম। সালফেট (Sulphate) ২ মিলিগ্রামের জায়গায় ৪০ মিলিগ্রাম। আর তেল ও গ্রিজের উপস্থিতি যা হওয়া উচিত তার থেকে অনেক বেশি।

এই শিল্পে প্রায় ২১ রকমের রাসায়নিক পদার্থ। যেমন সোডিয়াম-বাই কার্বোনেট (Sodium bicarbonate), ইউরিয়া (Urea), সোডিয়াম সিলিকেট (Sodium silicate), সোডিয়াম নাইট্রেট (Sodium nitrate) ব্যবহৃত হয়। জেতপুরের এক ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক—এইসব রসায়ন ব্যবহার-

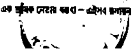

তারা প্রতিজনের আয়তনাত্মক সংখ্যা, যেমন পড়ানো, দেওয়া হয় না। ফলে গত এক বছরে প্রায় ৭,০০০ জনের উপরে রোগের শিকার হয়েছেন।

পলিউশন বোর্ডের এক আধিকারিকের বক্তব্য – এই সমস্যা সমাধানের সব প্রচেষ্টাই রাজনৈতিক হয়ে, এমন কি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বাধা পাচ্ছে – কারণ এই শিল্প নির্বাচনী তহবিলের উৎস। জল পরিশুদ্ধ করার জন্য দুই কোটি টাকা ব্যয়ে জলকল তৈরি করা হয়। মূল পরিকল্পনায় ফলে ১৭ জানুয়ারি ১৯৯২ সালে চালু হবার তিন সপ্তাহের মাথায় এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলটি আবার চালু হয়েছে।

কেন্দ্রের অবহেলাই প্যাটেল ভোরদী শহরের দুর্গতির জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করেন। তার বক্তব্য কিছুটা সত্য প্রতীয়মান হয়। তাপ্তি নদীর জল দূষিত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়াতে গুজরাট সরকার স্থির করে যে ভোরদী থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরের কোফল বাঁধ থেকে পাইপ লাইন বসিয়ে ভোরদী শহরে পানীয় জল সরবরাহ করবে। সাধু ইচ্ছা। এবং যেমন কথা তেমনি কাজ। কোফল বাঁধ থেকে ভোরদী ১৪ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসে গেল। তবে ছোট্টো একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। কোফল বাঁধ থেকে আনা জল প্রথমে তাপ্তি নদীতে ফেলে দিয়ে – তারপর নদী থেকে জল পাম্প করে শহরে সরবরাহের ব্যবস্থা হলো। সমস্যা যেমনটি ছিল তেমনি রইল। সরকারি অব্যবস্থার এর চেয়ে ভালো নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে জানা নেই।

জানা গেছে, আরো একটি বড় জল সরবরাহ পরিকল্পনা খুব দ্রুত রূপায়িত হতে যাচ্ছে। একজন স্থানীয় রাজনীতিকের মতে, এর অবশ্যই কোফল-ভোরদী জল সরবরাহ ব্যবস্থার মতোই হবে। কারণ একটি সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় নতুন একটি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারলে, পরবর্তীতে দুটি সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে – আর সেই সূত্রে অনেক রোজগার করা যাবে।

সূত্র: 'দি স্টেটসম্যান', দিল্লী ৫.১১.৯৪

সংকলক : বীরেন

আসাম থেকে ঘুরে এসে

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে 'উৎস মানুষ' পত্রিকা সবচেয়ে বেশি যায় আসামে – আসামের বিভিন্ন জেলায়। ওখানকার পাঠকরা উৎস মানুষকে কি ভাবে কতখানি নিচ্ছে, পত্রিকায় প্রকাশিত চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি আসামের মানুষকে কতখানি স্পর্শ করছে, ওখানকার সচেতন প্রগতিশীল বন্ধুদের সমাজ-ভাবনা বিজ্ঞান-ভাবনা কোন্ ধারায় বইছে – এসব জানা-বোঝার জন্য আমরা পত্রিকার দুই প্রতিনিধি সম্প্রতি আসামের কয়েকটি জেলা ঘুরে এলাম।...এক কথায় চমৎকার অভিজ্ঞতা। না – বিশাল প্রচার, অগুন্তি জনসভা, প্রচুর বাণিজ্য – এসব কিছু হয় নি অবশ্যই, কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত আন্তরিকতা আমরা পেয়েছি, এর দাম অনেক।

মার্চের ৫ তারিখ ঘরোয়া বৈঠক হয় গুয়াহাটিতে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ড পঙ্কজপানি, সৌমিত্র পাঠক ও হৃদয়রঞ্জন উপোলী বাড়ি। 'উৎস মানুষ'-এর 'আড্ডা' উপস্থিত বন্ধুদের কাছে (সাধারণ গৃহবধূ থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমিক পড়ুয়া প্রায় সাহিত্যিক পর্যন্ত সবাই একত্র হয়ে মিলেছিলেন) খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এর পরদিন আমাদের যোরহাট যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নওগাঁ-র অন্যতম উদ্যোগী সংগঠক অনিল দাস-এর আন্তরিক অনুরোধে নওগাঁ-য় ঘরোয়া সভা হয় পরদিন। ছোট্ট ঘর ভর্তি ছাত্র-শিক্ষক-উৎসাহী বন্ধুদের প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠা আমাদের অবাক করেছিল। কলকাতায় যদি এর একাংশও নিয়মিত পাওয়া যেত ......! এর পরে যোরহাটে মিটিং। খুব বেশি আড়ম্বর লোকজনের পরিকল্পনা আমাদের ছিল না; তাই বেশি লোক হবে না, তবে ছোট্ট একটা জায়গায় ব্যবস্থা করেছিলেন যোরহাটের উদ্যোক্তা বন্ধুরা। অতিরিক্ত সে টুটী অপ্রতুল হয়ে গেল বিশেষ মানুষের উপস্থিতির জন্য। প্রশ্ন-উত্তর-তর্ক-বিতর্কের মধ্যে পার করে রাত হয়ে গেল। এতখানি পাওনা হবে আমরাও ভাবি নি। সময়ের অভাবে মরিয়ানি, ডিব্রুগড় আমরা যেতে পারি নি। বারবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে – আবারো যাবো।

আসামে বিজ্ঞান আন্দোলন সেরকম সংগঠিত আকারে যেমন গড়ে উঠে নি। অনেকটাই ব্যক্তি বা ছোট্টো গোষ্ঠীর নিজেদের চিন্তা ও কাজের ভেতর সূত্র রয়েছে বলে মনে হলো। 'উৎস মানুষ'-এর প্রতি যে ভরসা ওখানকার বন্ধুদের মধ্যে দেখলাম তার কতখানি প্রতিদান আমরা দিতে পারছি জানি না, তবে বিজ্ঞান-চেতনা প্রসারের কাজের সম্ভাবনা যে অঙ্কুরিত অবস্থায় রয়েছে আসামের অনেক জেলাতেই, সেটা বেশ টের পেয়েছিলাম এই ক'দিনে।

অ. ব.

যোরহাটে 'উৎস মানুষ'

পাওয়া যাবে এখানে

গ্রন্থায়ন

যোরহাট কলেজের কাছে

ন-আলি

যোরহাট, আসাম

নতুন এবং পুরনো সংখ্যা পাবেন

অযথা আতঙ্ক—অমানবিক

'এইড্স' নিয়ে এখন দেশজুড়ে অনেক খবর, অনেক টাকা, অনেক গবেষণা, অনেক সেমিনার-কনফারেন্স। সর্বত্র থেকে দিকে দিকে ছড়িয়ে এই আন্তর্জাতিক কালান্তক ব্যাধিটি আজ অলক্ষ্যে। অভাব কেবল একটাই — এইড্স আক্রান্ত 'হতভাগ্য' নারী-পুরুষের প্রতি সামান্যতম মানবিক আচরণের; দুর্ভাগ্য এই ব্যাধিতে আক্রান্ত একটি মানুষ যখন সর্বতোভাবে সহায়তা, দয়া, মায়া আর সহমর্মিতা প্রার্থনা করে তখন অন্যত্র এই এইড্স রোগীর প্রতি অকারণ আতঙ্ক, লাঞ্ছনা, অবহেলা আর অস্পৃশ্যতা ইদানীং এক পরিচিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কেমন সভ্য সমাজ? সভ্যতার নামে ঘৃণা। এমনকি রোগাক্রান্ত মানুষটির পরিবারের লোকজনও অচ্ছুৎ করে রাখা হচ্ছে বিনা আক্ষেপে। এতবড় অন্যায় ঘটছে খোদ প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মধ্যেই; এইড্স রোগ জানা মাত্র হাসপাতাল-ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী সকলেই দূর দূর ছাই করে সরিয়ে রাখছে রোগীকে, কার্যত কোনো চিকিৎসাই তার হচ্ছে না। এই চূড়ান্ত অমানবিক সরকারি ভূমিকা আর অসচেতন সমাজের নির্মম দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হয়ে, এইড্স রোগীর প্রতি অযথা মানসিক আতঙ্ক ও মানুষকে আতঙ্কমুক্ত করার নৈতিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে কিছু ছোটো ছোটো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদেরই মধ্যে অন্যতম বেহালা নতুনপল্লীর 'বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ'। সম্প্রতি এরা বিভিন্ন মিছিল-সমাবেশের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের এইড্স আতঙ্ক কমানো ও মানবিক চেতনা বাড়ানোর প্রয়াস নিয়েছে। বহু গণবিজ্ঞান কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, ডাক্তার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামিল করেছে। একটি প্রচারপত্র ছড়ানো হয়েছে এলাকার মানুষের মধ্যে। প্রচার-পত্রটি এখানে তুলে দেওয়া হলো।

সম্পাদকমণ্ডলী উ. ম.

অযথা আতঙ্কিত হবেন না, বিভ্রান্তি ছড়াবেন না

বড়জোর পুরাতন মালখোলা (বিষ্ণুপুর) অঞ্চলের এক গৃহবধূ, সন্ধ্যা দাস, দিন কয়েক ধরে রক্ত বমিতে ভুগছিলেন, এইড্স এ আক্রান্ত হয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কলকাতা মেডিকেল কলেজে মারা যান। কিন্তু মৃত্যুকালীন শোক-সন্তাপের স্বাভাবিক বাতাবরণকেও ছাপিয়ে দেখা দিয়েছে অহেতুক আতঙ্ক আর বিভ্রান্তি। এইড্স নিয়ে প্রকৃত সচেতনতার অভাব, সংস্কার তথা সাধারণ মানুষের এলাকাকে অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত করেছে। এইড্স সংক্রমণের ভয়ে দিশেহারা হয়েছেন কিছু মানুষ। কয়েকটি পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন অপপ্রচারমূলক সংবাদ পরিবেশনের ফলে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারি স্বাস্থ্য-বিভাগের সময়মতো উদ্যোগী না হয়ে উঠতে পারার ফলে আতঙ্ক আর বিভ্রান্তি এখনও বর্তমান।

অথচ প্রকৃত সত্য হলো, রক্ত বা অন্য দেহরসের বিনিময় ছাড়া এইড্স আর কোনোভাবেই সংক্রামিত হতে পারে না। অযথা ভয় পেয়ে এইড্স রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে এড়িয়ে চলারও কোনো মানে হয় না। এমনকি স্পর্শ, রোগীর গায়ে হাত দেওয়া, করমর্দন, কোলাকুলি, রোগীর সাথে এক পুকুরে স্নান করা, রোগীর সেবা করা, রোগীর বাড়িতে জল পান বা তাঁর চায়ের বাটি ব্যবহার করলেও এইড্স হবার ভয় নেই। হাঁচি-কাশি, মশার কামড়ে এইড্স ছড়ায় না। এইড্স রোগে মৃত ব্যক্তি শ্মশানে দাহ করলেও রোগ জীবাণু ছড়ায় না।

তবে সমকামিতা, বহুগামিতা, বিকৃত যৌন-সম্ভোগ, মাদকাসক্তি (সূচের মাধ্যমে মাদক নেওয়া), অপরীক্ষিত রক্ত বা রক্তজাত দ্রব্য ও রক্তরসের দান এবং গ্রহণে এইড্স সংক্রমণের আশংকা থাকে। তাই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখুন যাতে ডিসপোজেবল বা হাসপাতালে নির্দিষ্ট ও সূচ জীবাণুমুক্ত হয়। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজনে পেশাদার রক্তদাতার রক্ত না কিনে আত্মীয়-বন্ধুরা নিজেরাই রক্ত দান করুন। আর একটা কথা, এইড্স রোগীর চিকিৎসা যাতে যত্ন সহকারে করা হয় তার সচেতন উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন এইড্স রোগী এবং তাঁর পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে, একমাসে দশ শতাংশের বেশি ওজন হ্রাস, একটানা পাতলা পায়খানা, একটানা জ্বর, শরীরের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থি ফুলে যাওয়া — কেবলমাত্র এইসব লক্ষণ থাকলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর একটা কথা, কারোর রক্তে এইড্স ভাইরাস — এইচ আই ভি — পাওয়া গেলেই যে তিনি এইড্স রোগী হবেন এমন ভাবনাও অমূলক।

অনেক এইড্স নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে এইড্স সম্পর্কে আতঙ্ক কিছুটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাবার চেষ্টা চলছে। এই রোগের পিছনে দৌড়ানো ঠিক হবে না। বরং সরকারি স্বাস্থ্যনীতি যাতে প্রকৃত অর্থেই জনমুখী হয়ে ওঠে তার জন্যে আমাদেরকেই কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এই কারণে, আমাদের দেশে প্রতি বছর আন্ত্রিক এবং কয়েকটি সংক্রামক রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যান, যদিও এসব ক্ষেত্রে নিশ্চিত চিকিৎসা ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগের নৈতিক দায়।

এই মুহূর্তে আমাদের দাবি হলো, এইড্স সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ও সত্য জানা এবং জানানো। প্রতিবেশী পরিজনদের সচেতন করা। বিভ্রান্তি আর আতঙ্কের মোকাবিলায় জোট বাঁধা। অযথা ভয় পাবেন না। এইড্স রোগী বা তাঁর আত্মীয় পরিজনদের সাথে স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। সামাজিক সম্পর্কের বুনিয়াদ মজবুত করুন।

কী করব, কোথায় যাব

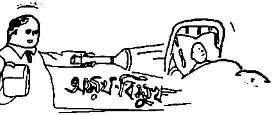

রোগ-শোক অসুখ-বিসুখ আমাদের নিত্যসঙ্গী। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন চিকিৎসা আর ওষুধ-পথ্য দুর্মূল্য হচ্ছে। বিশেষ করে মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষ অসুখে পড়লেই অসহায়, দিশেহারা বোধ করেন। এখন রোগব্যাধি ও চিকিৎসার জটিলতা বেড়েছে, তারই সঙ্গে বেড়েছে নিরাময়-ব্যবস্থার ব্যয়বহুলতা। হাজার প্রশ্ন, হাজার কৌতূহল আর আকুল অনুসন্ধানে বিব্রত মানুষের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ, ব্যাখ্যা, আর পথ্যের হদিশ দিতে পারলে অনেকখানি সহায়তা হবে বলে আমরা মনে করি। ...তাই একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কলম থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য, ব্যাখ্যা, হদিশ জেনে নেব আমরা ধারাবাহিকভাবে। গত সংখ্যায় ছিল 'বুকে ব্যথা বুক ধড়ফড়'। এ-সংখ্যায় থাকছে 'মৃগী'।
— সম্পাদকমণ্ডলী

মৃগী

মৃগী একরকম স্নায়বিক বা শারীরিক ব্যাধির একটি নাম। যাতে সাধারণত বারেবারে হঠাৎ হঠাৎ মস্তিষ্কের তড়িৎপ্রবাহের অস্বাভাবিকতার জন্য রোগীর ফিট হয়। মস্তিষ্ক বা অন্য অনেক শারীরিক রোগের কারণে মৃগী হতে পারে। আবার এমন মৃগীই আমরা বেশি দেখি যার আপাত কোনো কারণ জানা যায় না। এর পিছনে বংশগত প্রভাব থাকতে পারে। কখনও সুস্থ মানুষের এক-দু'বার ফিটের ঘটনা ঘটতে পারে, তাকে মৃগী বলা যায় না ঠিকই, কিন্তু তার ভালমতন পরীক্ষা করে শরীরে কোনো রোগ নেই এটা জেনে নেওয়া দরকার। মস্তিষ্কে তড়িৎপ্রবাহ স্বাভাবিক থাকলে এই রোগীরা সুস্থ থাকে যদিও তা তড়িৎ-রেখ যন্ত্রে (EEG) ধরা পড়ে। যখন তড়িৎপ্রবাহের বড় রকমের গোলমাল হয় তখন এক বা একাধিক লক্ষণ বা উপসর্গ রোগীর হতে পারে। যেমন –

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, অস্বাভাবিক আচরণ, জ্ঞান হারানো, শরীরের কোনো অংশে বা পুরো শরীরে খিঁচুনি। অনেক সময় মৃগীর ফিট হবার আগে নানান লক্ষণে রোগী বা তার আশেপাশের লোক অনুমান করতে পারে (aura)। ঠিক কী ধরনের মৃগী হয়েছে তার ওপর নির্ভর করবে রোগীর খিঁচুনি এবং লক্ষণ উপসর্গের ধরন।

অনেক সময় মৃগী ও হিস্টিরিয়ার (pseudo seizure) 'ফিট' বুঝতে অসুবিধা হয়। তবে এটুকুই বলছি যে এ-ব্যাপারে সবসময় চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাধারণত প্রতি ২০০ জনের একজনের মৃগী থাকে। যে-কোনো বয়সে এ রোগ হতে পারে। লজ্জা বা ভয় পাবার কিছু নেই। মৃগী, উন্মাদ রোগ নয় এবং এতে জীবনধারণ পাল্টাবার দরকার হয় না। এই রোগীরা স্বচ্ছন্দে বিয়ে করে সংসার করতে পারে।

মৃগী চিকিৎসায় সেরে যায়। চিকিৎসকের পরামর্শমত ওষুধ চালিয়ে গেলে মৃগীকে আয়ত্তে আনা যায়। মৃগীর চিকিৎসা না হলে ফিট থেকে, তাতে মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়; তাছাড়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। আর বেশিদিন এমন চলতে থাকলে রোগী সমস্ত চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। সেজন্য ফিট হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এখন মৃগীর ভালো ভালো ওষুধ পাওয়া যায় যা চিকিৎসকেরা রোগীর বয়স, পেশা, রোগের ধরন ইত্যাদি বিচার করে দিয়ে থাকেন।

ফিট হলে

যদি রোগীর খিঁচুনি না হয় তাহলে কোনো সাবধানতার দরকার নেই। শুধু দেখতে হবে অজান্তে রোগী কোনো দুর্ঘটনায় না পড়ে। ফিট হবার পর তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

খিঁচুনি বন্ধ হলেই রোগীকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিন।

[illegible]

রোগীর খিঁচুনি হলেও অনেকক্ষণ রোগী সজ্ঞানে থাকতে পারে। তখনও কিছু করার থাকে না। কিন্তু জ্ঞান হারানো রোগীর খিঁচুনি হলে কখনও তাকে চেপে ধরা উচিত নয় তাতে রোগী আঘাত পেতে পারে। দেখতে হবে যাতে রোগী ফাঁকা জায়গায় শুয়ে থাকতে পারে। সম্ভব হলে একটা রুমাল পাকিয়ে বা কোনো নরম জিনিস মুখের এক কোণে গুঁজে দেওয়া যেতে পারে যাতে জিভ দুপাটি দাঁতের মাঝখানে আসতে না পারে। কিন্তু চোয়াল শক্ত হয়ে দাঁত লেগে থাকলে তাতে জোর করা উচিত নয়। আবার দেখতে হবে কোনো কিছু গলায় লেগে যেন শ্বাসরোধ না হয়। তাই খিঁচুনি বন্ধ হলেই মুখে দেওয়া জিনিস সরিয়ে নেওয়া উচিত।

জুতো বা চাবি শোঁকানোর কোন যৌক্তিকতা নেই, এসব সম্পূর্ণ কুসংস্কার এবং এভাবে সময় নষ্ট করা বা চিত করে মুখে দাওয়া বন্ধ করা উচিত নয়। খিঁচুনি বন্ধ হলেই রোগীকে উপুড় করে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেওয়া উচিত যাতে পেটের বা মুখের জিনিস শ্বাসনালীতে গিয়ে শ্বাসরোধ না ঘটাতে পারে।

মৃগীর সম্ভাব্য কারণ

বছর বয়স	রোগ অনুসারে
০ থেকে ২	প্রসবের সময় মাথায় আঘাত বা মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব, অ্যাকুট ইনফেকশন, জন্মগত ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, হাইপোগ্লাইসিমিয়া।
২ থেকে ১২	ইডিওপ্যাথিক, অ্যাকুট ইনফেকশন, আঘাত, জ্বরের জন্য।
১২ থেকে ১৮	ইডিওপ্যাথিক, আঘাত, মাদকদ্রব্য না পাওয়া।
১৮ থেকে ৩৫	আঘাত, মাদকাসক্তি, মস্তিষ্কে টিউমার।
৩৫ বছরের ওপরে	মস্তিষ্কে টিউমার, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের গোলমাল, বিপাক ক্রিয়ার গোলমাল, মাদকাসক্তি।

ফিট বন্ধ করতে হলে

চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র একেবারে তাঁর নির্দেশ মত মেনে চলতে হবে। ওষুধ প্রতিদিন ঠিক সময়ে খেতে হবে। কখনো ওষুধ খেতে ভুল হলে যত দ্রুত সম্ভব সে ভুল সংশোধন করতে হবে। বাইরে বেড়াতে গেলে রাস্তায় অ্যাটাক পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাই প্রয়োজনের ওষুধের ছোট প্যাকেট নিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত। রোগীর সঙ্গে সবসময় মেডিক্যাল কার্ড থাকলে ভালো হয় যাতে লেখা থাকবে কী জাতের মৃগী তার আছে এবং তার জন্য সে কী ওষুধ খায়।

জুতো বা চাবি শোঁকানো নয়, মুখে নরম কোনো জিনিস গুঁজে দেওয়া যেতে পারে।

অন্তত পনেরোদিনের ওষুধ সবসময় বাড়িতে মজুত থাকা উচিত। ফিট না হলেও মাঝেমাঝে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বিশেষত দীর্ঘদিন ওষুধ ব্যবহারের ফলে ওষুধের জন্য তার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা জানার জন্য বা হলে কী হতে পারে তা জানার জন্য।

বাচ্চাদের মৃগী হলে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন কেননা তার স্কুল, খেলাধুলো, পড়াশোনা, অন্যদের সাথে মেলামেশা এসব কিছুর মধ্যে সে গোলমালে পড়তে পারে।

বহু মহিলার মৃগী থাকলেও গর্ভধারণ করে স্বাভাবিকভাবে সুস্থ বাচ্চা প্রসব করতে পারেন—এমনকি মৃগীর ওষুধ খেয়েও। গর্ভধারণ করার আগে যেসব রোগী ওষুধ খেয়ে ভাল ছিলেন তাদের গর্ভধারণের সময় সাধারণত কোনো অসুবিধা হয় না। যারা খারাপ ছিলেন তাদের অসুবিধা হতে পারে। শুধুই গর্ভধারণকালে যে মহিলাদের খিঁচুনি হয় তার সাথে মৃগী রোগের কোনো সম্পর্ক নেই।

কতদিন ওষুধ খেতে হয়

কোনো কোনো রোগীকে সারাজীবন ওষুধ খেতে হতে পারে। তবে সাধারণত ফিট হয়নি এমন ধারাবাহিক পাঁচ বছর অর্থাৎ শেষ ফিট হবার পর পাঁচ বছর ওষুধ খেতে হয়। নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারটি এই রোগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা দেখা যায় অনেকসময় অনিয়মিত ওষুধ খাওয়ার জন্য রোগীর ফিট আয়ত্তে আনা যায় না। আর, একবার ফিট হলে পরপর টানা পাঁচ বছর ওষুধ খেতে হবে। ওষুধ বন্ধ করতে হলে তা চিকিৎসকের পরামর্শেই করতে হবে এবং অনেকদিন ধরে অল্প অল্প করে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে ওষুধ বন্ধ করতে হবে।

আরও পরামর্শ

গাড়ি চালানো, সাঁতার কাটা, আগুনের ধারে কাজ করা, এইসব দুর্ঘটনাপ্রবণ কাজকর্ম সম্পর্কে রোগীকে সাবধান হতে হবে। নিয়মিত পেটভরে খাবার খেতে হবে, সঙ্গে পর্যাপ্ত জল। ঘুম যেন পর্যাপ্ত হয়। অনেক রোগীর খিদে বা ক্লান্তিতে ফিট হয়ে যেতে পারে। যে পরিশ্রমে অভ্যাস নেই তা না করাই ভালো। গরমে খুব বেশী ঘাম হলে লবণ খাওয়া ভালো।

এক এক শ্রেণীর রোগীর ফিট হওয়ার বিশেষ বিশেষ শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক কারণ থাকতে পারে, সেসব খুঁজে দেখা উচিত এবং সেসব এড়িয়ে চলা উচিত। মৃগী দীর্ঘদিনের অসুখ তাই বন্ধু বান্ধব বহু রকমের পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু রোগী যেন সবসময় চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলেন।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

এই সংখ্যায় ১১নং [illegible] 'বাসে-ট্রামে লেডিজ সিট' নিয়ে আপনাদের মতামত থাকছে। আগামী মে '৯৬ সংখ্যায় থাকছে [illegible] গর্ভ' নিয়ে ভাবনাচিন্তা।

১১. বাসে-ট্রামে লেডিজ সিট

দুই নিত্যযাত্রীর কথোপকথন:

পুরুষ— [illegible], আপনাদের জন্য এই লেডিজ সিটগুলো রাখার কোনো মানে হয় না। অন্যায় আবদার।

মহিলা— অন্যায় কেন বলছেন? [illegible]

পুরুষ— [illegible] আবার নারী-স্বাধীনতা, সমানাধিকার [illegible]?

মহিলা— [illegible]

...[illegible]

ম তা ম ত

মহিলাদের জন্যে বাসে-ট্রামে সিট সংরক্ষিত হয়। এ তো সর্বজনবিদিত। এ ব্যবস্থা না থাকলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিস যাবার ও ফেরার সময় ছাত্রী ও মহিলা-কর্মীদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেত। কিন্তু রুচিহীন মানুষের (বিশেষত পুরুষের) ঠেলাঠেলি ও বিকৃত রুচির ধাক্কাধাক্কি অনেক বেড়ে যেত। এখন অন্তত কিছু মহিলারা এর হাত থেকে সর্বদাই রেহাই পান। আবার গর্ভবতী মহিলা, শিশু-কোলে মহিলা ও বৃদ্ধা মহিলাদের সিট পাওয়া খুব জরুরী। সুস্থ-সবলা মহিলারা যখন সিটে বসে থাকেন তখনও এ ধরনের মহিলাদের সিট করতে গিয়ে নিজেদের দাঁড়িয়ে থাকা কাম্য। বাসে ট্রামে যদি ভিড় বেশি না থাকে তবে দীর্ঘ পথে যাত্রা যখন লোককে যদি কোনো তরুণী ও সুস্থ সমর্থ মহিলা নিজেদের সিট ছেড়ে দেন তা হবে সৌজন্য ও মানবতাসম্মত ব্যাপার। অবশ্য এমন মানবতার পরিচয় অনেক মহিলা দিয়ে থাকেন।

বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস

দুর্গাপুর

□□

আরাম করে সসম্মানে যাতায়াতের সুযোগ কে-না চায়? এতে একজন নারীর প্রয়োজন যতটা একজন পুরুষের প্রয়োজন কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। তবে এখন বাসে ট্রামে এত ভিড় হয় যে নিজেদের সম্মানটুকু নিজেরাই রাখতে পারি না। তারপর এ ভিড়ের সুযোগ নিয়ে দুর্ভাগ্যবশত কিছু অশালীন ভদ্রলোক মেয়েদের অসম্মান করার সুযোগ নিতে ছাড়ে না। পুরুষ শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় মহিলারা কিন্তু বাসে-ট্রামেও পুরুষের শাসন থেকে অব্যাহতি পায় না। মহিলারা সেই পরিস্থিতিতে আত্মসম্মানকে উচ্চে তুলে ধরে লেডিজ সিট এর ব্যবস্থাকে মেনে নেয়। এ না হয় গেল মহিলাদের কথা। কিন্তু অনেক পুরুষ যাত্রী আছেন যিনি শারীরিক প্রতিবন্ধী বা ঐ সময়ে অসুস্থ, তার কারণে ঐ যাত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা কোনোমতেই সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে তো পুরুষেরও সিটের প্রয়োজন সমান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা এটুকু অস্বীকার করে না যে উভয়ের কষ্টের পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ যত সহজে মহিলাকে সুযোগ দেন, একজন মহিলা কিন্তু ঐ সুযোগ দিতে পারেন না। নারী স্বাধীনতা, সমমর্যাদার যুগে আমি কিন্তু লেডিজ সিটের কথা বলতে পারব না তখনই, যখন আমরা উভয়েই উভয়ের ওপর সহমর্মিতা, সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি করতে পারব।

রিনা সামন্ত

শালিমার, মেদিনীপুর

□

আমরা যেহেতু কলকাতার বাইরের লোক তাই নিত্য দিনের অভিজ্ঞতা সেখানে বিবরণ করতে পারব না। তবে শুনেছি কলকাতার বাসে-ট্রামে প্রচণ্ড ভিড় হয়। আসলে ভিড়টা কোথায় না আজকাল হচ্ছে?

কয়েকটা জায়গা মেয়েদের সংরক্ষণ থাকত, এ ব্যবস্থাটাই হয়েছে। সর্বত্র দেখেছি, বাসে লেডিজ সিট যেগুলি রয়েছে, সেই সীট দিয়েই মাত্র মহিলারা বসে থাকার সুবিধে পান। এর বাইরেও অনেক মহিলা ভিড় বাসে ওঠেন, উঠতে হয় সাধারণত বাধ্য হয়েই। এবং অবাঞ্ছিত পুরুষের অসভ্যতার শিকার হতে হয়। অর্থাৎ সমাজে এই অবস্থা মোকাবিলা করতে সীমিতসংখ্যক লেডিজ সিটই একমাত্র সমাধান নয়, এজন্য আরও অন্যরকম ভাবে ভাবতে হবে আমাদের। তবে বাসে বা ট্রামে লেডিজ সিট মানে যারা মহিলাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে বলে ভাবেন, তারা আসলে এক ধরনের ঈর্ষা থেকে এরকম কথাবার্তা বলেন। বিশেষত, একধরনের সুবিধাবাদ – আমি পেলাম না, ও পেল, এই জাতীয় মানসিকতা থেকেই এসব কথাবার্তার সৃষ্টি।

তবে লেডিজ সিট ব্যবস্থা চালু করে যারা এই ধরনের অসভ্যতা দূর করার প্রয়াসী হয়েছেন, আসলে এখন তাদের দুঃখ হবেই পড়বে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে কী করা যায়? লেডিজ সিট তুলে দেবেন? দিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। কারণ এদেশে এখনও মহিলাদের তুলনায় পুরুষরাই যাত্রী বেশি। স্বাভাবিকভাবেই সিটের দখলকারীও হবে তারাই বেশি। এই অবস্থায় মহিলারাই অসুবিধায় পড়বেন। বাসে বা ট্রামে লেডিজ সিট তুলে দেবার যারা পক্ষপাতী তারা আগে প্রতিশ্রুতি দিন, যে অন্যায় আর হবে না, কাল থেকে ও বন্ধ। তখন…

গৌতম গোস্বামী
[illegible], সিঁথি

□

ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনোরকম সংরক্ষণের পক্ষপাতী নই। কোনো সম্পূর্ণ অংশকে বিচ্ছিন্ন টুকরোয় ভাগ করাটা নিতান্তই আমাদের পরিহাস করে। অথচ সেই বিচ্ছিন্ন টুকরো অংশের জন্য ভিন্ন অংশের ব্যবস্থা যেমন আমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী অংশের প্রতি আমাদের অন্য অংশটিকে বিরূপ করে তোলে। সমগ্র অংশের কোনো সমস্যা থেকে আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয় নিজেদের মধ্যে এই সুবিধা ভাগাভাগির দিকে। ফলে সম্পূর্ণ অংশের কোনো সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আমাদের আগ্রহ কিংবা পরিকল্পনা সংগঠিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। তত্ত্বগত এই ব্যাখ্যার নিরিখে ট্রামে বাসে লেডিজ সিট রাখার ঘোর বিরোধী আমি। কিন্তু বাসে মহিলাদের অনেকসময় নানাভাবে উত্যক্ত হতে হয়। এ কারণেই যদি মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টিকে মেনে নিতে হয় তো দেখা যাবে মহিলাযাত্রীর তুলনায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তাই এই সংরক্ষণ থাকার পরেও দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা যাত্রীদের নিগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং মহিলাদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত করে রাখাটা এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। শারীরিক প্রতিবন্ধী, অসুস্থ, বৃদ্ধ, শিশু—এদের জন্য আসন সংরক্ষণ থাকা প্রয়োজন। তারা মহিলা কিংবা পুরুষ যাই হোক। মানবিক দিক থেকে বিষয়টি ভাবতে হবে। এ ব্যাপারে দ্বিতর্ক তোলা যেতেই পারে। কিন্তু বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ না থাকায় মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

মহিলা যাত্রীরা অনেকেই সঙ্কোচের কারণে অথবা বাসযাত্রীদের সম্মিলিত ঔদাসীন্যের আশঙ্কায় নিগৃহীত হওয়ার বিষয়টি গোপন করে যান। এ বিষয়ে মহিলাদের সক্রিয়তা বাড়িয়ে তোলা দরকার। আরো বেশি করে দরকার নিগৃহীতা মহিলাটির পক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে সমর্থন করা। অনেক সময় বাসের মধ্যে বহু পুরুষ মিলিতভাবে কোনো অভিযোগকারিণী মহিলার বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে থাকেন। তখন একজন পুরুষের দৃঢ় কণ্ঠের প্রতিবাদ সেখানেই তাদের থামিয়ে দিতে পারে। এই ঘটনার আরো একটি দিক আছে। অনেক সময় দামাল ছোকরারা মহিলা-মহিলা অথবা পুরুষ-পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে হলে কিছু হয় না। নারী পুরুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটি অন্যরকম মাত্রা পেয়ে যায়। বাসের যাত্রীরা সেটিকে উপভোগ করার জন্য একটা-দুটো উত্তেজক মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়।

পরিশেষে দুএকটি কথা বলতে চাই। যাত্রীদের কথোপকথনে মহিলাকে পুরোপুরি সমর্থন করা গেল না। নাগরিক জীবনে বাসে-ট্রামে যাতায়াত যথেষ্ট কষ্টের অভিজ্ঞতা সবার জন্য। তাছাড়াও যেকোন অবস্থা আমাদের দুর্দশার নতুন মাত্রা যোগ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যস্ত যাত্রীরা তাই অসতর্ক হয়ে কোনো উত্তেজনার ফাঁড়িতে পড়লে একতরফা লোকের দোষ। আমরা অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় রত হয়ে পড়লে চালক ছোট টিকিট রাখার কর্তব্য ভুলে যান। তাদের দিকে তর্জনী তুলবে কে? সুতরাং লেডিজ সিট বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে সবাইকে। আর তারপর? তারপর বাইকে নিতান্তই অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বহীন বিষয় মনে হবে। আলোচনা শুরু হবে অন্য দিকে।

প্রদীপ সাহা
[illegible], কলকাতা

□

'অন্যায়'-কে চিহ্নিত করে বন্ধ করতে গেলে দরকার সার্বজনীন প্রতিবাদ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। 'অন্যায়' দেখে দূরে সরে যাওয়া মানে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া।

বাসে ট্রামে নারীদের সঙ্গে পুরুষের অভদ্রতা রোধের জন্য লেডিজ সিট নয়, দরকার প্রতিবাদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুর্ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সবার প্রতিবাদ।

নারীর এক বাড়তি সমস্যা, শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সে শোষিত পুরুষের দ্বারা অবদমিত।

এও এক প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, বাসে-ট্রামে লেডিজ সিট, নারীকে অবহেলা করার, অসম্মানের পুরুষ-

অন্যকে ঠেকিয়ে রাখার এক অপকৌশলমাত্র। নারী অবলা — এই রকম একটি ধ্যানধারণা কম-বেশি প্রত্যেকের মধ্যেই আছে।

এই নারীর 'সংরক্ষণ প্রথা' এই ধ্যান-ধারণাকেই আরো বাড়িয়ে দেয়। এ-ছাড়াও অসভ্য পুরুষের হাত থেকে নারীকে বাঁচানোর জন্য পৃথক 'লেডিজ সিট' প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু নারীকে বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সর্বদাই অসভ্য পুরুষের অসভ্যতা সহ্য করতে হয়।

কাজেই বাংলার যুক্তিবোধহীন 'সিস্টেম' পাল্টাতে হলে সিস্টেমকেই সর্বপ্রথম আঘাত করা দরকার। ধর্মের মোড়কে ঢাকা 'পুরুষতন্ত্র'-একেবারেই ধ্বংস করা দরকার।

প্রদীপ চক্রবর্তী
[illegible]

□—

বাসে ট্রামে ভিড় উপচে পড়ছে মানুষ। তা বলে আসন সংরক্ষণ কেন? অসভ্যতা অশালীন আচরণ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে জানি না। ক'টা আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে? তাও তো আবার সেই ছেলেদের পাশেই। ভিড় বেশি হলে ছেলেদের তো সেই মহিলা আসনের সামনেই মহিলাদের পাশেই গিয়ে দাঁড়াতে হয়। একই বাসে একদিকে ভিড় থাকবে আর মেয়েদের সামনে খালি থাকবে এতো ভাবা যায় না।

তাছাড়া প্রায়ই তো দেখা যায় — মহিলারাই লেডিজ সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্য আসনে বসে থাকেন ছেলেদেরই পাশে। অশালীনতা বলেছেন আচরণ — এসব হয়তো তখন অবান্তর।

সুতরাং বাসে-ট্রামে ঐ লেডিজ সিটগুলো রাখার ব্যাপারে কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। বরং এমনতো হতে দেখাই যায় — হয়তো কোনো মহিলা আসনে মহিলা না থাকায় শিশু / বুড়ো সেই আসনে বসে আছে; পরের স্টপে কোন সুস্থ-সবল মহিলা উঠে এই শিশু / বুড়োকে উঠিয়ে সেখানে বসতে দেখা গেল। আর সেই যাত্রী আপনার আমার মতো একহাতে ব্যাগ অন্যহাতে রড ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চললেন। তখন যদি কারও মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় — 'ধ্যাৎ মেয়ে হলেই ভাল হতো' তখন এটা নিশ্চয়ই অশালীন বা অসভ্য আচরণ হবে না।

মেয়েরা দুর্বল অসহায়, তা বলে এই সুযোগে এতখানি সুবিধা নেওয়া এটা অযৌক্তিক। শুধু কি বাসে-ট্রামে? যেখানে যাবেন সেখানেই এই সুযোগ। যেমন ধরুন স্টেশনে আপনি টিকিট কাটার জন্য লম্বা লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন ট্রেন পাবেন কি না পাবেন। আর আপনারই পাশের মহিলা কাউন্টারে এক ভদ্রমহিলা এসে দিব্যি আপনার পরে এসে টিকিট কেটে চলে গেলেন। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন চোখের সামনেই ট্রেন গেল। আমার তো মনে হয় এটা অগণতান্ত্রিক। একজন বেশি সুবিধা পাবেন, একজন কম সুবিধা — এটাতো সুবিধাবাদেরই নামান্তর মাত্র।

আজ মেয়েরা বিমানবাহিনীতে প্লেন চালাচ্ছেন, যুদ্ধ করছেন, দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু পার হচ্ছেন ছেলেদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। 'অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রথা দাবিতে' তারাও আজ প্রায় ছেলেদেরই মতো।

তাই আমার মনে হয় সংরক্ষণ যদি প্রয়োজনই হয় সেটা শিশু / অসুস্থ / প্রতিবন্ধীদের জন্য হওয়া দরকার। সুস্থ সবল মেয়েদের জন্য কখনই নয়।

আনোয়ারী মণ্ডল
[illegible], বর্ধমান

□□

শুধু বাসে-ট্রামেই নয়, প্রায় সব ভিড়-হওয়া স্থানে নারীকে একশ্রেণীর অসৎ চরিত্রের পুরুষের দ্বারা অপমানিত হতে লক্ষ্য করা যায়। সত্যিই এই ঘটনাগুলি নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে অসম্মান-জনক। এর জন্য দায়ী প্রধানত ভোগসর্বস্ব সমাজের স্খলিত মানসিকতা। কিন্তু বাস-ট্রামে আসন সংরক্ষণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। অন্যভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নারীর আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসম্মানসূচক। একটি বাসে সীমিত সংখ্যক আসন থাকে। এর মানে এই নয় যে তার মধ্যে কিছু সংখ্যক আসন কিছু মহিলার দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেলে বাসে খাড়া হয়ে থাকা অন্য মহিলারা অসৎ পুরুষের দ্বারা ঘটিত অশ্লীল কার্যাদিকে মেনে নেবে। অর্থাৎ পুরুষের অসভ্যতাদির থেকে বাঁচার জন্যই যদি বাসে আসন সংরক্ষিত করা হয়, তাহলে বাসে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য মহিলাদের চোখ বুজে সমস্ত অপমান মেনে নিতে হয়। এটা তো হতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে — বাসে তাদের জন্যই আসন সংরক্ষণ করার দরকার যারা শারীরিকভাবে অক্ষম, দুর্বল এবং রোগাক্রান্ত। সে হতে পারে একজন অচল বয়োবৃদ্ধ পুরুষ, একজন গর্ভবতী মহিলা, একজন পা-ভাঙা পুরুষ। এই ধরনের সব যাত্রী খাড়া হয়ে থাকবে আর একজন সুস্থ সবল স্বাস্থ্যবতী মহিলা সংরক্ষিত আসনে বসে থাকবে — এই ঘটনা যথেষ্ট অমানবিক।

নীলোৎপল শর্মা
নগাঁও। আসাম।

* অসমীয়া পত্রলেখকের বাংলায় লেখা চিঠির ভাষা যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা হয়েছে। — স. স.

□□

আমাদের এখানে যাত্রীর তুলনায় বাস বা ট্রাম সংখ্যা অপ্রতুল। ভিড় বাসে গাদাগাদি করে চলতে বাধ্য হই। এভাবেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ভিড় বাসে মহিলাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অনেক পুরুষযাত্রী নারীঅঙ্গ স্পর্শ করার লোভ সামলাতে পারে না। 'অসহায়তা' বলতে সুস্পষ্টভাবে সমান তালে দাঁড়ানোর স্বাধীনতার কথা বলছি। এই ধরনের পুরুষযাত্রীদের (তালিকায় বুড়ো-জোয়ান, উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, বাম-ডান, প্রতিক্রিয়া-[illegible] দাদা সবাই অন্তর্ভুক্ত) বিকৃত মানসিকতাজনিত ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া কয়েকদিন

সব মহিলা যাত্রীই আছে। লজ্জার কারণে, কখনও বা মানসিকতার জন্য, অধিকাংশ মহিলা এই সমস্ত অশালীন আচরণ মুখ বুজে সহ্য করেন; প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকেন। অবশ্য প্রতিবাদ করলে 'ভিড় বাসে একটু ধাক্কাধাক্কি হয়', 'অসুবিধা হলে ট্যাক্সিতে যান' ইত্যাদি কটূক্তি শোনার সম্ভাবনা থেকেই যায়। নারীবাদীদের কথায় যদিও প্রতি-আক্রমণ করার দায়িত্ব নারীকেই নিতে হবে বলে আহ্বান করা হয় কিন্তু যেহেতু আমাদের এখানে মহিলা নিত্যযাত্রীদের সংখ্যাধিক্য মূল এই ধরনের চিন্তাভাবনার বাইরে: ন্যূনতম প্রতিবাদ যাঁদের কল্পনাতীত, তাদের জন্যই সংরক্ষিত বাসে বা ট্রামে লেডিস সিট রাখার পক্ষপাতী। তাতে কিছুসংখ্যক মহিলা যাত্রী অন্তত কিছুকাল সহযাত্রীর কুৎসিত আচরণ থেকে রেহাই পান। ঐ পুরুষটিদের পুরুষত্ব জাহির করার ব্যাপারে আগ্রহী নই একারণে যে তারা কেবল ভীড় বাসেই সক্রিয় হন, ফাঁকা বাসে আর পাঁচটা ভদ্রলোক হয়ে যান। ট্যাক্সি বা রেলের ক্ষেত্রে, যেখানে বাসে ভীড় হয় না, আমাদের এখানে বাসে বা ট্রামে সেরকম অবস্থা হলে মহিলা আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন নেই। যতদিন তা না হচ্ছে লেডিস সিট চালু থাক। বলাবাহুল্য লেডিস সিট কোন সমাধান নয়। যতদিন নারী নিজের অধিকার সচেতন না হন ততদিন এটা চলুক। তারজন্য প্রয়োজন সর্বার্থে নারীবাদী চেতনার শিক্ষা—একেবারে শিশুকাল থেকে।

শান্তিরঞ্জন দাস
নরেন্দ্রপুর, বারুইপুর

□□

আমি সম্পূর্ণই বাসে-ট্রামে লেডিস সিট রাখার সপক্ষে। নিয়মিতভাবে রাস্তাঘাটে যাতায়াত করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি লেডিস সিট না থাকলে এদেশের মহিলাদের অসুবিধা আরও বাড়বে। যারা লেডিস সিট তুলে দেবার কথা বলেন তারা বাস্তবের মাটিতে পা না দিয়ে শুধুমাত্র আদর্শ বা আন্দোলনের দাবি ও লক্ষ্যপূরণকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। যেমনভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির জনবিরোধী কার্যকর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করেও অনেক আন্দোলনকারীকেই তাদের দেওয়া মাইনের টাকাতেই জীবন কাটাতে হয়; তেমনিভাবে নারী-পুরুষ সমানাধিকার লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও সেই উপযুক্ত সমাজব্যবস্থা বাস্তবে সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অনুকূল পরিবেশের অভাবে আমাদের প্রত্যেককেই অনেকাংশেই মেনে ও মানিয়ে নিতে হয়। এটা করতে হয় আন্দোলনের প্রয়োজনেই।

দুঃখের হলেও একটা বাস্তব যে অধিকাংশ পুরুষই বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে সভ্যতা অর্জন করলেও নারীশরীরের লোভ এখনও ঢের বেশি। তাই হাওড়ার সাবওয়েতে ২ মিনিটের জন্য লোডশেডিং হলেও এইসব পুরুষদের দাঁত-নখ বেরিয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলছি। বাসে-ট্রামে যারা নিয়মিত যাতায়াত করেন তারা জানেন যে সামান্যতম সুযোগেও নারীশরীরের দিকে হাত বাড়াবার সুযোগ সদ্ব্যবহার করার জন্যে অনেক পুরুষই প্রস্তুত থাকেন। এমন পুরুষও আমার জানা আছে যারা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বাসে ওঠেন। রুচি-সংস্কৃতির পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত পুরুষ অসুরের হাত থেকে বাঁচতে লেডিস সিটের প্রয়োজনীয়তা তাই থেকেই যাবে।

অবশ্য একথা আমি কখনোই মনে করিনা যে লেডিস সিটের ব্যবস্থা আসল কোন স্থায়ী সমাধান। বাস্তবে লেডিস সিট নারীর সুযোগ-সুবিধাগুলো অবস্থা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক কিছুটা "রিলিফ" দিতে পারে মাত্র। এরই পাশাপাশি নিয়মিতভাবে জোর কদমে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে হবে। জানি বিদ্রূপ শুনতে হবে; পাল্টা বিদ্রূপ করতেও হবে। সবক্ষেত্রে তো মেয়েদের হেরে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। লজ্জিত হবেন লোভী পুরুষেরা তাদের কুকর্মের জন্যে। প্রতিবাদ করলে সমর্থনও কিছু পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এমনকি পুরুষদের মধ্যে থেকেও। যদিও বেশির ভাগ পুরুষই সাত-পাঁচে না থাকতে চান। অধিকাংশ মহিলারাও "কী দরকার ঝামেলায় জড়ানোর" — ভেবে মুখ বুজে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকেন। তবুও প্রতিবাদ করলে যারা "পুরুষ" বা "মহিলা" নন শুধুই "মানুষ" তারা সমর্থনে এগিয়ে আসেন। প্রতিবাদ তাই করতেই হবে, যত বেশি প্রতিবাদ হবে ততই সমর্থনও বাড়বে, আর বাড়বে ওদের সাহস।

মিঠু দত্ত
[illegible], হাওড়া

□□

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেক মানুষই আছেন, যারা ভিড় বাসে বা ট্রামে উঠে মহিলা দেখলেই 'একটু ছোঁয়া'র আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। অবশ্য এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা আজকাল মহিলাদের কাছে একেবারেই গা সওয়া হয়ে গেছে। কারণ পথে-ঘাটে, স্টেশনে, বাজারে এমন স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে গেলেও এ ঘটনা ঘটেই চলেছে; তা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক। তবে আপত্তিটা ওঠে তখনই, যখন কিছু কিছু মানুষ সামান্য সুযোগ পেলেই (শুধু বাসে-ট্রামে নয়, সর্বত্র) মহিলাদের উত্যক্ত করে নিজেদের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

আসলে এ-সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এক অনিবার্য ব্যাধি—যা শুধু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে নির্মূল হয় না; এর জন্য প্রয়োজন হয় ব্যাপক জন-সচেতনতা ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। যেখানে পুরুষ শুধু 'পুরুষ' হয়েই নারীর প্রতি আধিপত্য দেখাবে না, তারা হয়ে উঠবে মানুষের মতো মানুষ।

প্রসঙ্গত, যারা নারী-স্বাধীনতা ও নারীর সমানাধিকার নিয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা সভায় গলা ফাটান, তারাই আবার ব্যক্তিগত জীবনে নারীকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেও যথেষ্ট কার্পণ্যবোধ করেন, —এটা বলাই বাহুল্য। তবে আমাদের মনে রাখা দরকার, প্রাকৃতিক কারণেই নারী পুরুষের

থেকে কিছুটা দূরে। এবং শারীরিক কারণেই নারীর সমানাধিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জটিলতা দেখা দেয়। তাই আমাদের আশু কর্তব্য হলো—নারীর সমমর্যাদাবুদ্ধি সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং কেবলমাত্র শারীরিক কারণেই নারীর সুবিধা অসুবিধার দিকগুলো বরং গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা।

পরিশেষে বলি, প্রেগন্যান্ট-ব্রেস্টফীডিং মহিলারা অসুখে পড়লে চিকিৎসার সময়ে অনেক বাধা হয়:—যা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। তাই আমাদের উচিত, নারী ও পুরুষের শারীরিক বিভেদের কারণটিকে মাথায় রেখে ওঁদের শারীরিক কিছু সুযোগ সুবিধার দিকগুলো (অর্থাৎ বাসে ট্রামে লেডিস সিট ইত্যাদি) সহজভাবে মেনে নেওয়া। এবং সেই অর্থে যদি প্রয়োজনে মিনিবাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও লেডিস সিট রাখাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি আপত্তির কিছুই দেখি না।

সঞ্জয় সান্যাল

বড়িশা, বাংলা

পরবর্তী সংখ্যার বিষয় :

১৩. একদিন…ব্ল্যাকে টিকিট :

হল-এ গিয়ে সিনেমা দেখা আজকাল আর হয়-ই না। নানা কাজে আর অবসর জোটে না, টিভি'তে এক-আধখানা ছবি দেখা হয় কখনো-সখনো। কিন্তু তাতে আরাম-সে হাত-পা ছড়িয়ে সিনেমা দেখার আনন্দ আসে না। আচমকা একদিন সুযোগ এলো—পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা, ছুটির দিন, সন্ধেটাও ফাঁকা রয়েছে। বেশ ফুরফুরে মেজাজে দুজনে চলে এলেন শ্যামবাজার বা ধর্মতলায়, সিনেমা পাড়ায়—কোনো একটা ভালো ছবি দেখা যাবে আজ। লাইন। একটু পরেই 'হাউস ফুল'। মহা ঝামেলা! একটা, দুটো, তিনটে—কোনো হলেই টিকিট নেই। এতকাল পরে যা-ও একটা সখ-আহ্লাদের সুযোগ এলো, তাও টিকিটের ফ্যাচাং। বিরক্তিকর।

এদিকে ব্ল্যাকে'র টিকিট দিব্যি পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র চার / পাঁচ টাকা বেশি দিলেই অনায়াসে হলে ঢুকে আশ মেটানো যায়। কী করবেন? নিয়ে নেবেন! ব্ল্যাকে টিকিট কাটা ভালো নয় অবশ্য, তবে একদিনের তো ব্যাপার! কবে আবার দেখার সুযোগ হবে কে জানে; অ্যাডভান্স্ কাটার তো প্রশ্নই নেই। তাছাড়া একদিনেই তো অসৎ লোক হয়ে যাচ্ছেন না আপনি! নিয়েই নেবেন নাকি, টিকিটটা? সময় চলে যাচ্ছে, এরপর এ-টিকিটও ফুরিয়ে যাবে। কী করা যায় বলুন তো!!'

এবার নিজস্ব মতামত দেবেন আপনার নিজস্ব এই দপ্তরে। ৪০০ শব্দের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্যই মার্জিন রেখে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। এক মাসের মধ্যে পাওয়া মতামত-গুলি থেকে নির্বাচন হবে। পাঠকের মতের ওপর সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না।

পরিচালকমণ্ডলী

বইপত্র :

আলোচনা / পরিচয়

ছড়ায় ছড়ায় বিজ্ঞান

বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জীবনীমূলক বই অনেক আছে কিন্তু ছড়ার মাধ্যমে তা তুলে ধরার প্রয়াস সম্ভবত প্রথম করা হয়েছে 'ছড়ায় বিজ্ঞানী' নামের বইতে। লেখক ড. কমল চক্রবর্তী। আইনস্টাইন, নিউটন, গ্যালিলিও, ফ্যারাডে, নোবেল, মাদাম কুরী থেকে সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রমুখ ২৬ জন বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্ম ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কমলবাবু। পৃষ্ঠা নং ৭ থেকে ৩২-এর মধ্যে প্রতি পাতায় ২০-৩০ লাইনের মধ্যে রয়েছে এক-একজনের সম্পর্কে ছড়া ও ছবি।

কবিতাকে বাদায় জলকে প্রথমেই শুরু হয়েছে আইনস্টাইনকে নিয়ে, শেষ জেনেরো-এ। প্রতিটির নিচে রয়েছে বিজ্ঞানীর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। প্রথম ছড়া শুরু হচ্ছে :

নিয়মমাফিক ডিগ্রী পেতে
ছিল না অনুরাগ,
তাই জোটেনি ডিগ্রী তেমন
ফাঁকা ডিগ্রীর বাগ।
বাজনা বাজাই হলেন রাজা
বিজ্ঞানের রাজ্যে
সাদাসিধে জীবনযাপন
ছিল তাঁর কাজ যে।

মোটামুটি এইটুকু লিখেই সমালোচনা থামলে ভালো হতো, কারণ বাকি যা লিখতে হবে সবটাই নিন্দা।

বিজ্ঞানীদের নিয়ে ছড়ার শুরুতে কেন আইনস্টাইন আসেন এবং শেষে জোহান মেন্ডেল তার কোনো কারণ মেলে না। ছড়াগুলো পড়ে ছোটোরা কী বুঝবে তারাই বলতে পারে। সবগুলোরই ছন্দ এবং কোনো বৈচিত্র্য নেই।

□ ছড়ায় বিজ্ঞানী / ড. কমল চক্রবর্তী

□ রানার, ১৩সি, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মূল্য : ১২ / ১৮ টাকা

আর কিন? এক উদাহরণে স্পষ্ট হবে —

শান্তিকামী ছিলেন তিনি
চার্লিন কোন ছন্দ,
দারিদ্র্যের মূর্ত প্রতীক
ছিলেন জানি ধ্রুব। (আইনস্টাইন)

এ-রকম নামাবলীর সাথে সত্যেন্দ্র, কীটের সাথে কিট, ভাগবতীর সাথে ভিন্ন পাত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। FRS, TIFR, উর্ধ্বতি বিদ্যা, কলনবিদ্যা, ওয়ার্ড হায়ার্স্টন প্রভৃতি যেসব শব্দ ছড়ার মধ্যে ব্যবহার করেছেন তা পড়ে ছোটোরা পুলকিত হবে বইটার পাতা ছিঁড়ে নৌকা বানাতে বসলে, বলার কিছু থাকবে না।

বইয়ের শুরুতে লেখক বিবেকানন্দের তিনটি বাণী ব্যবহার করেছেন। তার একটিতে আছে 'কাজের সামান্য আরম্ভ দেখে ভয় পেয়ো না, কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়ে থাকে। সাহস অবলম্বন কর।...'

দ্বিতীয়ভাবে এই কথাটা লেখককে মনে করতে বলি। ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে লেখক আরও সাবধান হলে ভালো হয়। বুদ্ধি-দীপ্ত লাইনের মতো এক বিজ্ঞানীকে পাঁচিয়ে ঢোকাবার প্রয়োজন কী? লাইন ছেড়ে কিন্তু সহজবোধ্য হলে ছোটদের কাছে আসবে। দরকার মতো তারা মুখস্থ করে আবৃত্তিও করতে পারবে। বিজ্ঞানীদের পরম্পরা থাকলেও ভালো হয়। ছিলো ব্যাখ্যার্থে ওঠাউ শব্দ ঢোকালে পরে নোট লিখে তা বলে দেওয়া যেতে পারে।

আশাকরি ভবিষ্যতে পত্রের সংবাদ এবং ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমরা সাগ্রহে নতুন ধরনের একটা বই হাতে পাবো।

সমীরকুমার ঘোষ

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ : ম্যালেরিয়া! ম্যালেরিয়া!

ডিসেম্বর ১৯৯৪-এর 'উৎস মানুষ'-এ প্রকাশিত শাহ্ বাবুর "ম্যালেরিয়া! ম্যালেরিয়া!" প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি। লেখাটির মূল সুরের সাথে একমত হয়েও কিছু বিভ্রান্তি পেলাম তাঁর ম্যালেরিয়ার ওষুধ নামক অংশে।

আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের ম্যালেরিয়া দেখা যায় — ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া আর ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া। প্রাথমিক অবস্থায় দুই ধরনের ম্যালেরিয়ার উপসর্গ বা লক্ষণ একই। সেজন্য আজও রোগীর রক্ত পরীক্ষা করেই কেবলমাত্র বোঝা সম্ভব কোন ধরনের ম্যালেরিয়া হয়েছে। আশার কথা, দু ধরনের ম্যালেরিয়ার সাধারণভাবে একই ওষুধ কার্যকরী এবং ব্যবহার করা নিরাপদ।

শাহ্ বাবুর লেখায় ক্লোরোকুইন-এর ক্ষেত্রেই কোনো উল্লেখ না থাকায় বিস্মিত বোধ করেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে হলো উভয় ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় কেবলমাত্র ক্লোরোকুইন ব্যবহার করা উচিত। তেমন বিজ্ঞানের প্রামাণ্য বই Goodman Gilman একথা এড়িয়ে সব ধরনের (বলাই যে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া ইতিমধ্যেই ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী হয়ে গেছে তা ছাড়া) ম্যালেরিয়ার নিরাময় এবং প্রতিরোধে এই ক্লোরোকুইন-ই ব্যবহার সুপারিশ করেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বিধি হলো এই রকম — ক্লোরোকুইন ২৫০ মি.গ্রা. বড়ি প্রথমেই ৪ বড়ি ৬ ঘণ্টা পরে আবার ২ বড়ি, পরের দু'দিন একসাথে ২ বড়ি করে মোট দশ বড়ি তিনদিন খেলে ম্যালেরিয়া সেরে যাবে।

নানারকম ওষুধপত্র এবং অপব্যবহারের ফলে ভারতের বেশ কিছু দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার পরজীবী ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী হয়ে গেছে। এইসব ক্ষেত্রে কুইনিন ব্যবহারে উপকার হয়, আর তাই কুইনিন-কে ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

কিন্তু চিকিৎসক ক্লোরোকুইন-এর পরেই অনেক রোগীকে প্রাইমাকুইন দেন। উদ্দেশ্য হলো শরীর থেকে পুরোপুরিভাবে ম্যালেরিয়ার পরজীবী নির্মূলকরণ radical cure। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে হলো আমাদের মতো ম্যালেরিয়াপ্রবণ দেশে (endemic zone) এতে কোনো লাভ নেই। কারণ যেদিন শরীর থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা হবে সেদিন বা তার পরে যেকোনো দিন আবার সংক্রমিত মশা কামড়াতে পারে এবং ম্যালেরিয়া হতে পারে। তাছাড়া প্রাইমাকুইন ব্যবহারে সব সময়েই বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ক্লোরোকুইন ম্যালেরিয়া রোগে কুইনিন এর চেয়ে বেশি কার্যকরী এবং কম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন, যদিও কুইনিন সেবন করলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি এমন কি অন্ধত্ব পর্যন্ত হতে পারে। তবে আশার কথা, কিছু ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার পরজীবী ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার এ ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করার কথা জানা যায় নি।

শাহ্ বাবুর মূল সুরের সাথে সুর মিলিয়ে বলি ম্যালেরিয়া দুর্গত জনসাধারণের সমস্যা। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারদের। এর মধ্যে স্বনামধন্য অধ্যাপকরাও আছেন। অজ্ঞতা এবং বেশ কিছু ব্যবসায়িক স্বার্থান্বেষী এই চিকিৎসাকে করেছে জটিল। আর তাই এখন পর্যন্ত

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন একটি সঠিক জন-আন্দোলনের রূপ না নেয় ততক্ষণ কোনো আশার আলো দেখতে পারছি না।

তাপস ভট্টাচার্য
কলকাতা

লেখকের বক্তব্য

তাপস ভট্টাচার্যের চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অকপটে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি। আসলে ক্লোরোকুইন-এর সঙ্গে ক্লাইওকুইনল-এর একটা গোলমাল হয়ে গেছে, যদিও শেষোক্তটি আয়োডোক্লোরো-হাইড্রক্সিকুইনোলিন, তবু একটা মিল আছে। আর কে না জানে যে জাপানে এই ওষুধটি ব্যবহারজনিত কারণে অন্ধত্ব দেখা দেওয়ার ফলে এক বিরাট সংখ্যক চিকিৎসকের চাপে সিবা গাইগি তাদের অন্যতম চালু ওষুধ মেক্সাফর্ম-এর উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিলো। তবে ভারতে নিয়মিত এন্টারোভায়োফর্ম-এর মতন চালু ওষুধও। ডা. ভট্টাচার্য'ও স্বীকার করেছেন যে, ক্লোরোকুইনের দীর্ঘ সেবনের ফলে অন্ধত্ব পর্যন্ত ঘটতে পারে। সম্ভবত এইসব ধারণা থেকে ক্লোরোকুইনের মতন অন্য ওষুধের ব্যাপারটা বলে চলে গেছে। এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের ক্লোরোকুইন-প্রতিরোধী হয়ে যাওয়া নিয়ে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল Time-এর ১৯৯৩-এর ৩১ মে সংখ্যায়। The parasite began to demonstrate its ability to adapt to drugs in the 1960s when chloroquine started losing its punch. Other drugs have since been added to the arsenal sulfadoxine-pyrimethamine (Fausidar) in the 1970s, mebloquine hydrochloride (Lariam) in the 1980s, halofantrine (Halfan) in the 1990s. All have lost some of their effectiveness, in some cases as much as 50%. The Combination of quinine and tetracycline is still 90% effective in treating simple malaria says Lieut. Colonel H. Kyle Webster, a malaria expert at the Walter Reed Army Institute of Research in Washington. "But we are begining to see failure with quinine given intravenously. If we lose quinine, the prospect of untreatable malaria is real."

এই প্রসঙ্গেই আমরা 'উৎস মানুষ'-এ প্রকাশিত ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত রচনায় Qinghaosu নামক চীনিক বৃক্ষটি ও সেই বৃক্ষ থেকে জাত ওষুধ artemether নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছিলাম। এক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ সংশোধন করে বলি, আর্টিমিসিন এবং আর্টিমেথার একই ধরনের ওষুধ হলেও দ্বিতীয়টি আসলে প্রথমটির উপজাত। Qinghaosu বা Artemisia annua L থেকে সংগৃহীত আর্টিমিসিন যথেষ্ট সক্রিয় হলেও বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। এ কারণে বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের যৌথ উদ্যোগে আর্টিমিসিনের যে দুটি উপজাত (derivative) তৈরি হয় তার মধ্যে আর্টেমেথার সর্বাপেক্ষা কার্যকর। ভারতীয় গবেষকবৃন্দ ফ্যাক্টরিতে পরীক্ষা চালিত হলেও এটির প্রাথমিক বাণিজ্যিক উৎপাদন ঘটেছে চীনে। এবং আশা করা যায় ভারতীয় বাজারেও অদূর ভবিষ্যতে এটির আমদানি ঘটবে ক্লোরোকুইন এবং কুইনাইন প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের মোকাবিলায়। ১৯৯৪-এ ১৪ এপ্রিল United Nations Development Programme (UNDP)-এর সমর্থিত Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়:

The two-year trial, covering 97 patients with severe and complicated multi, drug resistant malaria on the border of Thailand and Cambodia, was Conducted by Dr. Juntra Karbwang of the Hospital for Tropical Diseases, Mahidol University, Bangkok, at the Chantaburi Provincial Hospital in Eastern Thialand. The trial was suppotrd by TDR of UNDP, The World Bank and WHO, When the results were analysed last month, they proved that intramuscular injections of 'artemethor' a derivative of extracts of the chinese herb Artemisia annua L has saved the lives of 87% of paticnts with severe malaria.

TDR-এর এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির অন্য এক জায়গায় লেখা হয়েছে—'Dr. Karbwang's study is of particular importance', said Dr Tore Godal, Director of TDR, "because it has been Conducted in an area where the malaria parasite has become a monster with resistance to most of the commonly used drugs, including chloroquine, mefloquine, halofantrine, Sulfadoxine/pyrimethamine Combinations, and now quinine. The trial shows that despite such resistance, the parasite can be controlled with artemether.'

সুতরাং ডা. তাপস ভট্টাচার্যর বক্তব্য—'...কিন্তু ক্লোরোকুইনের ম্যালেরিয়ার পরবর্তী

ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার এ ধরনের প্রতিরোধ করেনি। এমন কোনো কথা জানা যায় নি।' সম্ভবত একথাটা সঠিক নয়।

তবে এ ব্যাপারে আমি ডা. ভট্টাচার্যর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, সরকারি চালাকি, কিছু কিছু চিকিৎসকের ইচ্ছাধীন মনোভাব এবং সার্বিক জনচেতনা না থাকলে ম্যালেরিয়া নিয়ে কিছুই করা যাবে না। একসময়ে চীনে বছরে প্রায় ৩ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতো। চীনের জনসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৯৯২ সালে সেখানে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে অবশ্যই চীনকে অনুসরণ করতে হবে।

একথা বাস্তব যে, এক্ষেত্রেও আছে। সেবা সর্বস্ব যাঁরা চিকিৎসকের মধ্যে সাম্প্রতিক এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হলেন ডা. অসীম চ্যাটার্জি। সন্দেহক্রমে নিরাপদ জনৈক এই প্রাইভেট চিকিৎসকের ভুল ধারণার, অন্যের হাত ভাঙার। তথাপি তিনি কুইনাইন নিয়ে, ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় সরকারি অনাচার নিয়ে, তাঁর একক আইনী লড়াই চালিয়ে সদ্য জয় অর্জন করলেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে।

শান্তু ঘোষ
কলকাতা

একটা মেয়ে···সারাজীবন শান্ত সংযত···কত লোক বাড়বে চাঁদা নিয়ে টানাটানি করে — সমাজ তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না।···এইসব আজেবাজে কথা শুনতে শুনতে মেয়েটির এক সময় সমস্ত শক্তির জোর, মনের জোর হারিয়ে যায়। সে তখন সমাজের মুখাপেক্ষী হতে ভয় পায়। যাঁরা লেখার করেন, যাঁরা সমাজসেবী, তাদের কথা ভিন্ন। আমি আলোচনা করছি সাধারণ কথা, যেটা প্রত্যেকটি সমাজের মুখাপেক্ষী হয়। আমরা একটি মহিলাকে অনায়াসে সমাজচ্যুত করে দিই, কারণ আমাদের সমাজে নারীর স্বাধীনতা নেই। বিবাহ না-করা প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়।

মিঠু দত্ত

প্রসঙ্গ : অবিবাহিতারা কি অসামাজিক ?

বিবাহিত আর অবিবাহিত মেয়েদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা বিরাট ফারাক আছে। বিবাহিত মেয়েই নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য এক জগতের মানুষ। আর বিবাহিত নারী স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এমন নজির নাই বা একটা। অনেক বলবে স্ত্রী উনি, অমুকের মা উনি — এসব কথাতেই তো চলছে আমাদের সমাজটা। আসলে আলাদা এক ব্যক্তি হিসাবে নারীরা নিজেদের ভাবতে পারেন না — চানও না। বিয়ে-না-হওয়া নারী সম্পর্কেই আমরা মুখ ঘোরাই, নির্দিষ্ট ভবিষ্যত দেখি। সবাইয়েরই একটা কল্পনা থাকে তাদের উপর। বিবাহিত জীবন যে-কোনো মানুষের পক্ষে অপরিহার্য — একটি নারীর পক্ষে তো বটেই। এই অপরিহার্য জীবনযাত্রার পথে কেউ কেউ ইচ্ছা করেই এগোতে চান না। কিন্তু বেশির ভাগই চান — পারেন না। কারণ পরিস্থিতি। এখনও পাত্রকে যে পরিমাণ টাকা দিয়ে কিনতে হয় তা অনেক পিতা-মাতা পারেন না। আবার যাঁরা ভাবেন নিজেরাই পাত্র-নির্বাচন করবেন 'প্রেম' নামক আবেগময় শব্দটির দ্বারা, তারা অনেকেই 'প্রথা' নামক শব্দটির কাছে পিছিয়ে পড়েন। কারণ প্রেম হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে — কিন্তু বিবাহ তো হয় প্রথা মেনে! যেমন বাড়ি মা-বাবাদের। পণ ছাড়া প্রেম হয়, বিবাহ তো হয় না। ফলে বাড়িতেই মেয়েটিকে থাকতে হয়। আইবুড়ো হয়ে বাড়িতে থাকার অর্থ বাড়ির পরিবেশের পরিবর্তন। পিতা-মাতা, বাড়ির পরিজন, যেভাবে স্নেহের মায়া দেখিয়েছেন, তার মুখগুলোকে এক এক করে চিনতে হয়। এতে মাতা-পিতা ক্রমশই অসহায় হয়ে পড়েন। অন্যদিকে বাড়িতে যদি অবিবাহিত 'দাদা', বা ভাই থাকে, সে-ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ তারও চলার পথে অবিবাহিত দিদি বা বোনটি বাধার সৃষ্টি করে। সব মিলিয়ে পরিবারের দিক থেকে মানসিক চাপ পড়ে মেয়েটির উপর। সে তখন পরিবারের মধ্যে থেকেও পরিবার থেকে নির্বাসিত হয়। অন্যদিক থেকে সামাজিক চাপ আসে। অবিবাহিত মেয়েটিকে ঘিরে সমাজের কৌতূহল বাড়ে। সকলেরই এক প্রশ্ন থাকে, কবে বিয়ে হচ্ছে? কেন বিয়ে করছো না? পণ চাইছে বুঝি? — ইত্যাদি প্রশ্নের পর আছে নির্দেশ — বিয়ে করে ফেলো, পণ তো দিতেই হবে এ দেশে···সমান বয়সে···তা-ছাড়া একা

পত্রিকার পক্ষ থেকে

পত্রলেখিকার বক্তব্য বা মতামত অনেকটাই একপেশে। এ বিষয়ে আরো অনেক কথাই বলার থাকে, অন্য মতও পোষণ করেন অনেকেই। বিষয়টি নিয়ে মত-বিনিময় হোক, বিতর্ক হোক, আমরা চাই। তাই পাঠক-পাঠিকার চিঠি আহ্বান করা হচ্ছে এ বিষয়ে।

সম্পাদক মণ্ডলী

প্রসঙ্গ : ব্রাহ্ম জন্মদিন ইত্যাদি

উৎস মানুষের অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় ঐন্দ্রিলা দেবীর লেখার প্রতিবাদটি পড়ে কিছু কথা লিখতে বাধ্য হলাম।

লেখিকার কাছে একটি প্রশ্ন আমার — উক্ত ভদ্রলোক জন্মদিনের উৎসবে ধর্মবিশ্বাসী আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ দেবেন কেন? যত জন্মই হোক, অবিশ্বাসীদের নিয়েই তো তিনি উৎসব করতে পারেন। আসলে তিনি আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান, এবং সম্পর্ক রাখতে গেলে তাদের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকা চাই। নাহলে আমরা ধরে নেব ভদ্রলোকের উপহারের লোভ আছে।

তিনি লিখেছেন — "আশ্চর্য, মা আমি জেনে

নিতে পারি না—যাতে উপস্থিত থেকে অংশ নেব কিভাবে?" যে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেই অংশ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমরা কিছুই করবো না। নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে চলে আসব। আমরা উপস্থিত না থাকলেই প্রাণ কাটা বন্ধ হবে না। সেজন্য সেখানে উপস্থিত থেকে প্রাণীহত্যার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বোঝানো দরকার। দু'চারজন লোকও যদি আমাদের সমর্থন করে তবু কিছু কাজ হবে।

"ধর্মাচরণে উৎসব করাটা অপরিহার্য নয়"—আমার এই কথা থেকে লেখক কি করে "প্রাণীহত্যা করে উৎসব করাটা অপরিহার্য"—এই সিদ্ধান্ত টানলেন বুঝলাম না। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটানো ছাড়া অন্য কোনো অপরিহার্য বস্তু নেই।

আমার মেয়েকে ব্রাহ্মণী বিয়ে করতে কোনো যুবক এগিয়ে আসে নি এর অর্থ এমন নয় যে প্রাণীবলিতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমার সামাজিক সম্পর্ক নেই। এর অর্থ—যুবকদের পরম্পরা ভঙ্গ করার সাহসের অভাব।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এবং তাতে অংশ নেওয়া এক কথা নয়। কথা হলো ধর্মকে নির্মম হাতে ভাঙতে গেলে ফল উল্টোই হবে। আজ আমরা দেখছি—সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিতেও ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয় নি। অর্থাৎ সেখানে ধর্মকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। এই বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অথচ শ্রেণীহীন সমাজে ধর্ম না থাকার কথা। ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মানসিকতায় ধর্মের শেকড় এতদূর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে যে তাকে উৎপাটিত করা সহজ নয়।

ধর্মের বিরোধিতা করতে গেলে আদিম মানুষের জায়গায় ধর্মের কেন আবির্ভাব হলো, বিজ্ঞানের আবির্ভাব কেন হলো না, যদিও আদিম বিজ্ঞানেরই আদি যুগ—এই সবের সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মসমূহ জানা দরকার। গায়ের জোরে ধর্মের বিরোধিতা করতে গেলে কিছুই ফল হবে না।

লেখক যেহেতু বিজ্ঞানকর্মী এবং আমিও বিজ্ঞান সমর্থক, আমাদের মধ্যে মিল হওয়া দরকার। কারণ আমাদের একই লক্ষ্য—ধর্মের বিলোপ সাধন। কিন্তু বিজ্ঞানকর্মীদেরও মনে রাখা প্রয়োজন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ধর্মকে উচ্ছেদ করা যাবে না, প্রভাব কমানো যাবে মাত্র। সুতরাং প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে সমাজকে পরিবর্তন করা।

ধীরেন্দ্রনাথ শর্মা
পাঠশালা, বরপেটা, আসাম

প্রসঙ্গ: 'শিরিষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে'

চৈতী, বেলেঘাটা বিশেষ করে পশ্চিমপাড়া গ্রামটি হুগলী জেলার মনোরম গ্রাম এলাকাগুলির অন্যতম। সরস্বতী নদীর দুদিকের ঐ গ্রামগুলি নানা ধরনের গাছ ও জলাশয়ে ঘেরা। নানা জাতের পাখি, সজারু, খরগোশ, বনরুই, শিয়াল, বেজী প্রভৃতি বন-জঙ্গলের বাসিন্দা, অসংখ্য কাঠবিড়ালী এখানকার মানুষজনের সঙ্গে আত্মীয়তার বাঁধনে বাস করে থাকে। প্রতীচী শান্তিনিকেতন এই গ্রামগুলিতে শীতের পাখির সংখ্যা কম নয়। এখানকার সজীব প্রকৃতি নির্মল বাতাস ও নির্মল জল চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও আমাদের এখানে সুখে দুঃখে বেঁচে থাকার এক মস্ত অবলম্বন।

১৯৯০ সালের আগস্ট মাস থেকে চৈতী গ্রামের মাঝে গড়ে ওঠা ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স (ডি সি সি)-টি তার উৎপাদন শুরু করে দেয় এবং প্রতিবছর প্রায় ১৩ কোটি কিউবিক মিটার কোল গ্যাস এই অঞ্চলের বাতাসে ছেড়ে দিতে থাকে।

এই গ্যাসে আছে নানা ধরনের হাইড্রো-কার্বন যা বিশেষজ্ঞদের মতে ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। এছাড়া এই গ্যাসে থাকে হাইড্রোজেন সালফাইড এবং বেনজাইন নামের দুই বিষাক্ত যৌগ যা হৃদ ও ফুসফুসের ক্ষতি সাধন করে থাকে। কোল গ্যাসের মধ্যে কিছু পরিমাণে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড গ্যাসও থাকতে পারে যা অত্যন্ত বেশী মাত্রায় ভুপাল গ্যাসে ছিল এবং এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সৃষ্টি করেছিল।

তাছাড়া ডি সি সি প্রচুর আলকাতরা, তেল-জাতীয় এবং অন্যান্য চটচটে পদার্থ এবং দৈনিক প্রায় ২০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট জলে ছেড়ে দিচ্ছে। এর ফলে ডি সি সি-র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মাঠে জল দূষণ এবং মাটি দূষণ ঘটেছে প্রতিনিয়ত। ফসলেরও ক্ষতি হচ্ছে প্রায় প্রতিবছরই।

ডি সি সি প্রায় প্রতিদিনই কয়লা পোড়ানোর কম্প্রেসারগুলিতে গ্যাসের চাপ কমানোর জন্য সেফটি ভাল্ভ খুলে দেয়। এই সময় এবং যখন গ্রিড দিয়ে যাই প্রোসেস লাইনে কখনো-সখনো কাজ চলে তখন হাজার হাজার কিউবিক মিটার বাষ্পীভূত আলকাতরা সহ কাঁচা কোল গ্যাস ধোঁয়া, ঝাঁঝালো, চৈতী ডানকুনীদের প্রভৃতি গ্রামগুলিতে ঢুকে পড়ে। তখন শিশুরা ও মেয়েরা বমি করার মতো অবস্থায় চলে যায়, তাদের মাথা ধরে, শ্বাসনালী ফুলে ওঠে, শ্বাসকষ্ট হয়।

শুধুমাত্র ডি সি সি-ই নয়, ডানকুনির জলাতে অনেক কলকারখানা গড়ে উঠছে যারা যায়, দূষণ রোধের সরকারী বিধিনিষেধগুলির কোনো তোয়াক্কাই করে না। তাই বলা যায় চৈতী এলাকার গ্রামগুলি এক অভাবনীয় পরিবেশ দূষণের সম্মুখীন।

এই পরিবেশ আমাদের, আপনাদের সকলেরই। সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় চৈতী এলাকায় শিরিষের ডালপালা বিকেলের মেঘে সাজিয়ে রাখতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

(চৈতী) অ্যান্টি পলিউশন ফোরাম

প্রসঙ্গ : জলাতঙ্ক ইত্যাদি

"উৎস মানুষ" ডিসে. '৯৪-এর ৩০২ পৃষ্ঠায় বাসুদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "তাই তরল পদার্থ দেখলে রোগীর আতঙ্ক হয়। এর থেকে জলাতঙ্ক নামটি এসেছে। এটাই বিজ্ঞান সম্মত। এই প্রসঙ্গে ভবানীপ্রসাদ সাহু'র 'শরীর নিয়ে সংস্কার' বইয়ের ১০৩ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় আছে "আসলে কিন্তু জল দেখে রোগী আতঙ্কিত আদৌ হয় না।" (পৃ. ১০৩)।

"তাই জলাতঙ্ক বা 'Hydrophobia' কথাটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে তৈরি করা।" (পৃ. ১০৬) ভবানী প্রসাদ সাহুর বইকে প্রামাণ্য ধরে নিয়ে প. ব. বিজ্ঞানমঞ্চের বীরভূম জেলা শাখা থেকে প্রকাশিত "পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য পত্রিকা" বইয়ে ভুল তথ্য ছাপা হয়েছে এবং এই বইটি বীরভূম জেলার অনেক মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু ছাত্রছাত্রী নয়—অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা, ডাক্তার ও বিজ্ঞান কর্মীও ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। 'শরীর নিয়ে সংস্কার' বইয়ে যে সমস্ত Reference-এর উল্লেখ আছে তার সঙ্গে ভবানী প্রসাদ সাহুর লেখার কোনো মিল নেই। আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে জলাতঙ্ক বিষয়ে ভবানী প্রসাদের বক্তব্য উৎস মানুষের পাতায় প্রকাশিত হবে।

ডা. স্বপনকুমার মণ্ডল
সিউড়ি, বীরভূম

জলাতঙ্ক ইত্যাদি'র প্রসঙ্গ : জবাব

ডাঃ স্বপনকুমার মণ্ডলের 'জলাতঙ্ক' সম্পর্কিত চিঠিটির জন্য ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করার সুযোগও পাওয়া গেল।

জলাতঙ্ক (rabies) রোগে জলে আতঙ্ক হওয়ার ব্যাপারটা যে প্রাথমিক ব্যাপার নয় এটি ছিল আমার বক্তব্য। এ ব্যাপারে *Harrison's Principles of Internal Medicine* নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বইটি দেখা যেতে পারে। রোগটি পরপর কয়েকটি স্তর (stage) অতিক্রম করে। প্রথমে nonspecific prodrome, তারপর acute encephalitis। এসময় রোগীটিকে জলাতঙ্কিত জলে আতঙ্ক হয় না। এরপরে মস্তিষ্কের brain stem অংশ আক্রান্ত হলে, কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে এটি ঘটে। হ্যাঁ, কোনো কোনো—সবার নয়। মোটামুটি অর্ধেক রোগীর ক্ষেত্রে এটি দেখা যায় ("in about 50 percent of cases")। এবং প্রাথমিক ভাবে আসলে তা জল খেলে নয়, যে কোনো তরল পদার্থ গিললে ("initiated by swallowing liquids") ডায়াফ্রাম, ফ্যারিংস, ল্যারিংস ও শ্বাসকার্যের অন্যান্য মাংসপেশীর যন্ত্রণাদায়ক সংকোচন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই মাংসপেশী তথা চেহারা অস্বাভাবিক হয় এবং ভয়ঙ্করের মত দেখায়। এই সংকোচন ঘটার ব্যাপারটা বারবার হতে হতে তরল গেলার ব্যাপারটি আতঙ্কের হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগ হলেই জলে আতঙ্ক হবে তা নয়। অর্ধেক রোগী জল খেতেই পারে। বাকীরাও যদি জল না খায়, বা খাওয়ার চেষ্টা না করে বা জল খাওয়ার কথা না ভাবে তাহলে ঐ সংকোচন ঘটবে না। আবারো মনে রাখা দরকার 'জলাতঙ্ক' রোগী রোগের শুরুতে দিব্যি জল খেতে-ই চায় এবং খায়ও, অন্যদের মতোই। রোগের পরের দিকে (brain stem আক্রান্ত হওয়ার পর) কিছু রোগীর ক্ষেত্রে (প্রায় অর্ধেক) জল (বা কোনো তরল) গিললে এই বিশেষ ধরনের কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর ধরনের ডায়াফ্রাম ও ফ্যারিংস ইত্যাদির মাংসপেশীর সংকোচন, এমনকি হাত পায়ের মাংসপেশীরও খিঁচুনি হতে পারে। এই রোগে তরল গেলার ব্যাপারটি অত্যন্ত কষ্টকর, এত সুনির্দিষ্টভাবে অন্য রোগে কষ্ট হয় না বলে, ব্যাপারটিকে এই রোগের একটি বিশেষ লক্ষণ (pathognomonic sign) হিসেবে কোনো কোনো বইতে বলা হয়েছে। তবে রোগটি চেনার জন্য ও অন্যান্য সমগোত্রীয় রোগ থেকে আলাদা করার জন্য (differential diagnosis) হ্যারিসনের মত বইতে কোথাও 'জলে আতঙ্কের' ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয় নি—রোগাক্রান্ত জন্তুর কামড়ের ঘটনা বা ইতিহাসের কথাই বলা হয়েছে ("the most helpful point in diagnosis is the history of exposure")। জলে আতঙ্কটাই যদি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হতো তবে কিন্তু ঐ লক্ষণটিকেই "the most helpful point in diagnosis" হিসাবে বলা হতো। আসলে ডাঃ মণ্ডলের মতো চিকিৎসকরা যেমন জানেন, সাধারণ মানুষও জলে আতঙ্কের ব্যাপারটি এই রোগটির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে ভাবেন। হ্যারিসনের বইতে হাইড্রোফোবিয়ার সংজ্ঞাতেও জলে আতঙ্কের কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে এটি কোনো 'তরল খাওয়ার পর' (initiated by swallowing) ঐ সব মাংসপেশীর তীব্র, যন্ত্রণাদায়ক, ইচ্ছানিরপেক্ষ সংকোচন। কষ্টের প্রতিক্রিয়াজনিত ভীতি ও অনীহার ব্যাপারটি ঘটে পরের দিকে।

'জলাতঙ্ক' রোগে 'জলে আতঙ্ক' হবেই বা এটাই তার পরিচায়ক চিহ্ন—সাধারণ এই ধারণাকে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পৃথিবীতে অন্যান্য সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে একমাত্র মানুষই বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে। বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ২০-২১ ভাগ মানুষ নিজেদের নাস্তিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করলেও বাকি অধিকাংশ মানুষের কাছে তার 'ধর্ম' তার

আপন পরিচয়ের সম্পূর্ণ একটি দিক বলে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যাপারটি একমাত্র মানুষেরই একচেটিয়া। তাহলে কি মানুষের প্রতিশব্দ হিসেবে বা মানুষের পরিচয় বোঝাতে 'ধর্ম' শব্দটির ব্যবহার ঘটাতে হবে? কখনোই না, কারণ ধর্ম মানুষের সম্পূর্ণ কোনো দিক নয়।

তুলনাটা কিছু বিকৃত হলেও জলাতঙ্কের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা একরকমই। রোগের প্রাথমিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জানা থাকে না। এটি কষ্টের অভিজ্ঞতা চলতে থাকে (বা কাঁদে) একটি দিক মাত্র। আর দু'জনের মধ্যে যে একজন রোগীর 'জলে আতঙ্কের' ব্যাপারটি ঘটে না বা ঐ কষ্টের অভিজ্ঞতা হয় না তাকেও কেন জলাতঙ্কের রোগী বলা হবে? ('মানুষ' বলতে 'ধর্ম'-কে বোঝালে নাস্তিক-ধর্মপরিচয়হীন মানুষদের ক্ষেত্রেও এই ঝামেলা)।

একারণে জলাতঙ্কের আক্ষরিক ইংরিজি প্রতিশব্দ hydrophobia-র চেয়ে 'rabies' শব্দটিই ডাক্তারি শাস্ত্রে এখন ব্যবহার করা হয়। বাংলায় 'জলাতঙ্ক' শব্দের বিকল্প শব্দ এখনো জানা নেই। বিশেষ একটি রোগের পরিচয়ে 'এপিলেপসি' বা 'ম্যালেরিয়া' শব্দগুলি সম্পূর্ণ ভুল, সেটি এখন জানা গেছে। তবু জনপ্রিয় বিকল্পের অভাবে সেগুলিই চালু আছে। (এপিলেপসি = ভর করা; ম্যালেরিয়া —খারাপ বাতাস) একইভাবে 'জলাতঙ্ক' শব্দটি বাংলায় চালু থাকুক তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রকৃত সত্যটি জানলে বা জানালে ক্ষতি নেই।

হয়তো এসব কারণেই 'শারীর বিজ্ঞান সংস্কার' বইতে জলাতঙ্ক প্রসঙ্গে ঐ ধরনের মন্তব্য করা হয়েছিল। তবে rabies রোগের পরিচায়ক হিসেবে জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া কথাটি সম্পূর্ণ যথার্থ নয় এটি যেমন নিঃসন্দেহে বলা যায়, তেমনি এটিও ঠিক যে এ রোগে জলে আতঙ্ক "আদৌ হয় না" কথাগুলি বিভ্রান্তিকর বটেই। জল দেখে ভয় পাওয়াটা কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ঘটে। এ কারণে 'শারীর বিজ্ঞান সংস্কার' বইটির ৫ম সংস্করণে ভাষাটা একটু পাল্টানো হয়েছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডাঃ মন্ডলের আমার চিঠিটি কিছু ভূমিকা পালন করেছে। তাঁকে ধন্যবাদ।

ব্যাপারটি এতখানি বিস্তারিত বলার উদ্দেশ্য, 'জলাতঙ্ক' নিয়ে বীরভূম বিজ্ঞানমঞ্চ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন; দুর্ভাগ্য, ডাঃ মন্ডল সংগঠনটি ছেড়েছেন এবং এর পেছনে এই পুস্তিকা তথা 'জলাতঙ্ক' সম্পর্কিত মতের অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল বলে জেনেছিলাম। ব্যাপারটি দুঃখজনক। 'উৎস মানুষ' সম্পাদকমণ্ডলীকে তাই অনুরোধ, আমার এই বিস্তৃত বক্তব্যটি ওঁদের পাতায় প্রকাশ করলে ভালো হয়।

ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু
কাঁথি

প্রসঙ্গ। "আড্ডা" হলে কেমন হবে

ষোড়শ বর্ষ, জানুয়ারি ১৯৯৬ সংখ্যায় 'আপনা'দের কথায় চিন্তিত হয়ে এই চিঠি লিখতে বসেছি। বছর আটেক আগে বিজন-দিতেই একটি বাড়িতে দু'দিনের আড্ডার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল "উৎস মানুষ-এর আড্ডা"। কিছু সম-মানসিকতার মানুষ দেশের পর আড্ডায় এসেছিল। তাদের সমস্যা ও পীড়িত জীবনে দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তি, তাদের সমাজ গড়ে তোলার আশা নিয়ে। গত কয়েক বছরের আলোচনার গতি, প্রকৃতি সেই আকর্ষণ নষ্ট করে দিয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। যেমন "ধর্মনিরপেক্ষ আত্মার সন্ধানে"-র প্রচেষ্টাকে দুদিনের বেশ শেষ করে দেওয়া হয়েছে। সবাই জানে কোনো সজীব বিষয়কে শেষ করে দেবার সবচেয়ে সোজা রাস্তা হলো কমিটিতে পাঠানো, আর সেই কমিটিতে কিছু অসম্ভব প্রশ্ন তুলে আমাদের মত সাধারণ মানুষকে ঝুলিয়ে দেওয়া। এখানে মনে রাখা দরকার—প্রথমে মানুষের সমাজ তৈরি হয়েছে, তারপর নীতি। সেটা যেখানে না হয়েছে, সেখানে বেশির ভাগ মানুষের উপর কল্পিত নীতি রাজশক্তির সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধর্ম ইত্যাদি।

'৯৬ সালের আড্ডা দুপুরে শুরু করে সন্ধ্যায় শেষ করার প্রস্তাব এসেছে। যারা নিয়মিত আড্ডায় এসেছেন, তারা সকলেই জানেন যে, আজ পর্যন্ত কোনো আড্ডাই তার নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি। কারণটি সোজা, আমরা সময়ানুবর্তিতায় অভ্যস্ত নই। যদি কোনো আকর্ষণ না থাকে তাহলে তো কথাই নেই। আড্ডার জোড়, বাঁড় ঝাড়া তা সম্ভব হবে কি? সারা দিনের আড্ডায়, এক-দেড় ঘন্টার দেরি মানিয়ে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে যা দুটোতে নির্ধারিত আড্ডার এক-দেড় ঘন্টার দেরীর ফল কি হবে। কল্পনা করতে পারেন কি? এ ছাড়াও যারা দূর থেকে আসেন তাদের কথা চিন্তা করেছেন কি?

ভর্তুকি প্রশ্নের তিনটি দিক আছে। (১) আয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট জনসমাগম না হলে ভর্তুকি দিতে হয়। আড্ডাকে আকর্ষণীয় করতে পারলে এই ভর্তুকি সামলানো যাবে। (২) যারা ক্যান্টিনের জন্য না করে সম্পাদন ও সম্পন্ন করতে গিয়ে খরচ বাড়ে। এখানে কিছু কম করে টাকার সাশ্রয় করা যায়। আরো একটি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। (৩) প্রতিদিনেই আড্ডার চাঁদার দুটি ভাগ থাকে, রোজগেরে আর বেকার। রোজগেরে-দের সেটা আরো একটু বাড়িয়ে আয়-ব্যয়ে সমতা আনা যায় না কি? আমরা কিছু না দিয়ে কিছু পাবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। তাই আমরা কম-উৎস জ্যোতিষ-টোটকা, তাবিজ কবচ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। কম বা বিনা খরচে আড্ডার ব্যবস্থা করে সেই অভ্যাসটিকে উৎসাহ না দিয়ে আড্ডার আনন্দ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার সব সমস্যা ভাগ করে নিন—তাতে আর্থিক হোক বা অন্য কোনো হোক। কি বলেন?

শ্রীনাথ মুখার্জি সেন
কলকাতা

প্রসঙ্গ : PIRA পিরা—আবার নগ্ন হিংসা, অবিচারের বলি

গত ৩১ জানুয়ারি '৯৪ মঙ্গলবার তারিখে PIRA-র বানতলাস্থ বাসস্থানে প্রকল্পটির সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে PIRA বিরোধী আক্রমণকারী গোষ্ঠী। PIRA আবার নগ্ন হিংসা, অত্যাচারের শিকার।

রাত ১-৩০টায় দেখা যায় পুকুরে চাষ করা সমস্ত মাছ লাফাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা রাসায়নিক কীটনাশক বিষ দিয়ে সব মাছ মারার ব্যবস্থা করেছে। যাদের উদ্দেশ্য ছিল PIRA-কে এভাবে অর্থনৈতিকভাবে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করা নয়, তার সাথে সাথে আতঙ্কিত পরিবেশ তৈরী করা।

PIRA-র কর্মীদের চারজন মহিলা ঐ দিন বাড়িতে ছিলেন আরো দুজন বাচ্চাও ছিল। বাকি কর্মীরা সকলে কলকাতার বই মেলায় ও অন্যান্য কাজে বাইরে ছিল। ঠিক সেই সুযোগে ষড়যন্ত্রকারীরা আঘাত হানল; আর তা রাতের অন্ধকারে অসৎভাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ঠিক এক বছর আগে ৩১ জানুয়ারি '৯৩ তারিখে PIRA-র প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সাংগঠনিক ঐক্যের কারণে তিন মাস পাহারাদারী রাখতে হয়েছিল ওদের।

তার আগে ১৯৯১ সালের ৮ মার্চ PIRA-র মেয়েদের কিডন্যাপের নামে পেটানো হয়েছিল। বিভিন্নভাবে PIRA-র কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নাজেহাল করা হচ্ছে। কিন্তু PIRA-র পক্ষ থেকে শতাধিক ডায়েরি ও এফ. আই. আর করেও কোনো লাভ হয়নি। PIRA-র কর্মীরা বার বার আক্রান্ত হচ্ছে। এখন প্রাণ সংশয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখনও আশঙ্কা করা হচ্ছে যে বিরোধীরা চায় আঘাতের মাত্রা বাড়াতে। PIRA-র মহিলা কর্মীদের ধর্ষণ করে, কিংবা অ্যাসিড বা পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার পর্যায় বাকি আছে। দুর্বলের ওপর অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার বন্ধ করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার 'অপরাধে' PIRA-র উপর আসছে আঘাতের পর আঘাত।

এ অবস্থায় সকল স্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে PIRA-র বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে অবিলম্বে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিজয় মাহাত
সচিব, পিরা

হবে

□ আগামী ১০ মে '৯৪ শনিবার 'বিজ্ঞান দরবার'-এর উদ্যোগে হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবনে (সময় বিকেল ৫টা) "ধূমকেতু বৃহস্পতি সংঘর্ষ" রঙিন আলোকচিত্র সহকারে প্রদর্শনী এবং "জ্যোতিষ কি বিজ্ঞানসম্মত?" বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সিনিয়র সাইন্টিস্ট, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম), রঙিন স্লাইড সহযোগে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন। সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কাম্য।

হয়েছে

□ ২৪ জানুয়ারি বেথুয়াডহরি (নদীয়া জেলা) যুবকল্যাণ সমিতি সংস্থার আমন্ত্রণে বিজ্ঞান-দরবারের কর্মীরা 'অলৌকিক না লৌকিক' প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিভিন্ন প্রদর্শনী লৌকিকে প্রতারণার বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন কর্মীরা। শান্তিপুরে 'হার্পেটোলজিস্ট'-এর সঙ্গে যৌথভাবে সাপ প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষাক্ত ও অবিষাক্ত সাপের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। সাপ নিয়ে নানা অলৌকিক ভাবনার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার দিকে জোর দেওয়া হয়। বিষাক্ত সাপের কামড়ের চিকিৎসা (অ্যান্টি-ভেনম সিরাম ইনজেকশন) পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রদর্শনীটি আগ্রহের সঙ্গে দর্শকরা গভীর রাত পর্যন্ত দেখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্ব দীর্ঘায়িত হয়ে চলে।

কাঁচরাপাড়ার 'বিজ্ঞান দরবার' ১৯ জানুয়ারি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী-শিক্ষিকাদের সামনে নাড়ি বন্ধ, বিনা আগুনে যজ্ঞ, চোখ বেঁধে টাকা পয়সা সনাক্তকরণ ইত্যাদি নানাবিধ প্রদর্শনী ব্যাখ্যাসহ করে দেখায়। ছাত্রীরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রিয় অংশ নেয়। সাপ সম্পর্কে ভুল ধারণা কাটাতে হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা পরিবেশন করে নাটক—বেহুলা। বিজ্ঞান দরবারের আর একটি অনুষ্ঠান ছিল নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরিতে হয়েছে। এখানেও বিজ্ঞানসম্মত কারণ লৌকিকে

দেখানোর চেষ্টা করা হয়—সমস্ত আপাত অলৌকিক ঘটনারই লৌকিক ব্যাখ্যা থাকে। এখানে আয়োজনকারী গোষ্ঠীর নাম ছিল সন্দীপন। এছাড়াও ছিল সাপ নিয়ে আলোচনা ও প্রদর্শনী।

□ হুগলীর 'কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা' ১২ ফেব্রুয়ারি '৯৫, হুগলী জেলার প্রগতি সংঘে একটি শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। চৌরঙ্গ সাপের সাথে চেনা-পরিচয়, সাপের চিকিৎসা ও AVS-র অপ্রতুলতা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। এই কর্মশালায় হুগলী-চন্দননগরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয়।

□ সুপ্রিম কোর্ট দূষণের দায়ে পনেরটি কারখানাকে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো আদেশ দেওয়া হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র', পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন মহলে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। সমস্ত কলকারখানার দূষণরোধী ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে, দূষণরোধের নামে কারখানা বন্ধ থাকাকালীন শ্রমিকদের মজুরী বন্ধ বা সংকোচন চলবে না এবং যার জন্য তারা কোনোভাবেই দায়ী নয় সেই দূষণের দায় তাদের উপর চাপানো চলবে না—এই দাবিতে প্রথম পর্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পত্রিকা নিবন্ধন গত ১০. ২. ৯৫। বাংলা ও হিন্দিতে একটি প্রচারপত্র এই প্রচারের বক্তব্য ব্যাখ্যার জন্য বিলি করা হচ্ছে। আগামী দিনগুলোয় বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে এই অভিযান চলবে স্থানীয় সংগঠনগুলির সহযোগিতায়।

□ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা পরীক্ষা '৯৪-এর অংশগ্রহণকারী নৈহাটি অঞ্চলের প্রতিযোগীদের প্রশংসাপত্র, পুরস্কার ও বৃত্তি ইত্যাদি বিতরণের অনুষ্ঠান হলো গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৫-এ, নৈহাটী পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে। প্রায় চারঘণ্টার এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, পরিবেশনা ও পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পালন করে প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রতিযোগীদের অভিভাবক এবং প্রায় ২৫০ জন প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম উপভোগ করেন। রাজ্যস্তরে এই পরীক্ষার প্রসার ও উদ্যোগের দায়িত্ব ছিল 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র', পশ্চিমবঙ্গ-এর এবং নৈহাটি অঞ্চলে এই দায়িত্ব পালন করে 'নৈহাটি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড কালচার।'

□ গত ১১ ফেব্রুয়ারি রবিবার, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি আয়োজিত আলোচনা সভায় গোপালচন্দ্রের জীবনালেখ্য "দুর্গম অন্তর্মুখ অন্বেষণ" নাটক গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো।

□ ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, দুর্গাপুর শাখা, তাদের পঞ্চম স্বাস্থ্যমেলা উদ্‌যাপন করল ২০—২৬ জানুয়ারি। মেলায় 'অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক' অনুষ্ঠান করে মেধার দুর্গাপুর পিপলস সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল ফোরামের সদস্যরা। উৎস মানুষ পত্রিকার পক্ষ থেকেও বক্তব্য পেশ করা হয়। ২-য় দিনে মহিলাদের নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচক ছিলেন সত্যবতী গিরি। শেষ দিনে ছিল সাপ নিয়ে প্রদর্শনী ও মানুষের শরীরের 'কথা বলা পুতুল', ছিল গোপাল ভট্টাচার্যের জীবনী, ওষুধ, আকুপাংচার ইত্যাদি নিয়ে প্রদর্শনীও।

□ ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯৫ উত্তর-পূর্ব কলকাতার কাঁকুড়গাছির জেমস ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউট হলে জ্যোতিষীদের সম্মেলন হয়। 'জ্যোতিষ' [illegible] সাধারণের ডাক দিয়েছিল 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'—ওই একই দিনে, একই স্থানে, সম্মেলন-গৃহের বিপরীত দিকে।

□ চিৎপুর ও সার্ভে'স সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ধ্যানাগ্রামে একটি কর্মশালা হয় গত ৬ থেকে ৯ মার্চ। এই কর্মশালায় বিদ্যবিজ্ঞান, বিষাক্ত খাদ্যপদার্থের বিশ্লেষণ, নির্দিষ্ট কিছু খাদ্য ভেজালের বিষয়ে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা, এছাড়াও বলা হয়েছে বিষাক্ত খাদ্যপদার্থ সম্বন্ধে গৌণ-মুখ্য ইত্যাদি অভ্যাস সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনা ও হাতে-কলমে কাজ চলে। এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষজ্ঞরাও হাজির ছিলেন কিছু বলতে।

□ গত ৮ মার্চ '৯৫ ছিল ৮৫-তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবারে হাওড়ার মন্দিরতলা গ্রামের PIRA-র পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী নারী উৎসব কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্ব কর্মসূচীর প্রথম দিন ৮ মার্চ হাওড়ার জেলাশাসক ও এস পি. মহাশয়কে নারী নির্যাতন বিরোধী স্লোগান নিয়ে ৫০ জন মহিলা প্রতিবাদ মিছিল করে স্মারকলিপি দেন।

এরপর বাকি ছয় দিন গ্রামে গ্রামে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা হয়। শেষদিন ১৫ মার্চ মিছিলসহ পথসভাও হয়। সামগ্রিকভাবে কর্মসূচী গ্রামের মেয়েদের নতুনভাবে প্রেরণা দেয়।

□ ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' তৃতীয় বিজ্ঞান মেলা আয়োজিত হলো গত ৩০ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল। মেলায় ছিল কুসংস্কার ও ভেজাল নিয়ে প্রদর্শনী, পোস্টার ও স্লাইড শো। ব্যানার্জিপাড়া রোডের ওপর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। যৌন-কর্মীদের সংগঠন মহিলা সমন্বয় উপস্থিত ছিল তাদের আবেদন নিয়ে।

অনুগ্রহ করে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করবেন

গ্রাহকপদ নবীকরণের সময় □ যে কোনো অভিযোগের সময়

পত্রিকার মোড়কে (wrapper) গ্রাহক নম্বর লেখা থাকে প্রতি সংখ্যাতেই

WB/EC 22? ISSN 0971-5800 RN 37275/80 Rs. 5.00

UTSA MANUSH VOL. 16 NO 4 APRIL 1995 পাঁচ টাকা

উৎস মানুষ প্রকাশিত রচনা সংকলন :

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / ১ম খণ্ড [২৫·০০]
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান / ২য় খণ্ড [৩০·০০]
বিজ্ঞানকে মুখোশ করে [২০·০০]
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে [৩০·০০]

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় [২২·০০]
প্রতিরোধ [৩২·০০]
ছোটদের ধাঁধা [২৫·০০]
শেকলভাঙা সংস্কৃতি [১৬·০০]

এটা কি ওটা কেন [১৫·০০]
স্বাস্থ্যের বৃত্ত [২০·০০]
যে গল্পের শেষ নেই [২৫·০০]
প্রমিথিউসের পথে [যন্ত্রস্থ]

বিবেকানন্দ অন্য চোখে [২৫·০০]
বিবেকানন্দ অন্য চোখে : একটি সমীক্ষা—আরো কিছু বিতর্ক [যন্ত্রস্থ]
সাপ নিয়ে কিংবদন্তী [১৫·০০]
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ [২৫·০০]

চিঠিপত্রে যোগাযোগ : সম্পাদক উৎস মানুষ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

সরাসরি সাক্ষাতের জন্য : ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৯ (সোম—শুক্র : ১১—৬টা)

'উৎস মানুষ'-এর পক্ষে পবন কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং মানবক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ (ফোন : ২৪১ ৩৪৪০) থেকে মুদ্রিত।

ISSN 0971-5800
মে ১৯৯৫

উৎস মানুষ

শিকাগো-সভায় ভারতীয়গণ
চিতাবাঘ আর হিংস্র মানুষ
টি ভি এবং সামাজিকতা
চের্নোবিলকে মনে রেখে

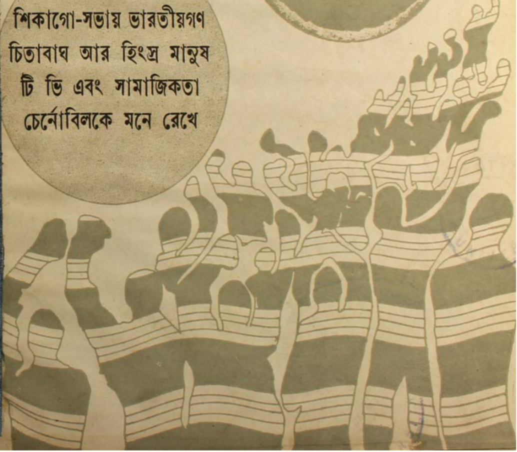

উৎস মানুষ

ষোড়শ বর্ষ □ পঞ্চম সংখ্যা □ মে ১৯৯৫

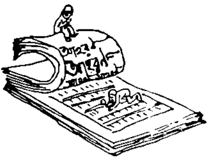

[illegible]

[illegible]

ধর্মশিক্ষা □ ১১৩

বিজ্ঞানের ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি ১১৬

হিন্দু চিন্তাধারা ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ ১২২

মৃত্যুর কারবার – নির্ভেজাল দাবি-দাওয়া ১২৭

[illegible]

পিল্টডাউন (পার্লিক্লাইন জেনাইড)-র বিস্তার □ ১৩০

[illegible]

মনোবিজ্ঞানের বিশেষ ধারা □ ১৩১

[illegible] □ ১৩৩

[illegible] □ ১৩৫

[illegible] □ ১৩৮

[illegible] □ ১৩৯

উৎস মানুষ
ISSN 0971-5800
বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৬৪

ধর্মশিক্ষা

রাজশেখর বসু

[illegible]

শোনা যায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা নাগরিকদের মনোভাব নির্মাণ করা হয়। প্রথমে হয় brain washing বা মস্তিষ্ক ধোলাই, অর্থাৎ লোকটির মন থেকে কমিউনিস্ট-নীতিবিরুদ্ধ পূর্ব সংস্কার যাতে দূর হয় তার চেষ্টা করা হয়, তারপর অবিরাম মন্ত্রণা দিয়ে এবং প্রচারের দ্বারা নতুন সংস্কার বদ্ধমূল করা হয়। এই Indoctrination-এর ফলে বহু নরনারী কমিউনিস্ট শাসনের আজ্ঞাবহ ভক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রজাদের শিশুকাল থেকেই শেখানো হয় – পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলের স্বার্থের চাইতে রাষ্ট্রের স্বার্থ বড়, রাষ্ট্রনায়কের বিধান নির্বিচারে মানা প্রত্যেক নাগরিকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্য দেশে যে ডিমোক্রেসি আছে তা দুর্নীতিপূর্ণ ধাপ্পাবাজি মাত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই আছে, সেখানকার প্রজারাই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে। অন্য দেশের লোক অনেক আছে যারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রজা না হয়েও সেখানকার শাসনতন্ত্রের ভক্ত এবং তার কোনও দোষই মানতে চায় না।

এই রাষ্ট্রনীতিতে একতরফা শিক্ষার ফলে কমিউনিস্ট প্রজার মানসিক পরিবর্তন কি হয়েছে তার আলোচনা অনাবশ্যক, অনেকে সে সম্বন্ধে লিখেছেন। কিন্তু যেসব পর্যটক স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা কমিউনিস্ট শাসনের শুধু দোষ আবিষ্কার করেন নি, অনেক সুফলও লক্ষ করেছেন। সম্প্রতি ২৪-১০-৫১ স্টেটসম্যান পত্রে প্রকাশিত একজন নিরপেক্ষ দর্শকের বিবরণ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি –

China today is free of all sings of jobbery and corruption, and this is no mean achievement .. One does feel that we, in our country, could do with a little more honesty. There is an air of efficiency everywhere in the China. ...One does not have to worry about things like the purity of food, ...or short measure or incorrect prices. These things are the result of strict controls I miss these on my return to India. ...The people have been made conscious of the need to keep their homes and the streets clean. ...Is it fear that drives him or is it patriotism ? The truth probably is a bit of both ...The Communist party has...used two methods : coercion and "education".

ডিক্টেটর-শাসিত রাষ্ট্রে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদিত হয়, সেখানকার প্রজা ভয়ে বা ভক্তিতে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে চলে। গণতন্ত্রে তেমনটা আশা করা যায় না, কারণ, দুষ্ট দমনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সেখানকার শাসকদের নেই। যারা দুষ্ট আর দুষ্টের পোষক, তাদেরও ভোট আছে, সুতরাং তারা অবধ্য নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ — প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বেশী হস্তক্ষেপ না করে এমন শিক্ষা, পরিবেশ আর কর্তাব্যক্তির প্রবর্তন যাতে লোকে স্বাধীনভাবে কর্তব্যনিষ্ঠ হয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অনুকরণ না করেও সেখান থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি।

Indoctrination-এর একটি ভাল প্রতিশব্দ অধ্যাপক চিন্তে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেয়েছি — কর্ণেজপন, চলিত ভাষায় যার নাম কানভাঙানো বা ভজানো। শব্দটি মন্দ অর্থেই চলে, কিন্তু ভাল মন্দ যাবতীয় সকল উদ্দেশ্যেই এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হতে পারে। শিশুকে যখন শেখানো হয় — সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না, ঝগড়া মারামারি করবে না, গুরুজনের কথা শুনবে ইত্যাদি, তখন শিশুর মঙ্গলের জন্যই তার কর্ণেজপন হয়। ভোটের দালালেরা যখন নিরক্ষর পর্দানশীনদের বলেন — অমুককে ভোট দিন, তখন পাড়ার লোকের কর্ণেজপন হয়। মন্ত্রী আর রাজনৈতিক নেতারা দলে দলে ঘুরে বেড়ায় যে স্লোগান আওড়ায় তা সর্বসাধারণের কর্ণেজপন। কিন্তু এই ধরনের বুলি আওড়ানোয় বিশেষ কিছু ফল হয় না, কর্ণেজপন হলেও তা প্রায় অরণ্যে রোদনের তুল্য।

ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাও কর্ণেজপন। অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে সত্য মিথ্যা আর অত্যুক্তির এমন নিপুণ মিশ্রণ থাকে যে বহু লোক মোহগ্রস্ত হয়। 'তেল ঘি খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না, অমুক বনস্পতি খান, পুষ্টির জন্যে তা অপরিহার্য, আধুনিক সভ্য আর শিক্ষিত জনের রান্নাঘরে তা থাকা ছাড়া কিছু হতে পারে না।' সম্প্রতি লোকসভায় একজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে এমন বিজ্ঞাপন আপত্তিজনক, কিন্তু এমন আইন নেই যাতে এই অপপ্রচার বন্ধ করা যায়।

বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ, অকারণে শিকল টেনে গাড়ি থামানো, রেলকর্মচারীকে নির্যাতন, গাড়ির আসবাব চুরি ইত্যাদি নিবারণের জন্যে সরকার বিস্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীকে আবেদন জানাচ্ছেন, কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না, কারণ, দুষ্কর্ম নিবারণে শুধু কর্ণেজপন যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা আর লোকমতের প্রবল সমর্থন আবশ্যক। ভেজাল ধরা পড়লে যে শাস্তি হয় তা অতি তুচ্ছ। অপরাধী ধনী হলে তার নাম প্রায় প্রকাশিত হয় না। একই লোক ভেজাল-বিধি ভঙ্গের জন্যে বহুবার জরিমানা দিয়েছে এবং স্বচ্ছন্দে সসম্মানে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।

বিজ্ঞেরা বলেছেন, নব মৃৎপাত্রে যে সংস্কার লগ্ন হয় তার অন্যথা হয় না। বাল্যশিক্ষার অর্থ, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ হিতকর সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করা। এর প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্যে শিক্ষণ মনোবিজ্ঞানীদের মত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষার সবটাই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, চরিত্র-গঠনে অভিভাবন বা suggestion-এরও স্থান আছে। যে শিক্ষক ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দেবেন তাঁকে শিক্ষণের পদ্ধতি শিখতে হবে। কিন্তু বাল্যশিক্ষাই যথেষ্ট নয় বয়স্ক জনসাধারণ যাতে সর্বোধিত থাকে তার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। শুধু উপদেশে বা সরকারী বিজ্ঞাপনে কাজ হবে না, বর্তমান দণ্ডনীতি কঠোরতর করতে হবে এবং সেইসঙ্গে প্রবল জনমত গঠন করতে হবে।

সৎকর্ম আর সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক জনসাধারণের প্রশংসা, দুষ্কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক জনসাধারণের ধিক্কার। ট্যাক্সিওয়ালা, মোটরবাস ও ট্রামের চালক, মুটে ইত্যাদির সাধুতা, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের সাহায্য ইত্যাদি বিবরণ মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যায়। এইসব কর্মের প্রশংসা আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। সাধারণের কাছে সিনেমাতারকা, ফুটবল-ক্রিকেট-খেলোয়াড়, সাঁতারু ইত্যাদির যে মর্যাদা, সৎকর্মা আর সাহসী স্ত্রী-পুরুষেরও যাতে অন্তত সেই রকম মর্যাদা হয় তার চেষ্টা করা উচিত। দুষ্কর্মের নিন্দা তীব্র ভাষায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে, যাতে জনসাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। শুধু আইনে দুষ্কর্ম নয়, রাস্তায় ময়লা ফেলা, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা, পানের পিক ফেলা, রাস্তার কল খুলে রেখে জল নষ্ট করা, নিষ্প্রয়োজন আতসবাজি পোড়ানো ইত্যাদি নানারকম অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দরকার। সংবাদপত্রের কর্তারা যদি বিবিধ রাজনৈতিক সভার বিবরণ, সিনেমা চিত্রে বিজ্ঞাপিত পরিচয়, খেলোয়াড়দের আলোচনা ইত্যাদি কমিয়ে দিয়ে সৎকর্মের প্রশংসা আর দুষ্কর্মের নিন্দা বহুপ্রচারিত করেন তবে তা সার্থক কর্ণেজপন হবে, লোকমতও প্রভাবিত হবে। যেমন দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, তেমনি দেশব্যাপী দুর্নীতি, কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক নেতাদেরও এই জনমত গঠনে উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য।

সাধারণের পক্ষে জ্ঞানানো বিধান প্রায় অলঙ্ঘনীয়। যে নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রী-

সমাজে আমাদের বিধি-নিষেধ মেনে চলে. সেই একই নিষ্ঠা নিয়ম-অনিয়ম করা সম্ভব নয় বলে কোনো মানে বোঝা হয় তার জন্য সুশৃঙ্খল থাকা আর অধিকার তার আবশ্যক।

পরাধীন চল্লিশ বছর চীন স্বাধীন হয়েছে, এবং কম করে ভারতবাসীর স্বপ্ন বিধ্বস্ত করেছে। চীনের শাসনতন্ত্র এই সমাজের নির্ভরতা আর দুর্নীতি থাকুক, প্রচার স্বাধীন চিন্তা শক্তি বঞ্চিত হল. সে দেশের জনসাধারণের যে নৈতিক উন্নতি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু কোন সময়েও দুর্নীতির জন্য চীন কুখ্যাত ছিল. কিন্তু গত বছর গণ-আন্দোলন যে উপায়েই হোক, চীনের প্রশাসন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের হয়েছে। আর আমাদের দেশে তার বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কোনও অবতার বা মহাপুরুষ অলৌকিক শক্তির দ্বারা আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না। মার্কসবাদী পদ্ধতির সব অনুসরণ না করেও আমরা সমবেত চেষ্টায় দেশের কলঙ্ক মোচন করতে পারি। যদি তাল ছেড়ে দিয়ে সুবিধাবাদী নীতি আঁকড়ে ধরি তবে আমাদের রক্ষা নেই।

উৎস মানুষ-এর আড্ডা ১৯৯৫

১৮ জুন ১৯৯৫ রবিবার, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা

রানী ভবানী হাইস্কুল-এ

[শ্যামবাজার হাতিবাগানে কিশোরপোল গলিতে বাবার মোড়ে লাইব্রেরি হল-এর পেছনে। অথবা রূপবাণীর পাশ দিয়ে সি আই টি পার্কের গায়ে]

এবারের আড্ডা-র বিষয়

'দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের দ্বন্দ্ব'

যাঁরা রাজনীতি বা গণসংগঠনের কাজকর্মের মধ্যে থাকেন, তারা তাঁদের ব্যক্তিগত আদর্শ বা বিশ্বাসকে বাস্তব জীবনে কিভাবে কতখানি কতদূর পর্যন্ত প্রয়োগ করবেন, সেটা নির্বাচন করে নিলেও নিতে পারেন। কিন্তু যাঁরা কোনোরকম রাজনৈতিক দল বা গ্রুপ বা কোনো গণসংগঠনে যুক্ত নন, কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস আছে, আদর্শবোধ আছে জোরদার, সমস্যা তাদের ক্ষেত্রেই মনে হয় বেশি। পাড়ায় সারারাতিব্যাপী ভিডিও শো কিংবা সপ্তাহব্যাপী হরিকীর্তন, বিয়েতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শিশুর কিংবা মৃতের অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান, বিজ্ঞানী বা মার্কসবাদীর জ্যোতিষ কিংবা অজানা শক্তির প্রতি নির্ভরতার ঘটনা, ...এরকম নানা ক্ষেত্রে রোজকার জীবনে বিশ্বাস যখন ধাক্কা খায়, তখন কেউ হয়তো নীরবে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করেন, কেউ বা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে দ্বিধা আপস করে কিংবা প্রশ্ন তুলে নানা কায়দায় যুক্তি দিয়ে গোঁজামিলের চেষ্টা করেন, কেউ আবার আত্মীয়-বন্ধু-পাড়ার লোকজনকে পাত্তা না দিয়ে নিজের ব্যক্তি বিশ্বাসকে কায়েম করতে গিয়ে প্রতিবেশী-পরিজনের কাছে উপহাসের পাত্র হন, প্রায় একঘরে হয়ে থাকেন।

এই অনুষ্ঠানগুলির বাইরে দাঁড়িয়ে যারা ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে বাস্তব জীবনে সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ করতে চান, এই সমাজের মধ্যে থেকেই – তাদের সমস্যা তাদের কথা নিয়েই হোক এবারের আড্ডা।

এ 'আড্ডা' সকলের। আলাদা করে কার্ড পাঠিয়ে নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। আবার আগে-ভাগে নাম অন্তর্ভুক্তিরও দরকার নেই। ১৮ তারিখ সবাই আসুন। সবাই মিলে চাঁদা তুলে খাওয়া-দাওয়া করে, সারাদিনটা আলোচনা গান-বাজনা হাসি-আনন্দ করে কাটিয়ে দেওয়া যাক।

রেজিস্ট্রেশন খরচ : উপার্জনশীলদের জন্য ৫ টাকা ; অন্যান্যদের জন্য ২ টাকা ; খাওয়া-দাওয়া ১০ টাকা।

তবে একটা কথা – অত্যন্ত আগ্রহী কোনো নবীন বা প্রবীণ বন্ধু যদি কেবলমাত্র আর্থিক অসুবিধাকে প্রতিবন্ধক মনে করেন, তাহলে তাদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

আরো বিস্তৃত তথ্য ইত্যাদির জন্য আগামী সংখ্যার পত্রিকায় নজর রাখুন। আর আসতে পারেন ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে – সরাসরি যোগাযোগের জন্য।

এবারের 'উৎস মানুষ-এর আড্ডা'-র উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক – 'চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থা', হাতিবাগান, কলকাতা।

শিকাগো ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি

এক তথ্যনির্ভর ব্যবচ্ছেদ

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়

উৎস মানুষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ অন্যচোখে' এবং 'বিবেকানন্দ অন্যচোখে একটি সমীক্ষা – আরো কিছু বিতর্ক' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, অবতার-প্রতিম 'স্বামীজি'র প্রতি মোহাচ্ছন্ন ভক্তি-আচ্ছন্ন দৃষ্টি না রেখে যথার্থ বাস্তব যুক্তিশীল চোখে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম বহু-বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে নবমূল্যায়নকে। বিবেকানন্দের এই অন্য মূল্যায়ন পাঠকদের মনে আলোড়ন তুলেছিল বলেই।

স্বামীজির বিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতার (১৮৯৩) শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিপুল প্রচার ধর্ম-অনুষ্ঠান-উৎসবের জোয়ার আমরা দেখছি সম্প্রতি; এসবই প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু এখানেও এই মোহাচ্ছন্ন গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য আমরা লক্ষ করি। প্রকৃতপক্ষে শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজির মাহাত্ম্য যেভাবে যতখানি গরিমায় অলংকৃত হয়ে প্রচার পেয়ে এসেছে, তার সত্যতা ততখানি সন্দেহাতীত পরিচ্ছন্ন নয় এবং সেখানে সত্যের অপলাপ হয়েছে, অনৈতিহাসিকতা রয়েছে, রয়েছে তথ্যের অসম্পূর্ণতা বিকৃতি বিভ্রম। অতএব সত্যকে তো অনুসন্ধান করতেই হবে; তাই সামগ্রিকভাবে শিকাগো ধর্মসভা ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের ঘটনাবলীকে দেখতে হবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, নির্মোহ সত্যাগ্রহী অনুসন্ধিৎসু চোখে। ইতিহাসের যথাযথ সমীক্ষা ও নিরপেক্ষ মূল্যায়নে আমরা, মানুষ হিসেবে, সকলেই দায়বদ্ধ।

তাই এই প্রবন্ধ। নিছক প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করার জন্যই কলম ধরার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমাদের নেই। এখানে যে-সব প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য, দুর্লভ, নতুনভাবে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাবলী উদ্ঘাটিত হয়েছে – সেগুলি 'উৎস মানুষ'-এর পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রধান অভিপ্রায়। কেবল মিশন সংশ্লিষ্ট মহলের একপেশে প্রচারে সম্পূর্ণ প্রভাবিত না হয়ে সুধী পাঠক তার সত্য নিরূপণের স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলবে – সে প্রত্যাশাও আমাদের রয়েছে।

একটা প্রশ্ন পাঠকের মনে আসতেই পারে যে, বিবেকানন্দকে নিয়ে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে বর্তমান লেখকের বক্তব্য কতখানি নির্ভরযোগ্য, কী তাঁর যোগ্যতা বা অবস্থান? উত্তরে বলা যায় – এই লেখার প্রামাণ্য তথ্যাদি ও যুক্তির বিচারই এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব, কেননা এখানে কোনো সিদ্ধান্তই লেখকের একান্ত নিজস্ব ধারণা থেকে আসে নি, এসেছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ থেকে। তথাপি উৎসুক পাঠকের কৌতূহলের মূল্য দিয়ে জানাই:

ড. রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় পূর্বজীবনে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা নেন। এরপর পুরোপুরি মিশনে যোগ দেন তিনি। ১৯৮০ সালে ভুবনেশ্বর ও বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে কয়েক মাস 'pre-probationer' হিসেবে ছিলেন। এবং ওই বছরই রাজাগোপাল মিশন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

১৯৯৩ সালে একটি মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করে রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়-এর প্রথম বই *Swami Vivekananda in the West*; সম্প্রতি কলকাতা থেকে এ বইটি প্রকাশ করেছে কে. পি. বাগচি। লেখকের দ্বিতীয় বই শিকাগো ধর্মমহাসভা ১৮৯৩ ও শতবর্ষ পরে তার উদ্‌যাপনকে নিয়ে, এই বছরেই প্রকাশিত হচ্ছে। …এছাড়াও ১৯৯৩ সালে তিনি তিনটি ভিডিও ফিল্ম তৈরি করেন, তার মধ্যে একটি হলো **Vivekananda in America** (১৬০ মিনিটের), আরেকটি **Vivekanands in Europe.**

সম্পাদকমণ্ডলী

ভূমিকা

ভারতবর্ষে নানা পত্র-পত্রিকায়, গত দু-বছর ধরে ঐতিহাসিক শিকাগো ধর্ম-মহাসভা নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কেবল স্বামী বিবেকানন্দ নন, ১৮৯৩ সালে ভারত থেকে যে ক-টি ধর্মপ্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিনিধিকে শিকাগোয় পাঠিয়েছিল তাদের অনেকেই স্মারক অনুষ্ঠান, পুস্তিকা, ইত্যাদির মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিনিধির অবদান স্মরণ করেছে।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়ে গত এক-শ বছর ধরে নানারকম মতামত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে খুব ঘটা করে এই শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। …কিন্তু এই সমস্ত উদ্যোগগুলোই নির্মোহ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক ঘটনার তাৎপর্য বিচারের প্রয়াস বিশেষ চোখে পড়ছে না, বরং ইতিহাসকে বিকৃত করা,

মিথ্যাচার চিন্তাহীন তথ্য পরিবেশন করা, এবং সর্বোপরি 'ভারতবর্ষ'-র বা বলা ভালো 'হিন্দুত্ব'-র একতরফা মহিমা কীর্তন করাই প্রাধান্য পেতে দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপক প্রচার—'শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই একমাত্র চোখে পড়ার মতো প্রতিনিধি ছিলেন।' এই অসত্য অনৈতিহাসিক প্রচারটি শুধু নতুন নয়। শিকাগো ধর্মসভার পর থেকেই মার্কিন দেশ ও ভারতে এই প্রচারটি একটানা প্রাধান্য পেয়ে আসছে শতবর্ষ ধরে।

এরকম এক পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে-সব অতিকথন ও অপপ্রচার চলে আসছে দীর্ঘদিন—তার সত্যাসত্য পর্যালোচনার চেষ্টায় বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

ভারতবর্ষে সেই ঐতিহাসিক ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে জনসাধারণ এতকাল ধরে জানতে পেরেছেন প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে। মূল বিদেশী বা মৌলিক তথ্য-দলিল ভারতীয় পাঠকের হাতে আসার সুযোগ নিতান্ত কম ছিল। অথচ খোদ আমেরিকায় সেই সভার বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল পাঁচটি বৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থে। সেগুলি হলো :

১. *The World's Parliament of Religions*, দুই খণ্ড, সম্পাদক Reverend John Henry Barrows (শিকাগো, ১৮৯৩)।

২. *The World's Congress of Religions at the World's Columbian Exposition*, সম্পাদক J. W. Hanson (নিউ ইয়র্ক, ১৮৯৪)।

৩. *The Parliament of Religions and Religious Congresses at the World's Columbian Exposite*, সম্পাদক Walter R. Houghton (শিকাগো, ১৮৯৩)।

৪. *Review of the World's Religious Congresses*, সম্পাদক L. P. Mercer (শিকাগো, ১৮৯৩)।

৫. *A Chorus of Faith*, লেখক Jenkin Lloyd Jones (শিকাগো, ১৮৯৪)।

এগুলির মধ্যে প্রথম বইটি, ব্যারোজের লেখা, সর্বাধিক প্রচলিত এবং সর্বাপেক্ষা বিশাল, ১৬০০ পাতার। অন্য চারটি আকারে অর্ধেক বা আরও ছোটো। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মূল্যবান বিশাল মৌলিক রিপোর্টগুলি ভারতে একটিও সুলভ প্রচলিত নয়। গোটা কলকাতায় হয়তো ৩টি বা তারও কম কপি, ব্যারোজ-এর দুই খণ্ড, রয়েছে কয়েকটি গ্রন্থাগারে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারেও ওপরের বইগুলির একটিও নেই। কাজেই পাঠকদের নিরুপায় হয়েই নির্ভর করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন ও সংশ্লিষ্ট প্রকাশক প্রকাশিত সংকলন বইগুলির ওপর।

ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি

জন হেনরি ব্যারোজ ও অন্যান্য কিছু শিকাগোবাসী খ্রিস্টান ও ইউনিটেরিয়ান পাদ্রীরা ১৮৯১ সালে স্থির করেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর পূর্তি উদযাপনের উপলক্ষে আসন্ন ১৮৯৩ সালের বিশাল বিশ্বমেলায় (World's Fair বা World's Columbian Exposition) মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রই প্রতিফলিত হওয়া দরকার, তাই সেখানে ধর্মকে বাদ দেওয়া উচিত হবে না। এই উপলক্ষে একটি কমিটি গঠিত হয়; জন ব্যারোজ শুধু প্রধান ডিপার্টমেন্টের সম্পাদকই ছিলেন না, তিনি এই কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন।

ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবার দু-বছর আগে, ১৮৯১-এর জুন মাসে সারা বিশ্বে এই কমিটি ৩০০০-এরও বেশি চিঠি দেন। এই চিঠিতে প্রস্তাবিত আগামী সভার দশটি লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছিল : একই সভায় বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের একত্রিত করা, বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে সমাবিষ্ট করা, এবং একে অপরের মত সহানুভূতিসহ শোনা—এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল; এছাড়া জড়বাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ 'ফ্রন্ট' তৈরি করা, বিশ্বের জন-জীবনের ওপর ধর্মের সুগভীর প্রভাব ব্যক্ত করা, এবং বিভিন্ন দেশের ও ধর্মের মানুষের মধ্যে সখ্য ও প্রীতি স্থাপন করাও এই সভার অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

প্রাথমিক চিঠির উত্তরে আয়োজকরা সারা বিশ্বের ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে সমর্থনসূচক প্রচুর উত্তর পেয়েছিলেন। ভারত থেকে তাঁরা কম করে মোট ৩০ উত্তর পান বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, সংবাদপত্র সম্পাদক ও ব্রিটিশ সরকারের বড় চাকুরেদের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারী। কলকাতার জজ আমীর আলী (সুপ্রীম কোর্ট, কলকাতা), সমাজনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ব্রাহ্মসমাজ), অধ্যাপক আলেকজান্ডার টোমোরি (ডাফ কলেজ, কলকাতা), এবং মিশনারী জে. এম. ম্যাকডোনাল্ড চিঠি পেয়েছিলেন এবং উত্তরও দিয়েছিলেন। এর মধ্যে শেষ তিনজন ধর্মমহাসভার উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council)-এর সদস্য হন। এছাড়া ১৮৯১ সালে কলকাতায় সংগঠিত মহাবোধি সোসাইটির নেতা হেবাবিতর্নে ধর্মপালও ব্যারোজের চিঠি পান ও Advisory Council-এর সদস্য হন। ভারতের অন্যান্য অংশ থেকেও আরও অনেকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন।

মহাসভায় যোগদান

বেশিরভাগ বিদেশী প্রতিনিধিই আমেরিকায় পদার্পণ করেন পূর্ব উপকূলে, নিউ ইয়র্ক বন্দরে। বেশিরভাগ ভারতীয় প্রতিনিধিও সেখানে আসেন লন্ডনে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে। ব্যারোজ-এর তরফ থেকে উইলিয়াম পাইপ (William Pipe) ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে সভায় যোগদান করতে আসা বিদেশী প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা জানাতে নিউ ইয়র্ক বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। নিউ ইয়র্ক সংবাদপত্রে বিদেশীদের আগমন-সংবাদে

যেন কিছু কোথায় ব্যক্তির নাম/যোগ্য ছিল — এইচ. ধর্মপাল, কলকাতা; প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা; বি. বি নাগরকার, বোম্বাই; বীরচাঁদ গান্ধী, বোম্বাই; জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এলাহাবাদ; অ্যানি বেসান্ত ও মিস হেনরিয়েটা মুলার, ইংল্যান্ড; রেভারেন্ড ডি. এফ. পেন্টেকোস্ট ও অধ্যাপক মিনাস চেরাজ (Minas Tcheraz) ইংল্যান্ড। নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন এইচ. ধর্মপাল ও জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী থিওসফিক্যাল সোসাইটির আলোচনায় ভারতের ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেন ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর — তার বিবরণ নিউ ইয়র্ক'র একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।...প্রতিনিধিরা সকলে সেপ্টেম্বর ৬ (১৮৯৩) তারিখে শিকাগো পৌঁছান।

ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডের রেভারেন্ড ওয়েন্ডট (Rev. Wendte) লিখিত বিবরণে খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে প্রাচ্য থেকে আগত প্রতিনিধিদেরও বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিবরণে বিবেকানন্দকে 'বোম্বে থেকে আগত' বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হলুদ পাগড়ি পরিহিত এই স্বামী সন্ন্যাসীটি অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিল দৃষ্টি-আকর্ষক (Conspicuous)। বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার সঙ্গে প্রাচ্য থেকে আগত অন্য সব প্রতিনিধিদেরও অনুরূপ সুন্দর সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ধর্মমহাসভার ১৭ দিনের কর্মসূচির খুঁটিনাটি বিবরণ ব্যারোজ-এর ১৬০০ পাতার রিপোর্টে আছে, এর মধ্যে বিবেকানন্দের বক্তৃতা অংশ মাত্র ১৫ পাতা জুড়ে।

ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ও প্রতিনিধিত্ব

ধর্ম আগ্রহী আমেরিকানেরা সাগ্রহে এই ঐতিহাসিক সভার প্রতীক্ষা করছিল, যদিও তৎকালীন সংবাদপত্র পড়লে বোঝা যায় যে, এই ধর্মমহাসভাটি মার্কিন জনজীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করে নি। মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ প্রোটেস্টান্ট চার্চ এই ধর্মমহাসভাতে অংশ নেয় নি। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশগুলি, যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা ও অন্যান্য অনেক দেশ থেকে ধর্মমহাসভায় তেমন কোনো প্রতিনিধি যান নি। ইসলামিক দেশগুলি থেকেও বিশেষ কেউ ধর্মমহাসভায় যান নি। বাকি থাকল ইউরোপের কিছু দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা; এই দেশগুলি থেকেও তখন ইংরেজি ভাষায় দক্ষ প্রতিনিধি পাওয়া দুষ্কর ছিল। কাজেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে অনেকে উৎসাহ সহকারে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তার মধ্যে আবার ভারতে ব্রিটিশ প্রভাবে ইংরেজি ভাষার চল ছিল।

১৮৯৩ সালে হিন্দুধর্মের নেতাদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাব ছিল। তাছাড়া দেশ ছেড়ে কালাপানি পার হয়ে বিদেশ গমনের প্রতি একটা বিরূপভাব হিন্দুধর্মে ছিল। এবং হিন্দুধর্মের সংরক্ষণশীলতা ও আচার তো ছিলই। এইসব কারণেই ভারত থেকে সনাতন হিন্দুদের ধর্মমহাসভাতে অংশ নেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্য ধর্মের দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারি চার্চের প্রতিনিধি না — এঁদের পক্ষে ১৮৯৩-এর সভা ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ, বিশেষত ভারত ও ব্রিটেনের ইংরেজিভাষী ধর্মনেতাদের। চীন-জাপান থেকে যদিও অনেকে গিয়েছিলেন, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তাঁরা অত দক্ষ ছিলেন না।

১৮৯৩ সালে ভারতীয় অংশগ্রহণ

প্রথমদিন অনুষ্ঠান শুরু হবার সময় মঞ্চে উপস্থিত ৫১ জনের মধ্যে ১০ জনই ভারত উপমহাদেশ থেকে ছিলেন। ব্যারোজের বই থেকে মোট ২০ জন ভারতীয় প্রতিনিধির নাম পাওয়া যায়। এই ২০ জনের মধ্যে ১৩ জন সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, বাকি ৭ জন ভারত থেকে লেখা পাঠিয়েছিলেন বা অন্যরা পড়ে দিয়েছিলেন।

সশরীরে উপস্থিত ১৩ জনের নাম হচ্ছে:

১. জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, থিওসফিস্ট, এলাহাবাদ
২. হেবাবিতর্নে ধর্মপাল, বৌদ্ধ, কলকাতা
৩. বীরচাঁদ গান্ধী, জৈন, বোম্বে
৪. রবার্ট এ. হিউম, খ্রিস্টান পাদ্রী, মাদ্রাজ
৫. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ব্রাহ্ম, কলকাতা
৬. বি. বি. নাগরকার, ব্রাহ্ম, বোম্বে
৭. লক্ষ্মীনারায়ণ, হিন্দু, লাহোর
৮. নরসিমাচার্য, হিন্দু, মাদ্রাজ
৯. মরিস ফিলিপ্স, খ্রিস্টান পাদ্রী, ব্যাঙ্গালোর
১০. জিন্দা রাম, আইনজীবী, টেম্পারেন্স সোসাইটি, মুজফ্ফরপুর
১১. সিংহ্দ্ রাম, আর্য লেখক, মুলতান, পাঞ্জাব
১২. জে. সোরাবজি, খ্রিস্টান, বোম্বে
১৩. স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু, কলকাতা

আর যে সাতজন ভারত থেকে লেখা পাঠিয়ে পরোক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন — পার্থসারথি আয়েঙ্গার, মোহন দেব, মণিলাল দ্বিবেদী, পুরুষোত্তম বালকৃষ্ণ যোশী, জামশেদজি মোদি, টি. জে. স্কট ও টমাস স্লেটার।

উপরোক্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে সিংহ্দ্ রাম ও জিন্দা রাম শ্রোতা ছিলেন, কোনো বক্তৃতা দেন নি। কাজেই ব্যারোজের বইতে কোনো রেকর্ড নেই তেমন।

ধর্মমহাসভার প্রধান বক্তৃতাগুলি কলম্বাস হল-এ অনুষ্ঠিত হতো। এখানে তিন হাজার শ্রোতার জায়গা ছিল। আর্ট ইনস্টিটিউটে আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোটো হলঘর ছিল, সেগুলিতে অনেক সময়ে একই সঙ্গে ছোটো ছোটো মিটিং হতো। এই ছোটো হলগুলিতে ১০০ থেকে ৩০০ জনের বসার জায়গা ছিল। এই ছোটো সভাগুলির সংখ্যায় মোট ১৫ ছিল এবং এগুলির বিষয় অনুযায়ী নাম ছিল। ভারতের প্রতিনিধিদের অনেকে, বিশেষত হিন্দু প্রতিনিধিরা এমনই একটা ছোটো সভায় ঠাঁই পেয়েছিলেন — তার নাম ছিল বৈজ্ঞানিক শাখা বা Scientific Section। যোগীর

কবিতার অনুবাদ, এবং আমেরার, মোহনদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণের লেখা পাঠ এই ছোটো সভায় হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো মূল সভায় এবং এই শাখাগুলিতে মোট ৬টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মূল সভার তুলনায় এই সমান্তরাল ছোটো সভার গুরুত্ব অনেক কম ছিল। শিকাগোর সংবাদপত্রগুলিতে ও ব্যারোজের রিপোর্টে এই ছোটো সভাগুলির রিপোর্ট খুব অত্যল্প।

বাকি ১৩ জনের বক্তৃতা বা লেখা পাঠ মূলসভায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেগুলি সম্বন্ধে অনেক কিছু আমরা আজ জানতে পারি। যাঁরা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের মধ্যে ক্লেটার মন্ট ও দ্বিবেদীর লেখা মূল সভায় পড়া হয়েছিল।

সভার প্রথমদিনে ব্যারোজ-এর দীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণে যে অভ্যর্থনা করা হয় তার উত্তরে যে ১৬ জন প্রাথমিক ভাষণ দেন তাদের মধ্যে ভারতের প্রতাপ মজুমদার, ধর্মপাল, জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ, সোরাবজি, নাগরকার ও বীরচাঁদ গান্ধী ছিলেন।

সেপ্টেম্বর ১২ তারিখে বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এইদিন হিন্দুধর্মের ওপর মণিলাল দ্বিবেদী-র প্রবন্ধ পাঠ করেন তাঁর বন্ধু বীরচাঁদ গান্ধী। এ ছাড়া বিশনারী মহিম বিক্রমসিংহ বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিন, সেপ্টেম্বর ১৩, ছিল এশীয় প্রতিনিধিদের দিন। ভারত থেকে জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-এর বক্তৃতা হয়েছিল। এ দিনও এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে, কলম্বাস হল-এ সবাইকে নেওয়া যায় নি। রাত্রের অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দকে মিটিং-এর প্রেসিডেন্ট রাখা হয়েছিল। তবে এইদিনের আসরটি বক্তৃতার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাপানের শিন্টো ধর্মের পাদ্রী রেভারেন্ড বিশপ শিবাতা-র বক্তৃতা।

ষষ্ঠদিনে নাগরকার কলম্বাস হল-এ ও চক্রবর্তী থিওসফিস্টদের মিটিং-এ ৭নং হল-এ বলেছিলেন। 'ট্রিবিউন' সংবাদপত্রের এ-দিনের বক্তৃতাকে 'ইন্টারেস্টিং' আখ্যা দেয়। ১৭ তারিখ 'ট্রিবিউন'-র প্রথম পাতায় সংবাদ

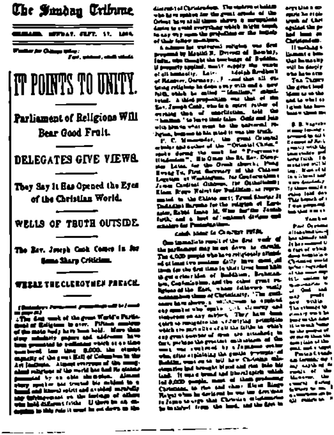
The Sunday Tribune

CHICAGO, SUNDAY, SEPT. 17, 1893.

IT POINTS TO UNITY.

Parliament of Religions Will Bear Good Fruit.

DELEGATES GIVE VIEWS.

They Say It Has Opened the Eyes of the Christian World.

WELLS OF TRUTH OUTSIDE.

The Rev. Joseph Cook Comes in for Some Sharp Criticism.

WHAT THE CLERGYMEN PREACH.

[illegible]

[illegible]

ছবি : লেখকের সৌজন্যে

দ্বিবেদী, মজুমদার – এই দু-জন ভারতীয় এবং আরো কয়েকজন বিদেশী বক্তাদের ভাষণের কথা জানা যায়; তা সত্ত্বেও ওই প্রথম পাতাতেই নাগরকার, চক্রবর্তী, মজুমদার এই তিনজন ভারতীয় প্রতিনিধির সংক্ষিপ্ত মতামত (সভা সম্পর্কে) ছাপা হয়েছিল।

সপ্তম দিন ১৭ সেপ্টেম্বর শহরের বিভিন্ন চার্চে সকলে সমবেত হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মপাল বক্তৃতা দেন Third Unitarian Church-এ, মজুমদার বক্তৃতা দেন Unity Church-এ। চার্চে কথার সুযোগ বিবেকানন্দ পান ২৪ সেপ্টেম্বর, পরের রবিবার; সেই Third Unitarian চার্চেই ভাষণ দেন তিনি, যেখানে ধর্মপাল ১৭ তারিখ বলেছিলেন। সম্ভবত ধর্মপাল তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। এদিন দুপুরের অধিবেশনে যত সময় যেতে ভিড় বাড়তে থাকে এবং সেখানে শেষ বক্তা ছিলেন নাগরকার। তিনি ছিলেন মহাসভার সেদিনকার শ্রেষ্ঠ বক্তা। পরের দিনের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল:

> অপরাহ্ণের শেষ বক্তা ছিলেন সেই সংস্কৃতিবান বিশেষ সম্মানীয় শিক্ষাবিদ রেভা. বি. বি. নাগরকার, বোম্বাইবাসী ভারতীয়। তিনি বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন করেছেন 'ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারের কর্মোদ্যোগ'। তাঁর আন্তরিক বক্তব্য এবং নিখুঁত পরিবেশনা শ্রোতৃমণ্ডলী খুবই উৎসাহের সঙ্গে উপভোগ করেন, গ্রহণ করেন, এবং বারে বারেই প্রবল করতালিতে নাগরকারের কথা ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল।

নবম দিন ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে ছ-জন ভিন্ন ভিন্ন বক্তার বক্তৃতা হয়। অপরাহ্ণের শেষ বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন তাঁর হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করে। পরের দিন 'শিকাগো ট্রিবিউন' বিবেকানন্দকে 'a Hindoo monk, a member of the oldest monastic order of the world' বলে পরিচয় দিয়ে কাগজের প্রথম পাতায় তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে লেখে:

> হিন্দুধর্মে শান্তি ও প্রেমের উপদেশের কথা বলা হয় যা গোটা মানবজাতিকে সাম্য ও ঐক্যে গ্রথিত করতে সক্ষম।…অপরাহ্ণে বক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক হিন্দু সন্ন্যাসী; তিনি তাঁর সাবলীল বাগ্মিতা ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিমা দিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করেন, ঠিক যেমন করেছিলেন ড. হাউইস তাঁর পূর্ববর্তী বক্তৃতায়। এই হিন্দু বক্তা উল্লেখ করেন যে, তিনি ও তাঁর প্রাচ্যদেশীয় অভ্যাগতরা এখানে এসে নিজেদের কথা পেশ করার জন্য চমৎকার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন।

'ট্রিবিউনে'র দ্বিতীয় পাতায় সভা-বিবরণীতে লেখা হয়েছিল:

> …এরপর ড. নোবেল স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে উপস্থিত করেন যিনি বক্তা হিসেবে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল করতালিতে অভিনন্দিত হন। এই সন্ন্যাসীটি কমলা রঙের গাউন পরে ছিলেন, কোমরে বাঁধা ছিল রক্তবর্ণ উত্তরীয় এবং মাথায় হালকা হলুদ পাগড়ি। তাঁর সৌম্যদর্শন মুখে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি ছিল এবং দু-চোখ ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে উজ্জ্বল।

এইদিন ভিড় আগের সব দিনের চেয়ে বেশি ছিল কলম্বাস হল-এ; ধর্মপাল এদিন ওয়াশিংটন হল-এ মিশনারিদের সম্মেলন ও ৭ নম্বর হল-এ প্রাচ্যের নারীর অবস্থা সম্বন্ধে বলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ৭ নম্বর হল-এ একই সভায় এবং সকালে ৩ নম্বর হল-এ সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেদিন সব হলেই অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ, নরসিংহাচার্য, মারইন হলে বিজ্ঞান শাখাতে বক্তৃতা দেন। ভারতীয়দের মধ্যে এদিন সবচেয়ে প্রশংসনীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিরোনাম ছিল 'The World's Religious Debt to Asia'। মজুমদার এই বক্তৃতার ফলে বিভিন্ন কাগজ থেকে প্রশংসা পান।

পঞ্চদশ দিনে, ২৫ সেপ্টেম্বর, জৈন প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী এগিয়ে আসেন হিন্দুধর্মের সপক্ষে বলতে। গতদিনে পেন্টেকোস্টের বক্তার সমালোচনায় গান্ধী সোচ্চার হন এবং পরদিন কাগজের প্রথম পাতায় বিরাট শিরোনামে তাঁর কথা লেখা হয়। দুটি মোটা অনুচ্ছেদ 'ট্রিবিউন' গান্ধীর বক্তব্যের ওপর ব্যয় করে এবং তারপর লেখা হয়: 'মি. গান্ধী সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল, কেননা তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তব্যের উত্তরে বিপুল উচ্ছ্বসিত করতালি শোনা যাচ্ছিল।'…এইদিন কলম্বাস হল-এ নাগরকারও ব্রাহ্ম সমাজের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ভাষণ দেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। পরের দিন ধর্মপাল সম্পর্কে 'শিকাগো ট্রিবিউন' লেখে:

> সান্ধ্যকালীন অধিবেশনটি বৌদ্ধ-ধর্মবিশ্বাসের আলোচনার জন্য নির্ধারিত ছিল।…বিশেষত এইচ. ধর্মপালের ভাষণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল যিনি খ্রিস্টের উপদেশ এবং ভারত ও প্রাচ্যের মহান ধর্মগুরুর (বুদ্ধ) বাণীর সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ধর্মপালের বক্তৃতা বিশদ আকারে পরের দিনকার দৈনিক 'ট্রিবিউন'-এ (শিকাগোর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র) ছাপা হয়। বিবেকানন্দও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিয়েছিলেন তবে তা অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রচারিত কাগজ 'শিকাগো ইন্টার ওশেন'-এ ছাপা হয়।

ভারতীয় অংশগ্রহণকারীদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও খ্যাতি:

সাধারণভাবে কোনো বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হলে বক্তাদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচারের স্বীকৃত পদ্ধতি হলো বক্তাদের বক্তব্যের সারবত্তার পর্যালোচনা করা। তারপর গুণাগুণ বা ব্যক্তির তীক্ষ্ণতাই সাধারণত এ-সব

ক্ষেত্রে কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণের স্বীকৃত মাপকাঠি। কিন্তু ধর্ম এমনই এক বিষয় যেখানে নির্মোহ, নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ উৎকর্ষ বিচার প্রায় অসম্ভব বিশেষত যেখানে আলোচ্য বিষয় একাধিক বিভিন্ন ধর্ম। ধর্ম-বিষয়ক বিতর্কে তাই শ্রোতাদের মধ্যে নিজেদের ধর্মের প্রচারকদের প্রশংসা বিশেষ আকর্ষণীয় লাগাই স্বাভাবিক। তাই যখন কোনো হিন্দুধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল (বা হিন্দু-ধর্মাবলম্বী) ব্যক্তি বলেন যে, শিকাগো ধর্ম-সভায় 'বিবেকানন্দের বক্তৃতাই ছিল শ্রেষ্ঠ', তখন এই বক্তব্য বিবেকানন্দ-র বক্তৃতার সারবস্তুর সম্পর্কে কিছুই বলে না, বলে সেই ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব পছন্দ এবং তার মনের অবস্থা সম্পর্কে।...দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো 'যত মত তত পথ'-এর প্রবক্তারা নিজেদের মতের কথা প্রচার করতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মের প্রতি ন্যূনতম উদারতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন: কেননা যদি একটি ধর্মের লোকেরা (এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুগামীরা, বিশেষত মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ) এখনো বলে বেড়ান যে তাঁদের প্রতিনিধি ঐ মহাসভায় সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে বিশ্বজয় করেছেন, তবে তাতে বরং অন্যান্য মতাদর্শের লোকদের প্রতি চরম অশ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পায়, কারণ ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের দেখাচ্ছে, সেই ধর্মমহাসভায় অন্যান্য হিন্দু ও অন্য ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ বক্তারা যথেষ্ট প্রশংসনীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন—অনেক ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দের চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসিত হয়েছিলেন তাঁরা। বর্তমান প্রবন্ধে আমি যে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর ওপর নির্ভর করতে চেয়েছি তা হলো—ব্যারোজ-এর ১৬০০ পাতার বিশাল রিপোর্ট এবং ধর্মমহাসভা চলাকালীন আমেরিকায় প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলি। এর পরবর্তীকালে নানা জায়গায় নানা রকম প্রচার হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই দাবি ও মৌলিক তথ্যগুলিই প্রামাণ্য।

প্রথমে ব্যারোজের দীর্ঘ রিপোর্টে ২০ জন ভারতীয় প্রতিনিধির মধ্যে কে কেমন গুরুত্ব পেয়েছিলেন তা দেখা যাক। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এইচ ধর্মপালকে সবচেয়ে বেশি জায়গা (২৩ পাতা) দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মণিলাল দ্বিবেদী (২০½ পাতা), তৃতীয় প্রতাপ মজুমদার (১৯ পাতা), চতুর্থ জে. জে. মোদী (১৭ পাতা), পঞ্চম স্বামী বিবেকানন্দ (১৩ পাতা), ষষ্ঠ বি.বি. নাগরকার (১২ পাতা) ও অন্যান্যরা আরও কম। চক্রবর্তী ও গান্ধীর জন্য দুজনেরই কম জায়গা ছিল ব্যারোজের রিপোর্টে, যদিও এঁরা ভালো বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। যদি ধরে নেওয়া যায়, প্রত্যেকেই মোটামুটি একই গতিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তবে প্রত্যেক বক্তার মোট প্রচার এই পাতার সংখ্যার সঙ্গে মোটামুটি সমানুপাতিক। উল্লেখযোগ্য, অন্য কারও প্রচার (বীরচাঁদের) ধর্মপালকে অতিক্রম করে নি। প্রায় প্রত্যেক বক্তাই মূল অধিবেশন ছাড়া অন্যান্য ছোটো মিটিংগুলিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যেমন [illegible], মোহন দাস, বোসী, লক্ষ্মীনারায়ণ—এঁরা মূল অধিবেশনে সুযোগ পান নি, কেবল বিজ্ঞান শাখায় দিয়েছিলেন। এঁরা সবাই অনুপস্থিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ চার বার এই বিজ্ঞান শাখায় বা ছোটো ছোটো হল-এ বক্তৃতা দেন। মজুমদার, চক্রবর্তী, ধর্মপাল, গান্ধীও অন্যান্য ছোটো মিটিং-এ বলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ছোটো মিটিংগুলির পূর্ণাঙ্গ বক্তৃতা বিশদভাবে পাওয়া যায় নি।

'ট্রিবিউন' সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিটি ভারতীয় প্রতিনিধি সম্বন্ধে বিবরণের দৈর্ঘ্য যোগফল করা যায়। এইভাবে হিসেব করলে দেখা যায় যে, ধর্মপাল সম্বন্ধে ছাপা হয়েছে মোট ৬৩০ লাইন, নাগরকার সম্বন্ধে ৪২৮ লাইন, মজুমদার সম্বন্ধে ৪১৭ লাইন, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ২০৬ লাইন, গান্ধী সম্বন্ধে ১৮১ লাইন, হিউম সম্বন্ধে ১৭১ লাইন, দ্বিবেদী সম্বন্ধে ১৬৪ লাইন, বোয়ারজী সম্বন্ধে ১১২ লাইন, চক্রবর্তী সম্বন্ধে ৮২ লাইন ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে এইচ ধর্মপাল অন্যান্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন গুরুত্বে ও খ্যাতিতে। মজুমদারের তুলনায় বিবেকানন্দ জায়গা পেয়েছিলেন অর্ধেক।

তবে কি মিশন প্রকাশিত খবরগুলি ভুল?

রামকৃষ্ণ মিশন সাহিত্যে ও নথিতে ধর্মমহাসভার যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা স্পষ্টভাবে অতিরঞ্জিত ও অসম্পূর্ণ। মিশন সাহিত্যে অনেক কিছুই সত্য আছে, যেমন স্বামীজীর প্রকাশিত বাক্যগুলি—যা ব্যারোজ থেকেই নেওয়া। মিশন সাহিত্যের দুটি ত্রুটি হলো—তারা পাঠককে মহাসভার পুরো চিত্রটি দেখাতে চায় নি, এবং তাদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের কথা বিশেষ বলে নি, নীরব থেকেছে। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বর্ষিত অভ্যর্থনা ও প্রশংসাগুলি তারা সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছে এবং দেখাতে চেয়েছে, তিনিই ছিলেন গোটা সভার আকর্ষণ ব্যক্তি, প্রধান বক্তা, তাঁকে নিয়ে সারা শহর তোলপাড় হয়েছিল। মিশনের বিভিন্ন জীবনীর মধ্যে মেরী লুইস বার্কের বইটি সবচেয়ে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ। কিন্তু তিনিও পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত নন। কাজেই মিশন পরিবেশিত খবরগুলি আংশিক সত্য।

[বাকি অংশ আগামী সংখ্যায়]

অনুগ্রহ করে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করবেন

গ্রাহকপদ নবীকরণের সময় □ যে কোনো অভিযোগের সময়

পত্রিকার মোড়কে (wrapper) গ্রাহক নম্বর লেখা থাকে প্রতি সংখ্যাতেই

নিহত চিতাবাঘ ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ

সৌমেন নাগ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পর পর দুটি 'বিরল প্রজাতির' চিতা বাঘ পুলিশের গুলিতে নিহত হলো। মানুষের ওপর গুলি চালিয়ে পুলিশ যেমন তাদের তৈরী করা বিবৃতি চালিয়ে দেয় এক্ষেত্রেও সেই একই বিবৃতি দিয়ে তারা ঘোষণা করেছে, পুলিশকে নাকি আত্মরক্ষার জন্য এই প্রাণী দুটিকে গুলি করে হত্যা করতে হয়েছে। সভ্যতার শেষ প্রহরীদের হাতে এই বিরল প্রজাতির দুটি প্রাণকে হারিয়ে ভারতের বন্য সম্পদ থেকে দুটি বিরল সম্পদ চিরদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

উক্ত ঘটনাস্থল থেকে বনবিভাগের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দপ্তরের দূরত্ব ছিল মাত্র কয়েক কিলোমিটার। ঢাকঢোল পিটিয়ে এরা বন্যপ্রাণী সপ্তাহের উৎসব করেন, অক্টোবর ২-৮ হয়। মন্ত্রী থেকে আমলা সবাই গাড়ির মাথায় (বিপদের চিহ্ন) লাল আলোর বড় চক্ষু ঘোরাবার জনগণকে সচকিত করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আলোচনাসভায় তাদের বাণীকে সংরক্ষিত করতে ছুটে যান। অথচ তাদের দপ্তর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে দু-দুটো বিরল শ্রেণীর জীব কেন লোকালয়ে এসে পড়ল, আর সে-খবর শোনার পরও কেন তাদের জীবন বাঁচাতে সেখানে সময় মতো ছুটে যাবার তাগিদ কেউ অনুভব করলেন না, এ-প্রশ্নগুলি কিন্তু অনিবার্য কারণেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

যে দুটো হতভাগ্য বন্যপ্রাণী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে তাদের স্থানীয় মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিও চিতা বলে বর্ণনা করলেও 'ভারতীয় চিতা' বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু অনেক আগেই এদেশের মাটি থেকে লোপ পেয়ে গেছে। অথচ অনেক মানুষই সেই লুপ্ত ভারতীয় চিতাকে চিতাবাঘের সাথে গুলিয়ে ফেলেন।

ভারতবর্ষে একসময় প্রচুর সংখ্যায় চিতা দেখা যেত। মোগল সম্রাট আকবরের ছিল শিকারের নেশা। জানা যায়, শিকার ধরার জন্য মোগল সম্রাটের ১০০০টি চিতা ছিল। চিতার চামড়ার প্রতি লোভ মানুষকে চিতা নিধন যজ্ঞে এমনভাবে প্ররোচিত করেছে যে, দেশ থেকেই তাকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় চিতাদের শেষতম তিনটির অবলুপ্তি ঘটেছিল ১৯৪৭-৪৮ সালের শীতকালে, বস্তারে এক শৌখিন শিকারী সেবার কৃত্রিম আলোর জালে বিভ্রান্ত করে তিনটি পুরুষ চিতাকে একই জায়গায় গুলি করে হত্যা করেছিল। এর পর আর কোনো চিতার খোঁজ পাওয়া যায় নি ভারতে।

এইভাবে কোটি বছরের অভিব্যক্তির পরিণতি-স্বরূপ একটি প্রাণী, যা ভারতের একটি বিখ্যাত বন্যপ্রাণী হয়ে অরণ্যসম্পদ রূপে বিপুল সংখ্যায় বিচরণ করতে পারত, তা মানুষের হাতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

আফ্রিকা থেকে চিতা আমদানি করেও এদেশে চিতার অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এর প্রধান কারণ দুটি: প্রথমত তৃণভূমির চিংকারা আর চিতল যা চিতার স্বাভাবিক শিকার, তা শিকারীদের লালসায় প্রায় শেষ হয়ে গেছে; সেই সঙ্গে জনসংখ্যা, চাষবাস, গৃহপালিত পশু ও চারণভূমির ক্রমবৃদ্ধির ফলে এরা আত্মসঙ্কুচিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে নি। দ্বিতীয় কারণটি হলো, চিতা আমদানি করে খাঁচায় রেখে বাচ্চা প্রসব করানোর চেষ্টাও ফলবতী হয় নি। কারণ স্বভাব বিরল ক্ষেত্র ছাড়া বন্দীদশায় চিতা বাচ্চা প্রসব করে না, ১৯৫৭ সালে ফিলাডেলফিয়া চিড়িয়াখানায় ও ১৯৬০ সালে পশ্চিম জার্মানির ক্রেফেল্ড চিড়িয়াখানায় চিতার বাচ্চা জন্মানোর মতো দুটি বিরলতম ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি যে দুটি বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢোকার অপরাধে জনগণের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অতি উৎসাহী পুলিশ বাহিনীর নিক্ষিপ্ত গুলির নিশানায় নিহত হয়েছে তারা চিতা নয়। এরা চিতা বাঘ, যাকে সাধারণভাবে বলা হয় লেপার্ড (Leopard)।

চিতাবাঘ কয়েক শ্রেণীর হয়। এদের মধ্যে যারা শুকনো ও ফাঁকা জায়গায় থাকে তাদের রঙ হালকা।

এদের ব্যক্তিত্ব তুলনামূলকভাবে ছোটো। তুষার চিতাবাঘ (Snow Leopard) দেখতে খুব ছোটো। এরা কাশ্মীর থেকে সিকিম পর্যন্ত হিমালয়ের তুষার রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করে।

গাছের ডালে বা ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে দক্ষতার এই প্রাণীটি সিংহ বা বাঘের তুলনায় লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে পারে। তার এই সহজাত প্রবণতা চিতাবাঘকে সবসময় জঙ্গল, ঘাস, ঝোপ অথবা পাহাড়ের খাঁজ খুঁজে নিতে প্ররোচিত করে। চিতাবাঘ খুব ভোরে অথবা বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শিকারের সন্ধানে বের হয়। দিনের বেলায় কোনো কিছুর আড়ালে সে দিবা নিদ্রায় কাটিয়ে দেয়।

এক একটি চিতাবাঘের একেক রকম খাদ্যরীতি। সাধারণভাবে হরিণ থেকে শুরু করে পোকা সবই চিতাবাঘের খাদ্য তালিকায় আছে। তবে কোনো কারণে চিতাবাঘ যদি একবার মানুষ মেরে তার মাংসের স্বাদ পায় তবে তার মানুষের মাংসের প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়ে দেখা দিতে পারে। বিশেষ মাংসের প্রতি চিতাবাঘের এই ভালোবাসা যে কত তীব্র হয় তার প্রমাণ, গৃহপালিত পশুশালার আশেপাশে থেকেও সেই চিতা খামারের পশু হত্যা করার চেষ্টা না করে তার পছন্দের খাবারের সন্ধানে অনেক দূরে শিকার করতে চলে যায়। কোনো কোনো সময় চিতাবাঘকে অন্য চিতাবাঘের মাংস খেতেও দেখা গেছে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত দুটো পুরুষ চিতাবাঘের যুদ্ধের পর বিজয়ী চিতাবাঘটি পরাজিত চিতাবাঘটিকে ভক্ষণ করে থাকে।

চিতাবাঘের শারীরিক ক্ষমতা ও ধূর্ত প্রাণী-বিশেষজ্ঞদেরও অবাক করে দেয়।

ভারতের বনভূমি সংকোচনের সাথে সাথে অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের মতো ভারতীয় চিতাবাঘেরাও তাদের খাদ্য ও বাসভূমি থেকে ক্রমশ উচ্ছেদ হয়ে চলেছে। ফলে বাঘেরা যেমন বনে শিকার খুঁজে না পেয়ে গোয়াল গরু-মোষের কাছাকাছি থাকার জন্য বনের গহন অঞ্চল ছেড়ে বনের ধারে বাসা বাঁধে, চিতাবাঘেরাও তেমনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামের ধারে চলে আসে।

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের ক্রমহ্রাসমান বনভূমি থেকে অনেক চিতাবাঘ বাছুর, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির খোঁজে গ্রামের ধারে চলে আসতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে এদের সুবিধাজনক জায়গা হচ্ছে চা বাগানের ঝোপ। পাহাড় থেকে চা বাগানের গাছগুলি নেমে এসেছে সমতলের অনেক দূর পর্যন্ত। এই চা ঝোপগুলি চিতাবাঘের লুকিয়ে থাকার জন্য আদর্শ জায়গা।

চিতাবাঘ মানুষকে এড়িয়ে চলে। যে শ্রমিকেরা চায়ের পাতা তোলে তারা যদি একদিকে এক লাইন ধরে এগোয় তাহলে চিতাবাঘটি কারো কোনো ক্ষতি না করে দূরে সরে গিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু চিতাবাঘটি যেখানে লুকিয়ে আছে তার দু'পাশ দিয়ে শ্রমিকেরা এসে পড়লে সে নিজেকে কোণঠাসা মনে করে নিরাপদ জায়গায় ছুটে যেতে চায়। আর তখন সামনে কোনো মানুষ এসে পড়লে সে তার দাঁত ও নখের আঘাতে তাকে কাবু করে রাস্তা করে নেয়।

কি বলা হবে চিতাবাঘকে? হিংস্র প্রাণী? কেন? মানুষের অনেক আগে তারা পৃথিবীতে এসেছে; বসবাস করে নিয়েছিল বনভূমিতে। তার অনেক পরে এসেছে মানুষ। তারা বন কেটে বসত নির্মাণ করেছে। বন্য প্রাণীরা মানুষকে তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে দিয়ে আরো গভীর জঙ্গলে চলে গেছে। মানুষ কিন্তু বন্যপ্রাণীদের এই উদারতার মূল্য দেয় নি। তারা যে বন্যপ্রাণীদের তাদের শুধু অনুগত করতে চেয়েছে তাই নয়, মানুষের খামারের, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বন্যপশুরা তাদের শরীর থেকে চামড়া কেটে নিতে দেবে, তাদের মুখের স্বাদ মেটাতে শরীর থেকে মাংস কেটে দেবে। মানুষ খুব সাজবে, মানুষের দাবি বনের পশুরা তাদের শরীর থেকে হাড় কেটে দিতে রাজি হবে। যে-সব পশু মানুষের এই দাবিকে অবজ্ঞাভরে মেনে নিয়েছে তারা মানুষের কাছে শান্ত ভদ্র প্রাণী রূপে গণ্য হয়েছে। আর যে সমস্ত বন্য প্রাণী মানুষের এই দাবিকে প্রতিহত করতে মানুষের বিরুদ্ধে তাদের দাঁত ও নখকে প্রতিরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে, তারাই হয়েছে মানুষের চোখে হিংস্র।

বাঘ সিংহ চিতা বা চিতাবাঘেরা তো মানুষের রাজ্যে প্রবেশ করে মানুষকে হত্যা করে না। একমাত্র নিজ বনভূমিতেও তারা অকারণে খাদ্য গ্রহণ করার তাগিদে মানুষকে হত্যা করে না। মানুষ তাদের রাজ্যে প্রবেশ করলেও তারা নিজেরা আক্রান্ত হবার ভয়ে শঙ্কিত না হলে কখনও আক্রমণ করে না। বরং তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। বিখ্যাত বন্য পশু প্রেমিক জিম করবেট তার শৈশবকালের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন, অনেকবার জঙ্গলে বাঘের সাথে তার দেখা হয়েছে। সেই বাঘগুলিই বরং তাকে রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য নিজেরা রাস্তা বদল করে চলে গেছে। পরিণত বয়সে মানুষখেকো বাঘ শিকার করতে গিয়ে এই অসম সাহসী চরিত্র-প্রেমিকটি জঙ্গলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম ভাঙার পর দেখেছেন তার আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপ। অর্থাৎ তিনি যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন হিংস্র প্রাণী বলে বর্ণিত এই বাঘের আগমন ঘটেছিল। সে নিদ্রিত করবেটকে স্পর্শ না করেই চলে গেছে।

দুটো চিতাবাঘ এসে পড়েছিল লোকালয়ে অর্থাৎ মানুষের রাজ্যে, নিশ্চয়ই এটি তাদের অনধিকার প্রবেশ। এই দুটো চিতাবাঘের খাবার কথা ছিল গভীর অরণ্যে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। এরা দুটিই পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। অর্থাৎ এখানকার আশেপাশে যে বনভূমির সামান্য আভাস এখনও অবশিষ্ট আছে সেখানেই এদের জন্ম হয়েছিল। এখানেই এত দিন ধরে এরা বড় হয়েছে। আশেপাশের জঙ্গলে কেউ চিতাবাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছে বলে শোনা যায় নি।

উত্তরবঙ্গ শ্রমিকেরা অনেকের কাছে যে চিতাবাঘটি এসে পড়েছিল সেটি ছিল একটি পুরুষ চিতাবাঘ। দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ ফুট। অনুমান করা হচ্ছে কাছাকাছি রামাপানির জঙ্গল থেকে এই চিতাবাঘটি পথ হারিয়ে অথবা খাদ্যের খোঁজে এখানে এসে পড়েছিল। রামাপানির জঙ্গল অবশ্য একসময় গভীর জঙ্গল ছিল। এখনও নামটি আছে। তবে মানুষের অনুপ্রবেশ ও বৃক্ষ-

জেলের ফলে এই বনভূমির ভেতরটা এখন দস্তুর রাস্তার মতো ছড় ছড় করা হয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে বন্যপ্রাণীদের কাছে জঙ্গল আর লোকালয়ের পার্থক্য বোঝার উপায় থাকছে না। তারা লোকালয়ের কাছাকাছি যেতে চাইছে না বটে, কিন্তু লোকালয় দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছে।

চিতাবাঘটি লোকালয়ে এসেই তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। সে যে এই পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণীর রাজত্বে এসে পড়েছে সে কথা বুঝতে পেরেই নিকটবর্তী এক কালভার্টের ভেতর অন্ধকার আশ্রয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। কয়েক হাজার মানুষ, যে যা পেয়েছে তাই হাতে নিয়ে কালভার্টের আশপাশে এসে জড়ো হয়। আতঙ্কের আর্তনাদে চিতাবাঘটি মানুষের সংস্রবের বাইরে অন্ধকারে কোনো আবেদন জানাতে চাইলেও মানুষের হিংস্রতার কাছে অসহায় চিতাবাঘটির স্বরূপ অজানাই চিতাবাঘের হিংস্রতার রূপ নিয়েই হাজির হয়েছিল। এর মধ্যে হাজির হলেন মাটিগাড়া থানার পুলিশ বাহিনী। এরা জনতাকে সরিয়ে দিয়ে খুব সহজেই কালভার্টের দুটো মুখবন্ধ করে দিয়ে বনবিভাগের কর্মীদের ডেকে এনে চিতাবাঘটিকে ঘুমপাড়ানী ইনজেকশন অথবা খাঁচায় ধরে নিকটবর্তী অভয়ারণ্যে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে মেডিক্যাল কলেজের সামনে চিতাবাঘটির উপস্থিতির জন্য অবশ্যই দায়ী বনবিভাগের অপদার্থতা। একদিকে ক্রমবর্ধমান জনবসতি, অপরদিকে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন। ফলে এক ফালি ছেঁড়া কাপড়ের মতো বন নামক এই অঞ্চলে এই হতভাগ্য চিতাবাঘটি কিভাবে বনবিভাগের অগোচরে ছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বনবিভাগের বন্যপ্রাণী দপ্তর যদি তার এলাকায় খোঁজ রাখতেন তবে এই চিতাবাঘের অস্তিত্বের খবরটি তাদের অজানা থাকার কথা নয়। সামান্য কয়েকটি গাছের মাঝে এই বনভূমি যে চিতাবাঘটির পক্ষে নিরাপদ নয় সে-কথাটিও বনবিভাগের অজানা থাকার কথা নয়। তাদের দায়িত্ব ছিল এই চিতাবাঘটিকে গভীর অরণ্যে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া।

ঘটনাস্থল থেকে ১২ কি. মি. দূরে সুকনায় বনবিভাগের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দপ্তর। তাদের দায়িত্ব তার এলাকার বন্যপ্রাণীর গতিবিধির উপর নজর রাখা ও তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। হতভাগ্য চিতাবাঘটি যে লোকালয়ে প্রবেশ করেছে সে-খবরটি সুকনার বনবিভাগের কাছে সকাল বেলাতেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। তাদের জানা উচিত ছিল, বন্যপ্রাণী সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ লোকালয়ে চিতাবাঘটিকে দেখে কি পরিমাণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাকে আক্রমণ করে কী বিপদ ডেকে আনতে পারে। অথচ এই ১২ কি. মি. পথ অতিক্রম করতে তারা সময় নিলেন ৫ ঘণ্টা। বনবিভাগের বন্যপ্রাণী দপ্তরের বেতনভুক কর্মীরা এর কি জবাব দেবেন। সুকনা থানায় আর সরকারি গাড়ি কেন তাদের প্রয়োজনের উপকরণ হিসাবে দেওয়া হয় নি। তারা কেন খবর পাওয়ার সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চিতাবাঘটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন না তার জবাব হওয়া দরকার।

চিতাবাঘটিকে গুলি করে মারার পরেও তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে বনবিভাগের কর্মীদের ১২ কি. মি পথ অতিক্রম করে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে, পৌঁছে তারা চিতাবাঘের মৃতদেহটাকে সংরক্ষণের জন্য মৃত চিতাবাঘটিকে নিয়ে গেছেন।

এই ঘটনাতেও যে বনবিভাগের দায়িত্ববান কর্মীদের ঘুম ভাঙে নি তার প্রমাণ, এই ঘটনা ঘটার কিছুদিন পরেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শিবমন্দিরে আরো একটি চিতাবাঘ একই থানার পুলিশকর্মীর গুলিতে হত নিহত হলো। বন জনবসতি পূর্ণ এই অঞ্চলে চিতাবাঘটি কেন এল সেই আলোচনা পরে করা যাবে। বন্যপ্রাণী সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ আতঙ্কে ও দুঃস্বপ্নে যে-কথাটি ভুলে গিয়েছিল তা হলো জনবসতি পূর্ণ অঞ্চলের বাঁশঝাড় ঝোপের যে ঘরের মধ্যে বাঘটি ঢুকে পড়েছিল সেই ঘরে ঘুমিয়ে ছিল একটি শিশু। চিতাবাঘটি কিন্তু সেই শিশুটিকে একা পেয়েও তাকে একবারের জন্যও স্পর্শ করে নি। ঐ বাড়ির এক মহিলা চিতাবাঘটিকে দেখে চিৎকার করে উঠলে চিতাবাঘটি ঘর থেকে উঠে এসে বাড়ির বাইরে যাবার সিঁড়ির নিচে আশ্রয় নেয়। চিৎকাররত মহিলাটিকেও আক্রমণ করে নি। বাড়ির চারপাশে ভিড় জমে যাওয়ায় আতঙ্কগ্রস্ত চিতাবাঘটি যখন ঐ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে লাফ দিয়ে পাশের বাড়ির খোলা জায়গায় যেতে চাইছিল, তখনই এক পুলিশকর্মী তাকে পিছন দিক থেকে গুলি করলে সে গুলি তার গায়ে লাগে। ফলে চিতাবাঘটি ক্ষিপ্ত হয়ে সেই পুলিশকর্মীটির দিকে ছুটে এসে তার প্রতি থাবা চালায়। তিনি থাবা থেকে সরে যেতে পারায় তাকে বাঁচাতে এসে আরেক পুলিশকর্মী সেই থাবায় আহত হন। পুলিশ অফিসারটি একের পর পর তিনটি গুলি চালিয়ে চিতাবাঘটিকে হত্যা করে তাকে লোকালয়ে প্রবেশের শাস্তি দেন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের কর্মীরা এক্ষেত্রে অবশ্য দাবি করেছেন তারা খবর পাবার পর চিতাবাঘটিকে ধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছবার আগেই পুলিশ তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। তারা আরো জানান, এই চিতাবাঘটি সুকনা অথবা বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে এসে নকশালবাড়ি এলাকার চা বাগানগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে তারা খবর পেয়েছিলেন। এখানে কিন্তু তাই প্রশ্ন থেকে যায় বন বিভাগ যখন নিজেরাই দাবি করছেন তারা এই চিতাবাঘটির লোকালয়ের প্রবেশের খবর জানতেন তবে এর শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা না করে তাকে আগেই ধরার ব্যবস্থা কেন করলেন না?

বন্য প্রাণী জগতের এই অমূল্য সম্পদ চিতাবাঘও ভারতীয় চিতার মতোই ক্রমশ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। ৫০ বছর আগেও সারা দেশে চিতাবাঘের সংখ্যা ছিল ৬০ থেকে ৭০ হাজার। এখন এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫ হাজারের মতো।

দেশে বাঘ ও চিতাবাঘের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে সংকুচিত হয়ে চলেছে। অথচ মানুষের সঙ্গে এদের সংঘাতের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে

চলেছে। বন্যপ্রাণীর জন্য চিহ্নিত সংরক্ষিত এলাকা, বিশেষ করে বাঘ প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে, তার আশেপাশের মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

৮০-র দশকে দুধোয়া জঙ্গলে আখের ক্ষেতে ঘাস কাটতে গিয়ে ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা এক বাঘিনীর শরীরে নিজের অজান্তেই পা দিয়ে ফেলেছিলেন এক মহিলা শ্রমিক। বাঘিনীটি সদ্য সন্তান প্রসব করে ক্লান্তিতে ঐ ঘন ঘাস ক্ষেতের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। ফলে যা হবার তাই ঘটল। সদ্য প্রসবিনী বাঘিনীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ঐ মহিলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন। সেখানে তার মৃত্যু ঘটল। বাঘিনীটি ঐ আখক্ষেতের আশেপাশেই প্রসব করেছিল। তাই হৈচৈ হওয়া সত্ত্বেও সে অন্য জায়গায় চলে যায় নি। ক'দিন পরে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে বাঘিনীটিকে মানুষ-খেকো বলে ঘোষণা করা হলো। সন্তানবতী বাঘিনীটি মানুষের হাত থেকে তার সন্তানদের বাঁচাতে গিয়ে মানুষের শিকারে রাতারাতি মানুষ-খেকোর অভিশাপকে মাথায় নিয়ে মানুষের ক্রোধের চরম সীমায় আঘাতে প্রাণ দিল।

দুধোয়া ন্যাশনাল পার্কের আশেপাশে ৮০-র দশকে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছিল ১২০ জন। ফলে দুধোয়া ন্যাশনাল পার্কের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়েছিল। তাদের অভিযোগ, সরকার বন্যপ্রাণীদের কথা ভাবছে, অথচ এই বনভূমি নির্মূল করে যারা হাজার হাজার একর জমিকে আখ ক্ষেতে রূপান্তরিত করে এখানে বসতি স্থাপন করেছেন তাদের কথা ভাবতে চাইছে না।

সমস্যা এখানেই। সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে, এর জন্য সৃষ্টি করেছে ন্যাশনাল পার্ক অর্থাৎ সংরক্ষিত বনভূমি। কিন্তু বন্যপ্রাণীদের জন্য শুধুমাত্র একখণ্ড বনভূমি যথেষ্ট নয়। তাদের বিচরণের জন্য প্রয়োজন মূল বনভূমির পাশে জঙ্গলের বেড়া। এই জঙ্গলের বেড়াই মানুষ ও বন্যপশুর মধ্যে বাফার জোন অর্থাৎ নিরাপত্তা বলয়ের কাজ করবে। বন্যপ্রাণীরা মূল জঙ্গল থেকে কোনো কারণে বেরিয়ে এলে জঙ্গলের এই বাফার জোনে সাময়িক আস্তানা গড়ে তুলতে পারবে। পরে আবার তারা মূল জঙ্গলে ফিরে যাবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এই অতি প্রয়োজনীয় নীতিটাই মানা হচ্ছে না। জঙ্গল সংলগ্ন বনভূমি উচ্ছেদ করে সেখানে চলছে চাষবাস। দুধোয়া বনভূমির পাশে রক্ষিত বনাঞ্চল পরিষ্কার করে যেমন শুরু হয়েছে আখের ক্ষেত, তেমনি উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া বা মধ্যপ্রদেশের কানহা অভয়ারণ্যের বনভূমি ক্রমশ নির্মূল হয়ে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়ে চলেছে। সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা স্বীকার করছে বটে, তবে ভোট কুড়াবার আশায় রক্ষিত বনভূমি সংলগ্ন এলাকাকে উৎপাটিত করে আখের ক্ষেত বা কৃষি কার্যকে বাধা দিতে পারছে না।

মুশকিলটা হচ্ছে এইখানেই, রাজনৈতিক দল তথা মানুষের এই ভোট কুড়ানির রাজনীতি নিয়ে বন্যপ্রাণীদের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

তাই তারা বিনা দ্বিধায় মাঝে-মধ্যেই আখ, ধান বা ভুট্টাক্ষেতে অনুপ্রবেশ করে বসে। বিশেষ করে প্রসবকালে বাঘ বা চিতাবাঘেরা পুরুষ বাঘের থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে এই মূল জঙ্গলের পাশের ঘন জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড় আর তার অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে আশ্রয় বেছে নেয়। এর সাথে আছে গৃহপালিত পশুর চারণভূমি। যে বনভূমি ছিল বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত সেখানে মানুষের অনুপ্রবেশের সাথে-সাথে গৃহপালিত পশুরও অনুপ্রবেশ ঘটে, ফলে তৃণভোজী বন্য প্রাণীদের খাদ্যের অভাব পড়ে এবং তার সাথে-সাথে ভূমিক্ষয় হয় অতি দ্রুত। এছাড়া লোকালয়ের সংস্পর্শে গৃহপালিত পশুর শরীরে রোগজীবাণুর যে সংক্রমণ ঘটে তা ঐ সব গৃহপালিত পশুর মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। গৃহপালিত পশুর দেহে কোনো রোগ সংক্রামিত হলে তা গৃহস্থের নজরে পড়ে। ফলে তার চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়। বন্যপ্রাণীর দেহে রোগ সংক্রামিত হলে তা মড়ক লাগার আগে বহু ক্ষেত্রেই জানার সুযোগ থাকে না।

১৯৭৩ সালে বাঘ প্রকল্প যখন হাতে নেওয়া হয়েছিল তখন ঐ প্রকল্পে বলা হয়েছিল, যে-সমস্ত বাঘ চিহ্নিত জায়গায় খোলামেলা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ধরে এনে এই বাঘ প্রকল্পে তাদের নতুন বাসস্থানের সন্ধান করে দেওয়া হবে। কাজটি যদিও খুব সহজ নয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সব বাঘকে কোনো এক প্রকল্পে আবদ্ধ করা নয়, উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করা। তাই এই প্রকল্পের উদ্বোধনী দিনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন 'The tiger cannot be preserved in Isolation. It is not the apex of a large and complex biotope. It habited, threatened by human intrusion, commercial forestry and cattle razing, must be made inviolate."

এই প্রকল্পে যে কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তা হলো :

১. মূল বনভূমিতে মানুষের অনুপ্রবেশকে নিষিদ্ধ করে বন্যপ্রাণীদের প্রাকৃতিক জীবনযাত্রাকে সুনিশ্চিত করা। সেই সাথে 'বাফার জোন' এলাকায় মানুষের অনুপ্রবেশ ও তার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা।

২. প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে মানুষ ইতিমধ্যে যতো ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে যতো সম্ভব তার ক্ষতিপূরণ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

৩. বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান এবং তাদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে গবেষণা করা, সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক উদ্ভিদের সাথে প্রাণীজগতের নানা সম্পর্ক ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

এর ফল কিন্তু পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৭৩-৭৪ সালে এ-দেশের ৯টি প্রকল্প নিয়ে এই কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। আজ এর সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৮টিতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫২ সালে সারা দেশে যেখানে অভয়ারণ্যের সংখ্যা ছিল ৮০টি। আজ তার সংখ্যা ক্রমে-ক্রমে দাঁড়িয়েছে ৪০০টিরও বেশি।

বনভূমির সংরক্ষণ যে কত জরুরি এই ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলিই তার জীবন্ত প্রমাণ। এর ফলে এই সব প্রকল্প ও তার সংলগ্ন এলাকাগুলির জল সংরক্ষণ তথা মাটিতে জলধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যে সমস্ত নদীতে শুধুমাত্র বর্ষাকালেই জল দেখা দিত তাদের মধ্যে অনেক নদীতেই এখন সারা বছর জল থাকছে। সেই সাথে এই সংরক্ষণের ফলে কিছু নদীতে পলি জমার পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ব্যাঘ্র প্রকল্পে যে শুধুমাত্র বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়। এর সাথে হরিণ, হাতি, গণ্ডারের মতো প্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালে ৯টি ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের সংখ্যা ছিল যেখানে ২৭০টি, ১০ বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২২১টি। এতে সমস্যা এসেছে অন্য দিক থেকে। ১৯৭২ সালে বাঘ প্রতি বিচরণ ক্ষেত্র ছিল ১০.৮১ বর্গ কি. মি.। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই আয়তন কমে হয়েছিল ২২.১ বর্গ কি. মি.। ৮৭ তে দাঁড়িয়েছে ২১.১০ বর্গ কি মি। বর্তমানে আরো কম। এর সাথে যদি এই প্রকল্পগুলির ৭০৭৩টা চিতাবাঘ ধরা হয় তবে এই আয়তন প্রায় অর্ধেকে দাঁড়াবে। (চিতাবাঘের এই সংখ্যাটি ধরা হয়েছে ১৯৮৪ সালের গণনা অনুসারে।)

ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে-সাথে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় এমন পশুর সংখ্যা (গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বাদে) ঐ সময়ে ছিল ১৭৯,৪৩৫। যার মধ্যে স্পটেড ডিয়ার (চিতল) ৬৫,২৮৩, শম্বর ৩৬,১৪৩, বুনোশুয়োর ১০,১০৯, বার্কিং ডিয়ার (মুন্ট্জ্যাক) ১০,৩১৭, সোয়াম্প ডিয়ার ১০৭, বন্যমহিষ ০৪,১১৭, নীলগাই ১১,২৬০ চৌশিঙ্গা ৪৩২০। সে সময় বাঘ ও চিতাবাঘের মোট সংখ্যা ছিল ১৮২৫টি (সুন্দরবন ও আরো তিনটি সংরক্ষিত এলাকা বাদে)। অর্থাৎ মাংসাশী প্রাণীর প্রতিটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১৪টি প্রাণী আর প্রতি তৃণভোজী প্রাণীর জন্য ছিল ০.১৪ বর্গ কি. মি. জমি।

এই সময় এই ১০টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রায় একেবারে কোলঘেঁষে অবস্থিত ১৫২টি গ্রামের গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল ৪,৫৭৭৫০। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাঘ্র প্রকল্পকে ৩০৫১৩টি গবাদি পশুর ভার বইতে হচ্ছে। এরা এই সমস্ত সংরক্ষিত বনভূমি এলাকার আশেপাশের ঘাসকে নিঃশেষ করে দিলে তৃণভোজী বন্য পশুর সংখ্যা কমতে থাকে। তখন মাংসাশী প্রাণীর খাদ্য সংগ্রহের জন্য লোকালয়ে আসা ছাড়া ওদের আর কোনো উপায় থাকে না। এছাড়া এভাবে ঘাস নিঃশেষ হলে ভূমিক্ষয়ে মাটি হয়ে দাঁড়ায় শাঁখচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কৃষি জমির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বনভূমির পাশে বসতি স্থাপনের জন্য বনভূমি অধিকার করে কৃষি জমি বৃদ্ধি করার সাথে সাথে গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এই সমস্ত তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য যে একটি চারণভূমি সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন সে কথাটি এরা কেমন ভাবতে চায় নি, তেমনি সস্তা ভোট হারানোর ভয়ে কোনো রাজনৈতিক দলই সে দাবি তুলতে সাহস পায় না। এর ফলে গবাদি পশুর দল সংরক্ষিত বনভূমির ঘাসকেই নিঃশেষ করে চলেছে। এর সাথে যোগ হয়েছে গ্রামবাসীদের জ্বালানি কাঠের চাহিদা। দলে দলে গ্রামবাসীরা জ্বালানির চাহিদা মেটাতে বাফার এলাকাকে শূন্য করে দিয়ে এখন কোর এলাকাতেও অবাধে প্রবেশ করে চলেছে। সামাজিক বনসৃজন (Social forestry) প্রকল্পের কথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হলেও আর প্রায় সবটাই কাগজে কলমে রয়ে গেছে। অথচ এই সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এটি এক শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে উপস্থিত হতে পারত।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে বনভূমির পরিমাণ ছিল মোট আয়তনের ৪০ শতাংশ। আর এই শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে বনভূমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৩ শতাংশে। এরমধ্যে মাত্র তিন শতাংশ বনভূমিকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। ফলও হয়েছে তথৈবচ। ১৯৫২ সালে ভারতের বন্যপ্রাণীর মধ্যে বিপন্ন শ্রেণীর প্রাণীর সংখ্যা যেখানে ছিল ১০টি সেই সংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে ১৪০টিতে।

উত্তরবঙ্গের বনভূমি নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে এই অঞ্চলের বন্য-প্রাণীদের নিরাপত্তা আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। জলদাপাড়ার অভয়ারণ্য থেকে বিপন্নতম প্রাণী গণ্ডার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমারেখাকে তোয়াক্কা না করে সেখানকার রাজন্য বনে ঢুকে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করছে। বনভূমি থেকে খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে আসছে বন্য হাতির দল। গ্রামবাসীর তাড়া খেয়ে মৃত্যু হচ্ছে নির্মমভাবে।

এই অঞ্চলের বনভূমির রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে আশীর্বাদে ট্রাকের পর ট্রাক পাচার হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে যোগ হচ্ছে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে বনভূমি নিধন। এতে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কী ধরনের বিপর্যয় শুরু হয়েছে সেই আলোচনায় ক্ষেত্র অনেক বৃহৎ। বন্যপ্রাণীরা আজ তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়ে মানুষের ভিড়ে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে।

প্রকৃতির দাঁড়িপাল্লাটি এমনই, তার একদিকের পাল্লা হাল্কা হওয়ার সাথে সাথেই সে আরেক দিকের পাল্লাকে হাল্কা করে তার ভারসাম্য বজায় রাখে। বন্যপ্রাণীর বিপরীত পাল্লাতে আছে মানুষ সহ প্রাকৃতিক উদ্ভিদ। তাই বন্যপ্রাণীর পাল্লা হাল্কা হয়ে পড়লে প্রকৃতি যে বিপরীত পাল্লা থেকে মানুষ ও উদ্ভিদকে ছেড়ে ফেলে দিয়ে পাল্লার ভারসাম্য নিজেই বজায় রাখবে, এই প্রাকৃতিক সত্যটি না বুঝতে পারলে নিজের দোষে মানুষ নিজেই ডেকে আনবে। তখন কয়েক নিচু বন্যপ্রাণীর সাথে মানুষকেও পাশাপাশি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে থাকতে হবে। নিহত চিতাবাঘ দুটিও হয়ত এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছিল।

• লেখক উত্তরবঙ্গ অধিবাসী

চের্নোবিলকে মনে রেখে

মৃত্যুর কারবার—নিউক্লিয় শক্তি-চুল্লি

২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ চের্নোবিলের ঘটনা ঘটে। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন অংশ ছাড়াও পোল্যান্ড প্রভৃতি কাছের দেশগুলোতেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু চের্নোবিলের ঘটনার রেশ মেলাতে না মেলাতেই ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার বলেন, ব্রিটেনের নিউক্লিয় চুল্লিগুলোতে সুরক্ষা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, চের্নোবিল ধরণের দুর্ঘটনা এখানে কখনই ঘটবে না। তাঁর মতে, ব্রিটেনের নিউক্লিয় শক্তি-শিল্প সারা বিশ্বের সেরা।

কিন্তু ব্রিটেনের উইন্ডস্কেল প্লুটোনিয়াম প্ল্যান্ট (পরবর্তীকালে এই প্ল্যান্টের নাম বদল করে রাখা হয় সেলাফিল্ড) সারা পশ্চিম দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক নিউক্লিয় প্ল্যান্ট; ঘন ঘন দুর্ঘটনা এবং সুরক্ষার-নিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থা না থাকার জন্যই এই প্ল্যান্টের পরিচিতি বেশি। এই চুল্লিতে বহু বড় মাপের দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু আবার কোনো সরকার নিজেই স্বীকার করেছে; ১৯৫৭, ১৯৭৬, ১৯৮১ এবং ১৯৮৫ সালে বেশ কিছু বড় মাপের দুর্ঘটনার কথা সরকার পরে নিজেই জানাতে বাধ্য হয়। সরকারের কর্তারাও অনেকবার এই চুল্লি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, প্রকাশ্যেই এই চুল্লির নিয়মনের পরিচালন ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার কঠোর সমালোচনা করেছে। সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বিপজ্জনক নিউক্লিয় প্ল্যান্ট হিসেবে ফ্রান্সের Cap de la Hague আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু ব্রিটেনের সেলাফিল্ড প্ল্যান্ট, অনেকের মতে, ফ্রান্সের প্ল্যান্টটির চেয়ে হাজার গুণ বেশি বিপজ্জনক। এই সেলাফিল্ড প্ল্যান্ট থেকে পরিত্যক্ত তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম কণা আইরিশ সাগরকে এই গ্রহের সবচেয়ে বেশি তেজস্ক্রিয় অঞ্চলে পর্যবসিত করেছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার চের্নোবিলের দুর্ঘটনা ঘটার আগে ১৯৫৭ সালে সেলাফিল্ড নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্রের দুর্ঘটনাই নিউক্লিয় দুর্ঘটনার সবচেয়ে বিপজ্জনক উদাহরণ ছিল; এই দুর্ঘটনায় শক্তি-চুল্লির প্লুটোনিয়াম উৎপাদন অংশের প্রথম সমস্তটি প্রায় গলে গিয়েছিল। এছাড়া বিপজ্জনক মাত্রায় আগুনও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আগুনের ফলে বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় ছাই সংলগ্ন প্রায় দু-শ বর্গ মাইল এলাকাকে দূষিত করে দেয়। দুর্ঘটনা ঘটার পর মাসের পর মাস ধরে ঐ সমস্ত অঞ্চলের দুধ ও দুগ্ধজাত সব খাবার নষ্ট করে ফেলতে হয়। সরকারি হিসেব মতে, অন্তত তেত্রিশটি ক্যান্সারে মৃত্যুর কারণ সেলাফিল্ড নিউক্লিয় চুল্লির দুর্ঘটনায় ফলে উদ্ভূত নিউক্লিয় বিকিরণ।

মার্গারেট থ্যাচারের মতোই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগান চের্নোবিল দুর্ঘটনার জন্য রাশিয়ার সমালোচনা করতে গিয়ে নিউক্লিয় শিল্পের বিপজ্জনক দিক নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি। রেগান উল্টে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, চের্নোবিল ঘটার ফলে যে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে তা যেন আমেরিকার নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়—এতে করে আমেরিকার নিউক্লিয় শক্তি-শিল্প জনগণের সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। স্বভাবতই নিউক্লিয় শক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যে দুর্ঘটনা তৈরির বিপদের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে সে-বিষয়ে সমালোচনা আরও কম গুরুত্ব পেয়েছে।

চের্নোবিল দুর্ঘটনার পরে রাশিয়ার আশেপাশের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয়: এই দেশগুলোর অনেকগুলোতেই খাবার পরিবেশ সমস্যা সংকটের রূপ নিতে চলেছে। চের্নোবিল দুর্ঘটনার পর ডেনমার্ক ও নরওয়েতে প্রবল নিউক্লিয় বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে; এর ফলে জনরোষ এখনও ন্যাটো শক্তির যে-সব নিউক্লিয় অস্ত্র, অস্ত্রবাহী জাহাজ, ও ডুবোজাহাজ ঐ সব দেশে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ ছিল তাদের বিরুদ্ধে বর্ষিত হয়। সুইডেন ও ফিনল্যান্ড এই দুর্ঘটনার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; স্বভাবতই এই দেশগুলো সঠিক সময়ে দুর্ঘটনার খবর জানান না-দেওয়ার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে পোল্যান্ড, রুমানিয়া, তৎকালীন পূর্ব জার্মানি সরকারিভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার তীব্র সমালোচনা করে নি। অবশ্য এই সব দেশগুলোর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নিউক্লিয় বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। শস্য ও দুধ-জাত খাদ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই সব দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করতে হয়। বহুদিন ঐ সব দেশের নাগরিকরা দুধ অথবা দুধ-জাত খাদ্য হাতেই পায় নি। ১১ বছরের নিচে যে-সব কিশোর-কিশোরীর বয়স ছিল, তাদের নিয়মিত এক ধরনের আয়োডিন ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা একমাত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের হাত থেকে নিস্তার পায়।

অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম জার্মান প্রকাশ্যেই রাশিয়ার তীব্র সমালোচনা করে; এই সমালোচনা সরকারি এবং নাগরিকদের উভয় তরফ থেকেই করা হয়। পশ্চিম জার্মানির একটি নাগরিক সংস্থার মতে, চের্নোবিল দুর্ঘটনা ঘটার জন্য পশ্চিম জার্মানির বেশ কিছু নাগরিক প্রায় চল্লিশটি এক-রকম সমস্যা নিউক্লিয় বিকিরণের শিকার হয়েছেন। এছাড়া কেবলমাত্র জার্মানিতেই শস্য ও অন্যান্য খাদ্য নষ্ট হয়েছে প্রায় ২০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের। এই দুর্ঘটনাকে সামনে রেখে পশ্চিম জার্মানির নিউক্লিয় বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে: জার্মানির বাভারিয়াতে, ইংল্যান্ডের সেলাফিল্ডের মতো একটি প্লুটোনিয়াম পুনর্ব্যবহারের প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্যান্য নিউক্লিয় শক্তি-চুল্লির চেয়ে এই জাতীয় তেজস্ক্রিয়-পদার্থ পুনর্ব্যবহারের চুল্লিগুলো অনেকগুণ বেশি দূষণ ছড়ায়।

চেরনোবিল দুর্ঘটনার পরে সুইডেনে সবচেয়ে সুস্থ প্রতিক্রিয়া ঘটে। ১৯৮০ সালেই সেখানে এক সর্বজনীন ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১০ সালের মধ্যে সমস্ত নিউক্লিয় চুল্লি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও এই সিদ্ধান্ত দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল খোলা মনে মেনে নিতে পারে নি।

সুইডেনের সাধারণ নাগরিকেরা, নিউক্লিয় বিকিরণের ফলে ক্যান্সারের সম্ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়ে। এছাড়াও চেরনোবিল দুর্ঘটনার জন্য সুইডেনে হাজার হাজার ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য পালিত পশুদের বিরাট বিরাট খামার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বেরী, মাশরুম ও অন্যান্য কৃষিজাত উৎপাদন ফেলে দিতে হয়। এই সব মিলিয়ে, চেরনোবিলের দুর্ঘটনা ঘটার পরে পরেই সুইডেনের ক্ষতি হয় প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। সুইডেনের ১৫,০০০ ল্যাপ যাযাবর সম্প্রদায়ের মূল জীবিকা ছিল পশুচারণ: এই দুর্ঘটনার ফলে পালিত পশুরা বিকিরণের শিকার হওয়ায় এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা নষ্ট হওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়।

চেরনোবিল দুর্ঘটনার সময় পৃথিবীর ২৬টি দেশে প্রায় ৩৮০টি বাণিজ্যিক নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্র ছিল। এর মধ্যে ১০১টি আমেরিকায়, ৫১টি রাশিয়ায়, ৪১টি ফ্রান্সে, ৩৭টি ব্রিটেনে, ৩২টি জাপানে, ২০টি পশ্চিম জার্মানিতে, ১৬টি কানাডায়, ১২টি সুইডেনে, ৮টি বেলজিয়ামে ও স্পেনে, ৬টি করে ভারতে ও তাইওয়ানে, ৫টি করে সুইজারল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়ায়, ৪টি করে বুলগেরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিনল্যান্ডে, ৩টি ইতালিতে, ২টি করে আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও হাঙ্গেরিতে, ১টি করে ব্রাজিল, পাকিস্তান, যুগোশ্লাভিয়া ও নেদারল্যান্ডে।

যদিও সুইডেনে মাত্র ১২টি নিউক্লিয় চুল্লি আছে, কিন্তু সুইডেন অষ্টম বৃহত্তম নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহারকারী। সুইডেনের সমগ্র শক্তি চাহিদার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ যোগান দেয় নিউক্লিয় শক্তি চুল্লি; সেক্ষেত্রে সুইডেনের নিউক্লিয় শক্তির ব্যবহার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যেখানে সুইডেনের শক্তি চাহিদার ৫০% আসে নিউক্লিয় শক্তি থেকে, সেখানে আমেরিকার ১৭%, রাশিয়ার ১১% এবং ব্রিটেনের ১৮% নিউক্লিয় শক্তি আসে চুল্লি থেকে। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের পরেই নিউক্লিয় চুল্লি-নির্ভর শক্তি ব্যবহারে সুইডেনের স্থান তৃতীয়।

আমেরিকার নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা বহুদিন থেকেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আমেরিকার নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে—এর ফলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। যদিও আমেরিকার এই সংগঠিত বিক্ষোভ নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে দুর্বোধ্য তৈরির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে এখনও কোনো প্রতিবাদ সংগঠিত করে নি, কিন্তু ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক নিয়ে বিক্ষোভ দানা বাঁধার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল।

যখন চেরনোবিল দুর্ঘটনা ঘটল, তখন পাশাপাশিভাবে নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদন কর্মসূচি বাতিল করতে পা দিয়েছে। কিন্তু উৎপাদনের শুরুর দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর শাসক রাজনৈতিক নেতারা থেকে আরম্ভ করে নিউক্লিয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত সরকারি বিজ্ঞানীকুল বারবার আমাদের আশ্বস্ত করে এসেছেন যে, নিউক্লিয় শক্তিকেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা, "প্রতি দশ হাজার বছরে মাত্র একটি।" কিন্তু বাস্তবে নিউক্লিয় শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনার তালিকা ক্রমবর্ধমান।

প্রথম যে দুর্ঘটনাটি ঘটে তা ঘটনাক্রমে আমেরিকার একেবারে নাকের ডগায় —কানাডার "চক রিভার"-এ। ১৯৫২ সালে একটি বাণিজ্যিক নিউক্লিয় চুল্লির প্রথম পরীক্ষামূলক উৎপাদন চলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর যে-সব বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে তার তালিকা এরকম:

আইডাহো ফল্‌স (Idaho Falls), ১৯৬১:

একটি সামরিক নিউক্লিয় চুল্লি (এস এল-১ মডেল) বিস্ফোরিত হয় এবং এর ফলে যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয় তাতে তিনজন কারিগরি কর্মী

নিউক্লিয় বর্জ্য-পদার্থ কবরস্থ করা প্রথম থেকেই একটি বিতর্কিত বিষয় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্লুটোনিয়ামের অর্ধ আয়ু হলো ৪০ লক্ষ বছর; যুগ যুগ সময় ধরে তা পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে যাবে। আজও এই জাতীয় তেজস্ক্রিয় জৌলাটির কবরস্থ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত ব্যবস্থা বাতলাতে পারে নি, কেনন আজও জানা নেই ঠিক কোথায় এদের কবরস্থ করলে তা আগামী প্রজন্মকে নিউক্লিয় বিপদের মধ্যে ফেলবে না। আমেরিকাতে যখনই নিউক্লিয় বর্জ্য-পদার্থ কবরস্থ করার কথা ওঠে, তখনই প্রতিটি স্টেটের চেষ্টা করেন যাতে তাঁর প্রদেশে নিউক্লিয় বর্জ্য-পদার্থের কবরখানা না বসানো হয়।

পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণ উরালে ১৯৫৭ সালে নিউক্লিয় কবরখানায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনা ঘটার তিন বছর পর বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ উরালের কিশটিম (Kyshtym) অঞ্চল ঘুরে এসে ঐ অঞ্চলকে মরুভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে, 'যতদূর দৃষ্টি যায় দূরে, ধু ধু শুধু জমি—শস্য জমিতে ফসলের শূন্যতা। কোনো বসতি নেই, চিমনি থেকে ধোঁয়া নেই—নেই কোনো প্রাণস্পন্দন।' বর্ণনাকারী তাঁর গাড়ি নিয়ে যাবার সময় দেখেন যে, রাস্তার চিহ্ন ধরে গাড়ির চালকদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, চালকরা যেন সর্বোচ্চ দ্রুতগতিতে পরের ৩০ কি. মি. রাস্তা একটুও না থেমে অতিক্রম করে যান।

১৯৭৬ সালে স্বেচ্ছানির্বাসিত সোভিয়েত বিজ্ঞানী মেদভেদেভ বলেন যে, এই বিকিরণের ফলে বেশ কয়েক শত লোকের এখনই মৃত্যু ঘটেছে—নম্বার সংখ্যা সহস্রও পৌঁছিয়ে যেতে পারে। সত্তর দশকের শেষে গিয়ে দেখা গেছে যে, সোভিয়েত ভূমির মানচিত্র থেকে অন্তত তিনটি মাঝারি শহর স্রেফ হারিয়ে গেছে—এইসব শহরগুলো দক্ষিণ উরালের এই দুর্ঘটনার একেবারে কেন্দ্রে কাছে ছিল।

মৃত্যুবরণ করেন। এই বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, এই বিস্ফোরণের ধাক্কায় একজন কারিগর কর্মীর দেহ শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে ছাদে গিয়ে গেঁথে যায়। এই অবস্থায় সেই তেজস্ক্রিয় কর্মীটির মৃতদেহ ৬ দিন যাবৎ ছিল—পরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তীব্রতা কিছুটা কমে এলে উদ্ধারকারী দল গিয়ে ঐ কর্মীর দেহটি ছাদ থেকে নামিয়ে আনে।

ডৌনরে, ১৯৬৮ :

একটি প্ল্যান্ট গ্রামের চুল্লি হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিউক্লিয় চুল্লির মূল অংশ গলতে শুরু করে এবং তেজস্ক্রিয় গ্যাস নির্গত হতে শুরু করে। বিস্ফোরণের মতো অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই এই বিপজ্জনক অবস্থা আয়ত্তে আনা হয়। কিন্তু নির্গত গ্যাসের ফলে কী ক্ষতি হলো তার কোনো সমীক্ষা হয় নি।

নিউইয়র্ক, ১৯৭২ :

একটি প্লুটোনিয়াম প্ল্যান্টের চুল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে ঐ বিস্ফোরণের ফলে কারও মৃত্যু ঘটে নি। কিন্তু তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম এমনভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, ঐ চুল্লির আশপাশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজও বসবাসের অযোগ্য হয়ে আছে। ঐ প্ল্যান্টটিকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

থ্রি মাইল আইল্যান্ড, ১৯৭৯ :

একজন চালকের ভুল এবং একটি কল হঠাৎ কাজ না করায় হ্যারিসবুর্গ-এর এই চুল্লিটির মূল অংশ গলতে শুরু করে। এর ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর ফলে হাজার কোটি ডলার মূল্যের চুল্লিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এইসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ সরাতে এবং এই ভয়ানক তেজস্ক্রিয় চুল্লিটি বন্ধ করতে আরও হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়।

গোরে, ওকলাহোমা, ১৯৮৬ :

কার-ম্যাকগির ইউরেনিয়াম প্ল্যান্টে এক বিস্ফোরণ দুর্ঘটনা ঘটে; এবং হু হু করে বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় গ্যাস নির্গত হতে থাকে। এর ফলে একজন কর্মী সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন এবং আরও ১০০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

উপরিউক্ত দুর্ঘটনা ছাড়াও সামরিক ব্যবহারের জন্য অসংখ্য নিউক্লিয় চুল্লিতে বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ইউরেনিয়াম খনি, নিউক্লিয় বর্জ্য পদার্থের কবর দেওয়ার যে-সব 'কবরখানা' আছে সেগুলোর দুর্ঘটনার খবর খুব একটা জনসমক্ষে আসে না। এইসব দুর্ঘটনার ফলে যে-পরিমাণ বিপজ্জনক নিউক্লিয় বর্জ্য-পদার্থ চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলোকে যদি পরিষ্কার করার কথা ভাবা হয় তো এখনই দশ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ খরচের কথা ভেবেই পরিষ্কার করার কাজ আজও হাতে নেওয়া হচ্ছে না।

চেরনোবিল বিস্ফোরণের আগেই অবশ্য আমেরিকার নিউক্লিয় চুল্লির ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়—থ্রি মাইল আইল্যান্ড দুর্ঘটনার পর (১৯৭৯) আমেরিকায় আর কোনো নতুন নিউক্লিয় চুল্লি বসে নি—এছাড়া বহু নতুন চুল্লির কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে আমেরিকার ওয়েস্টিং হাউস পাবলিক পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম প্রকাশ্যে তার পাঁচটির মধ্যে চারটি চুল্লিকে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে।

নিউক্লিয় শক্তি বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপকতা ছাড়াও, এখন আমেরিকায়, নিউক্লিয় শিল্পের মূল কারণটা অর্থনৈতিক; স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে খেয়াল নজর দিতে গেলে নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্র আর ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক হয় না। নিউক্লিয় শক্তির সবচেয়ে সুখের দিনগুলোতেও নিউক্লিয় শক্তির মূল্য ছিল অনেক বেশি—এবং আজকে প্রায় সব বেসরকারি নিউক্লিয় শক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে নিউক্লিয় শক্তি সবচেয়ে মহার্ঘ। ঠিক একই কারণে ১৯৮৮ র মধ্যভাগে ব্রিটিশ সরকার তার প্রস্তাবিত নিউক্লিয় চুল্লিটি বন্ধ করে দেয়।

ব্রিটেনের শক্তি মালিকানার বিলগ্নীকরণ কিছুতেই নিউক্লিয় শিল্পে বিনিয়োগ করানো যায় নি কেননা তারা বিশ্বাসই করে না যে, নিউক্লিয় শিল্প থেকে কোনো ব্যবসায়িক মুনাফা করা সম্ভব। তাই ব্রিটেনের সব নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্রগুলো, ভারতসহ অন্যান্য দেশের মতো চলছে করদাতাদের কষ্টার্জিত টাকায়, আর তার লোকসানের দায়িত্ব তাই দেশের নাগরিকের ওপরই চাপছে।

[David Day-র *The Eco Wars*-এর [illegible]]

সংকলক ☐ শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

পত্রিকার নিয়মাবলী

পত্রিকার প্রতি কপি ৫ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক) ৬০ টাকা। যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া চলে। গ্রাহকদের সাধারণ ডাকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্টদের VP-তে পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্সি-জমা (ফেরতযোগ্য) লাগে ৫০ টাকা। কমিশন—২৫% (১০০ কপি নিলে ৩৩½%)। ডাক খরচের অর্ধেক এজেন্টকে বহন করতে হয়।

টাকা UTSA MANUSH-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ অথবা M.O. করে পাঠাবেন। কলকাতার বাইরের অঞ্চলের চেক পাঠাবেন না। M.O. ফর্মের নিচের কুপনে নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর অবশ্যই লিখবেন।

ঠিকানা : সম্পাদক, উৎস মানুষ

বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৬৪

পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)-র বিষবাষ্প

পিভিসি হলো এক অতি পরিচিত আধুনিক প্লাস্টিক যার দ্বারা নিয়ে প্রায় গোটা বিশ্ব চিন্তিত। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে Bielefeld নামের একটি জার্মান শহরের প্রশাসনিক বিভাগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোনো সরকারি ভবনে পিভিসি (PVC) প্লাস্টিক ব্যবহার করা চলবে না। এখন প্রায় ৬০টি জার্মান শহর Bielefeld-এর পথ অনুসরণ করছে। ১৯৯০ সালে সুইডেনের সরকার সেই দেশের খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয়র কৌটো ও বোতলের ক্ষেত্রে পিভিসি উপাদান নিষিদ্ধ করে। ১৯৯১ সালে সুইজারল্যান্ড পানীয়ের প্যাকেট হিসেবে পিভিসি-কে নিষিদ্ধ করে। অস্ট্রিয়ার তিনটি আঞ্চলিক রাজধানী শহরে পিভিসি ব্যবহার নিষিদ্ধ; ৯টির মধ্যে ২টি রাজ্য তাদের সরকারি ভবনে পিভিসি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। খোদ ভিয়েনা শহরে, বিশেষ করে হাসপাতালগুলিতে পিভিসি-র বিকল্প উপকরণ প্রচলনের কাজ চলছে, এখানে মাটির তলার কোনো কাজেই পিভিসি ব্যবহৃত হয় না; অস্ট্রিয়ার সমস্ত সুপার মার্কেট থেকে ক্রমশঃ এই প্লাস্টিকটির ব্যবহার তুলে নেওয়া হচ্ছে; ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরহুস, এখানে হাসপাতাল এবং অন্যান্য সরকারি ভবনে ক্রমশঃ বন্ধ করা হচ্ছে এই বিতর্কিত প্লাস্টিকের ব্যবহার। ডেনমার্কের বৃহত্তম সুপার মার্কেট গোষ্ঠী ইরমা (Irma) পিভিসি-র ব্যবহার কমিয়ে এনেছে শতকরা ৯৯ ভাগ। নেদারল্যান্ডসেও সরকার ও শিল্প-মালিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে এই প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে। ১৯৯১ সালে সুইডেনের বৃহত্তম আসবাব-সংস্থা IKEA ঘোষণা করেছে যে, পরিবেশ দূষণ ঘটবে না, এমন প্রথা তারা তাদের তৈরি আসবাবপত্রে ব্যবহার করবে এবং এই বিষাক্ত প্লাস্টিকের (PVC) ব্যবহার ক্রমশঃ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেবে।

এইসব তথ্য জানা গেল গ্রীনপিস ও সার্ভিস সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত, পরিবেশ সংক্রান্ত এক ওয়ার্কশপে। দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার পৈলান গ্রামের খানাক্রমে এটি অনুষ্ঠিত হলো। (তথ্যসূত্র : PVC / Beverley Trorpe / GREEN-PEACE / The Netherlands)। কেন, কেন পিভিসিকে বিষাক্ত প্লাস্টিক বলা হচ্ছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। ১৯৭৭ সালে বেভারলি হিল সেল ক্লাবে একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের সময় কেউ কোথাও আগুনের শিখা দেখে নি। ইলেকট্রিক তারের পিভিসি পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে একরকম ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। ডিপার্টমেন্টে একজন মহিলা সেবা আক্রান্ত হয়। তার দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং যেখানে যেখানে এই ধোঁয়ার ছোঁয়া লাগে সেখানে সেখানে সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন-ক্ষত সৃষ্টি হয়। অনেক পরে যখন আগুনের শিখা প্রত্যক্ষ হলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ১৬১ জন মারা যায়। অধিকাংশের কোনো রকম সংস্পর্শ ছাড়াই। তাদের সেই অভিজ্ঞতার নৈকট্যজনিত পর যাঁরা বেঁচেছিল তাদের ফুসফুস হয়ে ছিল গভীর ক্ষত, আক্রান্ত হবেই।

ডাই-অক্সিন নামক বিষাক্ত পদার্থটি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় পিভিসি পোড়ালে; ১ কেজি পিভিসি পোড়ালে ৫০ মাইক্রোগ্রাম ডাই-অক্সিন উৎপন্ন হয়; ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের মতে, যা ৫০ হাজার ইঁদুরের শরীরে কার্সিনোমার উদ্ভব ঘটাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সামান্যমাত্রায় ডাই-অক্সিন প্রজনন প্রক্রিয়ায় সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে।

মেঝের টাইলস বা আধুনিক ফ্লোরিং পিভিসি-র মাধ্যমে আমাদের দেশেও হচ্ছে। পিভিসি নিজে থেকে তেমন নমনীয় (plastic) নয় বলে প্লাস্টিসাইজার যোগ করতে হয়। এই প্লাস্টিসাইজার সাধারণত জৈব যোগ হয়ে থাকে এবং এরা পিভিসি বা পলিভিনাইল ক্লোরাইডের অংশগুলো অঙ্গ নয়। ফলে পিভিসি নির্মিত মেঝে থেকে অনবরত এই যৌগটির শোষণ ঘটে, যার ফলে বাসিন্দাদের এক ধরনের রোগ দেখা দেয় – যাকে বলে 'Sick building syndrome'। সুইডেনে এমন ২৪টি কেস পাওয়া গেছে যার মধ্যে অন্তত ৮টি ক্ষেত্রে দায়ী ছিল পিভিসির ফ্লোরিং (সূত্র : *Swidish National Testing and Resarch Institute Report*, 1990, পৃ- ২৫)। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, পিভিসি তার নির্মিতি এবং বিনাশের প্রতিটি স্তরে পরিবেশ দূষণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চলাকালে হিটলারের জার্মানিতে পিভিসি প্রথম জনপ্রিয় হয়। ১৯১০ সালে এটি প্রথম তৈরি হলেও নাৎসী জার্মানি যখন ক্লোরিন শুধু রেশনে স্বাবলম্বী হতে চাইল, তখনই চাহিদা হলো পিভিসি উৎপাদনের। কারণ পিভিসি হলো ক্লোরিনের শিল্প। ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন কস্টিক সোডা। কস্টিক সোডা তৈরি হয় সাধারণ লবণ থেকে, এবং সে উৎপাদনের প্রধান ও বিপুল উপজাতটির নাম ক্লোরিন – বিষাক্ত ক্লোরিন। ইথিলিনের সঙ্গে এই ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ইথিলিন ডাই-ক্লোরাইড (EDC) তৈরি হলো। সেখান থেকে ভিনাইল ক্লোরাইড মোনোমার (VCM), এবং তারপর পলিভিনাইল ক্লোরাইড।

এই ইডিসি এবং ভিসিএম দুটিই বিষাক্ত। এরা একই সঙ্গে কার্সিনোজেন এবং বিস্ফোরক। ১৯৬৪ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ভিসিএম পরিবহনের কারণে অন্তত ১৭টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে। পিভিসি-তে স্টেবিলাইজার, প্লাস্টিসাইজার এবং ফাংগিসাইড ব্যবহৃত হয়, যথাক্রমে দায়ী,

(এরপর ১০৪ পাতায়→

সুনীলবাবুর কিসের ব্যাধি

চিত্রবিদ

একগাদা প্রেসক্রিপশন আর ইনভেস্টিগেশনের কাগজপত্র নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন সুনীলবাবু। নামের ওপর ৫ টা [illegible] চেনা। সেটা অনেক সময় হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। রোগা ব্যক্তিত্বহীন চেহারাটি দেখে তাকে প্রথমদর্শনে একজন সাধারণ গ্রাম কি মফস্বলের মানুষ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ উনি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বর্তমানে কলকাতায় আছেন বদলি হয়ে। জিজ্ঞাসা করতেই খুব নাক চিঁ-চিঁ গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আপনার কাছে আসার পরামর্শটা আমার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানই দিলেন। প্রায় তিন বছর ভুগছি। বহু কিছু করলাম, কেবল ঝাড়ফুঁক-তুকতাক করি নি একেবারে বিশ্বাস নেই বলে। আর আমরা সাধারণ মানুষ কী-ইবা করতে পারি বলুন। হয়রান হয়ে ডাক্তার আর ল্যাবরেটরির ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াতে পারি এই পর্যন্ত। টাকা-পয়সার কথাতো বাদই দিলাম—সময় নষ্ট, পরিশ্রান্তি, হয়রানি শুধু কষ্ট কমে না।'

'আপনার কষ্টটা ঠিক কী' জিজ্ঞাসা করতেই চশমার ফাঁক দিয়ে তার বড় বড় চোখ দুটোর মধ্যে একটা বেদনার আর্তি প্রকাশ পেল। মনে হলো উনি গুছিয়ে কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সঙ্গে স্ত্রীকে এনে বাইরে বসিয়ে রেখেছেন, দরকার হলে তাকে ডেকে আনবেন সেটাও জানালেন।

'বছর তিনেক হলো আমি কলকাতায় এসেছি। এর আগে মফস্বলের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে ছিলাম। চাকরিও আর বছর পাঁচেক আছে। আমার দুটি ছেলে, এর মধ্যে বড়টিকে হোস্টেলে রেখে পড়াতে হয়েছে। কেননা আমার বদলির চাকরি—বদলি করলে আমায় স্থান বদলাতে হবে এতে ছেলেটির পড়াশোনার ক্ষতি হবে। ওই ছেলেকে যাদবপুর কলকাতায় রেখেছিলাম। ছোটোটা একটু কিছু ওই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, বারবার স্কুল পার হতে ওর সাতটা ইস্কুল দেখেছে। আমি কি অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলছি?' মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, বললাম, 'না না আপনি বলুন। আপনাকে বুঝতে এইসব কিছুই জানা প্রয়োজন।' ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন।

সুনীলবাবু সৎ—একজন মানুষের পক্ষে এই দিনে এই সমাজে যতখানি সৎ হওয়া সম্ভব ততখানি, এবং এই সততার জন্য তাকে অনেক মাশুল গুণতে হয়েছে। প্রশাসন তাকে সহ্য করতে পারে নি, তাকে বদলি হতে হয়েছে এক দেড় বছরের মাথায়। অধস্তন কর্মচারীরা সমর্থন দিয়ে থাকে অপমান করেছে, অপদস্থ করেছে, ছোটো-খাটো শারীরিক অত্যাচারও করেছে। কিন্তু উনি দমে যান নি। এক হাতে লড়াই করেছেন একেবারে ঘুষের পয়সা নেবার মতো করে। এমনকী বাড়িতেও স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য, অশান্তি হয়েছে। কিন্তু উনি হার মানেন নি। কোথাও কোনো দলের ব্যাপারে সাথে আপস করেন নি। এমন কি এখনও তার কষ্টের সঙ্গেও লড়াই চলছে। ফলে প্রমোশনের দিকে তাড়াতাড়ি হবার বদলি করে দেওয়া হয়েছে। শুধু উনি হার মানেন নি। মেনে নিয়েছেন বদলি, কেননা সরকারি চাকরিতে বদলিতো আছেই। সুতরাং এসব ভেবে লাভ কী। শুধু মাঝে-মাঝে ছেলেদের জন্য চিন্তা হয়েছে—বড়োকে দূরদূরান্তে হোস্টেলে দিয়ে ওদের মানুষ করতেও অসুবিধা হয়েছে।

'আপনার রোগটা ঠিক কীভাবে শুরু হলো?'—'হাঁ এবারে আসল কথায় আসছি। পেটের গোলমালটা আমার চিরকালের, বাইরের খাওয়া দাওয়া অস্বাস্থ্য, এ একরকম আমার জীবনের সঙ্গী। এর জন্য খুব একটা ভাবিনি বলে, চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু তেমন কোনো উপকার হয় নি। তবে সম্প্রতি যে ব্যাপারটা নিয়ে এসেছি সেটা অন্য কিছু হয়েছে।'

'কলকাতায় আসার পরে কাজের চাপ খুব বেশি। বড় অফিস নানান রকমের কাজের দায়িত্ব নিতে হয়। ফলে খাবার সময় ঠিক থাকে না, বিশ্রামও সময়মতো হয় না, আর সব সময় একটা টেনশন থাকে। ঠিক টেনশনও হয়তো নয়—আশঙ্কাও বলা যায়। এই বুঝি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, এই বুঝি কোনো কাজের জন্য ওপরওয়ালাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে, তারা অসন্তুষ্ট হবে। কেউ বুঝি বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে, কেউ উঁচিয়ে সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করছে, এইসব। আগে বাড়িতেও কম ছিল, হয়তো কোনও দিন বেশি। তখন মনে কোনোদিনই কিছু ছিল না। একা-একা শ-দেড়েক মানুষের কর্মীর মোকাবিলা করতেও ভয় পেতাম না। এখনও যে পারব না তা নয়, কিন্তু যা কিছুই করতে যাই একটা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘোরে—ছেলেরা মায়ের কাছে রয়েছে, ওদেরকে আবার হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে। এইসব মনে দুর্ভাবনা কিনা জানি না, তবে প্রায় সেইরকম লেগেই থাকত। অনেক ওষুধ খেয়েছি আর নানান চিকিৎসা নিয়েছি তো আছেই। যে যা করতে বলেছে তাই করেছি কিন্তু এতসব করেও কষ্টটা কমাতে পারলাম না।'

'এরপরে একবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কিছুদিন অফিসটা একেবারে বন্ধ গেল। ভাবলাম দুদিন ভালো হয়ে গেলাম। কিছুদিন পর দেখলাম শরীরে কী হচ্ছে এর ধরনের একটা গ্যাস-অম্বল মতো বেরোচ্ছে, পায়খানায় দেখানো। তিন স্পেশালিস্টকে দেখালাম—বললেন, খারাপ কিছু নেই। কিছু ওষুধ দিলেন, টেনশন দূর করতে বললেন, টেনশন হলেই নাকি এসব থাকবে। যাইহোক সেসব অনেক বছর গেল। কিন্তু পরে একটা অন্য সমস্যায় পড়লাম হাতে একটু থাকতে দিয়েছিলাম এইবার এইসব শারীরিক অর্থাৎ অসুবিধা নিয়ে কখনও ডাক্তারের শরণ নি।

'ডিপার্টমেন্টে রিক্রুটমেন্ট হবে। বুঝতেই পারছেন আজকালকার চাকরির বাজার। এইসব আয়োজন করার জন্য একটা থার্টিন আছে- শারীরিক দক্ষতা আছে। সেইসঙ্গে আসতে শুরু করল নানান রকমের রেকমেন্ডেশন, চাপ। অথচ আমি কী রকমের মানুষ সবাই জানেন। এবার এইসব চাপের মুখে পড়ে একটু বিব্রতবোধ করতে লাগল। লোক নিতে হবে পাঁচজন কিন্তু একেবারে উঁচুমহল থেকে যে পরিমাণ নাম আসতে লাগল তাতে প্রায় সত্তর জনকে নিতে হয়। আবার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে, তাদের কষ্ট করে ডেকে পাঠিয়ে ইন্টারভিউ নেওয়া, টেস্ট নেওয়া এইসব "ফার্স" হয়ে দাঁড়ায়।

'একদিকে আমাদের অফিসারদের চাপ, ছেলেদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে পড়াশোনার সুযোগ, অন্যদিকে এইসব নিয়ে ওপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে আবার বদলির জন্য অপেক্ষা করা। চাকরির শেষ কয়েকটা বছরও একটু শান্তিতে কাটাতে পারব না। এইসব ভাবতে ভাবতে কেমন যেন হয়ে গেল। তখনই দেখলাম বুকের ধুকপুকানিটা বাড়ল। আর একটা কী রকম যেন অস্বস্তিকর ফিলিং — ফিলিংটা যে কী, তা ঠিক বোঝাতে পারব না। কখনও একটা যন্ত্রণার মতো, কখনও একটা ভয়, কখনও একটা বিষণ্ণ-ভাব, এইসব মিলিয়ে জড়িয়ে থাকল। রাতের ঘুম কমে গেল, অম্বলটা বেড়ে গেল। পেটে একটা ব্যথাও হতো আর মাঝে মাঝে বুক ধক্ ধক্ করে ওঠা। সবচেয়ে সমস্যা হলো মনের মধ্যে যে এইসব তোলপাড় হচ্ছে একথা বলার মতো কোনো মানুষ ধারেকাছে নেই। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে যদি একজন বন্ধু থাকত। আমাদের ডিপার্টমেন্টে কোনো বন্ধু নেই — একে অপরকে ঈর্ষা করে, হিংসা করে — অন্যায়ভাবে ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে চায়। ঘরেও এসব কথা স্ত্রী বা ছেলেদের বলতে পারি না। স্ত্রী এমনিতেই ভয় পায়, ছেলেরাও মায়ের ধারা পেয়েছে। বড়ছেলে তো মড়া কাটার ভয়ে চান্স পেয়েও ডাক্তারি পড়ল না। ওদেরকে আমার অফিসের এইসব কথা বলা যায় না। আর কোথাও এইসব বললে তারা ভাববে আমি ভয় পেয়েছি, আমি কাপুরুষ। এতদিন একভাবে গোঁয়ারের মতো কাজ করে এলাম শেষে আর পোশাকী ভদ্রতা দেখিয়ে কী লাভ! তাই ঠিক করলাম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে রিক্রুটমেন্ট হবে, কোনো রেকমেন্ডেশন মানা হবে না, যোগ্যতাই হবে মাপকাঠি।

'একদিন অফিসে ওরা ঘেরাও করল। ওদের আত্মীয় পরিজনদের চাকরি দিতে হবে। চিরকাল এইরকমই হয়ে আসছে। ডিপার্টমেন্টে সব সময় চাকরির ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনরা অগ্রাধিকার পেয়েছে সুতরাং এ সুযোগ ওদের দিতে হবে। অফিসে ঢুকে যথেচ্ছ ভাষায় গালিগালাজ, জোরে টেবিল চাপড়ে দেওয়া। আমি অটল অনড় — সবাইকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যা নিয়মকানুনে বেঁধে দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী রিক্রুটমেন্ট হবে। যদি এ-ব্যাপারে কোনোরকমের শিথিল করার দরকার হয় তাহলে ওপর থেকে নির্দেশ লিখিয়ে আনতে হবে, নইলে কোনো কথাই মানা হবে না। সেসব কথায় যেন আগুনে ঘি পড়ল। অফিসময় চলতেই থাকল। শেষে পুলিশ এসে আমায় উদ্ধার করল। পরবর্তী পরের দিন আমার কফিন কাঁধে নিয়ে ইউনিয়নের নেতারা আমার চোখের সামনে নাচিয়ে গেল। তবে কলকাতা ছেড়ে যেতে হলো না। কোনো কাজ নেই এমন এক জায়গায় আমার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করল। তাতে কোনো দুঃখ নেই — আমি নিশ্চিন্ত হলাম, কিন্তু আমার কষ্টগুলো কমল না। সে-সব যেন বেড়েই গেল আর কেমন যেন একটা পরাজিতের বেদনা অনুভব করলাম। এমনিতো কোনো কাজকর্ম ছিল না তাই ডাক্তারের চেম্বারে চেম্বারে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু ঠিক কী যে আমার সমস্যা আর তার সঠিক চিকিৎসাই বা কোথায় পাব একথা কেউ আমায় বললেন না। শেষে আমার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান বললেন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে। এই শুনে আমার বাড়ির লোকেরা তো ভয় পাচ্ছে, বুঝিবা আমি পাগল হয়ে গেলাম।'

'না পাগল আপনি হন নি। আপনার এই রোগকে আমরা বলি সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার অর্থাৎ মনের চাপ দেহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে আপনাদের মতো মানুষদের পাগল বলাই অনেকে সঠিক বলে মনে করেন। কেননা যারা চালু সমাজের নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে না গিয়ে, নিজের আদর্শ না খুইয়ে সারাজীবন এমন আদর্শ আঁকড়ে থেকে গেলেন, তারা পাগলই — মানে 'এনডেনজারড্ স্পিসিস'। ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, 'আপনি একেবারে বিরল প্রজাতি বানিয়ে ফেললেন!' 'আপনাদের মতো মানুষ আমরা যে দেখি না তা নয়, তবে খুব কম দেখি। সাধারণত চালাকরা অসৎ হয় আর বোকারা হয় ভালো মানুষ। আর আপনারা চালাক অথচ ভালো মানুষ, তাই আপনারা এই সমাজের পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয় কোথা থেকে আপনারা এত শক্তি পান।' ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কোথায় আর শক্তি পেলাম, লড়াই করতে গিয়েই না এত রোগ। ঠিকমতো শক্তি থাকলে কখনো এত রোগের কবলে পড়তাম না।' নাছোড়ে বললাম, 'হ্যাঁ হয় রোগ হয়। দেখুন সহ্য করারও তো একটা সীমা আছে। চারপাশের এই ঘন অন্ধকারের মাঝে টিম টিম করে প্রদীপের সলতের মতো জ্বলতে পারারও একটা শেষ আছে। তাকেও বাতাসে নিবু নিবু হতে হয়, হয়তো নিভেও যেতে হয়। তবে প্রদীপের অসম্মান হয় না। সবচেয়ে বড় কথা আপনার এই আত্মমর্যাদা-বোধের জন্য যে কঠিন সংগ্রাম আপনি করে এলেন তার জন্য কোনো স্বীকৃতি আপনি পাবেন না, উপরন্তু পাবেন অসম্মান। এটাই আপনাকে আরও চাপের মধ্যে ফেলেছে। অথচ আপনাদের মতো মানুষদের কাছে ঐ স্বীকৃতিই হচ্ছে কমপেনসেশন, নইলে আপনারা বাঁচতেই পারবেন না। একদিকে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েই আপনার রোগভোগটা বেড়েছে। আপনি সুদক্ষ একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তা, অন্যদিকে একজন নির্ভরযোগ্য স্বামী ও পিতা। সুতরাং পরিবারের আর সকলের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য দেবার দায়িত্বও আপনার। সেই যোগানোর মধ্যে পড়ে আপনাকে বেশি ভুগতে হয়েছে। আর কি, সমস্যাতো প্রায় পার করে নিয়ে এসেছেন, এখন সামান্য চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যাবেন।'

কী করব, কোথায় যাব

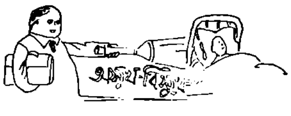

পেট ব্যথা

যে কয়েকটি রোগ চিকিৎসককে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানায় 'তীব্র পেট ব্যথা' তার মধ্যে একটি। এমন কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যিনি 'তীব্র পেট ব্যথা'র ভুল চিকিৎসার জন্য পরবর্তীকালে আফসোস করেন নি। এর কারণ হলো পেটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে অঙ্গগুলোর সমাবেশ রয়েছে, তাদের কোন্ অঙ্গের গোলমালের জন্য হঠাৎ তীব্র পেট ব্যথা শুরু হচ্ছে এটা বুঝে ফেলার মতো খুব বেশি সময় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কোনো পেট-ব্যথা রোগীর জন্য চিকিৎসককে তার সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বিবেচনা নিয়োগ করে যত দ্রুত চিকিৎসার সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিতে হয়। একদিক অন্য অনেক বড় ব্যাধিও পেট ব্যথার উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের সামনে হাজির হতে পারে। তারজন্য অনেক সময় জরুরি শল্যচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হয়। তাই পেট ব্যথার কারণ সাধারণ না হলেও এটা বোঝা চিকিৎসকের কাছে প্রায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

সাধারণ যে কারণে পেট ব্যথা হয় তাকে আমরা বলি 'ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম'। এ-ব্যথার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণ বা কারণ থাকে না। পেটের অন্ত্র এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, সামান্য অজীর্ণ পেটের গোলমাল বা মানসিক চাপের জন্য পেট ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সাধারণত এধরনের তীব্র আকার ধারণ করে না, এবং বহু রকমের চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগী ভুগতেই থাকে। ইদানীংকালে বলা হচ্ছে এইসব রোগের হয় তাদের নাকি একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের ধরন থাকে (personality pattern)।

পেট ব্যথার কারণ

ক. পেটজনিত

১. অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা পরজীবীর তীব্র আক্রমণ
২. পেরিটোনাইটিস
৩. পাকস্থলী, অন্ত্র বা অ্যাপেনডিক্স ফুটো হওয়া বা প্যাঁচ খাওয়া
৪. অন্ত্রের অবরোধ
৫. পিত্তথলির নালিকার গোলমাল
৬. বৃক্ক বা তার নালীর গোলমাল
৭. অন্ত্রের অবস্থানের পরিবর্তনজনিত আঘাত
৮. মাংসপেশীর আঘাত বা ইনফেকশন
৯. স্ত্রীরোগজনিত তলপেট ব্যথা (PID)

খ. পেট ব্যতীত অন্য কারণ

১. নিউমোনিয়া বা করোনারি ধমনীর রোগ
২. মেরুদণ্ডের বাতজনিত রোগ
৩. অণ্ডকোষ মোচড় খাওয়া

গ. বিপাকীয়জনিত

১. লেড বিষক্রিয়া
২. ইউরেমিয়া
৩. পরফাইরিয়া
৪. অ্যালার্জিজনিত
৫. ডায়াবেটিস কিটোসিস

ঘ. স্নায়বিক ও মানসিক

১. হার্পিস জস্টার
২. হিস্টিরিয়া
৩. মনোরোগজনিত

পেট ব্যথা হলে রোগীর কাছে যে ইতিহাস জানতে হবে

১. কীভাবে শুরু হলো — হঠাৎ শুরু হলো কি-না
২. জ্বর আছে কি-না
৩. থেকে থেকে হঠাৎ তীব্র হচ্ছে কি-না (কলিক)
৪. ব্যথা কী করলে বাড়ছে, কী করলে কমছে
৫. ব্যথার খাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি-না

৬. পেট ফাঁপা আছে কি না

৭. শ্বাসের কষ্ট আছে কি-না

৮ বমি বা বমির ভাব আছে কি-না

৯. মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব আছে কি-না

১০. মলত্যাগ করেছেন কিনা বা বন্ধ আছে কিনা

১১. ব্যথা এক জায়গায় থাকে, না সরে সরে যায়

আঘাত পেলে প্রাচীর মাংসে উপশিরার পেট ব্যথা হতে পারে, এর ধরণ হয় একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। এতে চাপ দিলে ব্যথা বাড়ে, পেটে ফাঁপ থাকে না, শ্বাস নিতেও কষ্ট হয় না, আঘাতের জায়গায় পেশী শক্ত হয়ে যায়।

মেরুদণ্ড থেকে যে ব্যথা ওঠে সেটা যেন হঠাৎ কিছু জিনিস দিয়ে আঘাত করার মতো, এবং তা আসে আর যায়। এতে পেট ফাঁপে না, খাবার খাওয়ার সাথে ব্যথার কোনো সম্পর্ক থাকে না, শ্বাসের কষ্ট হয় না উল্টে নড়াচড়া হলে ব্যথা বেড়ে যায়।

বুকের কারণে (ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের কারণে) যে পেট ব্যথা হয় তা সাধারণত ওপরের পেটে এবং একটু খেয়াল করলে বুকের কারণগুলি ধরা যায়।

মানসিক কারণের জন্য যে পেট ব্যথা হয় তা কোনো নিয়মের সাথেই মেলে না। অনেকসময় এইসব ব্যথার কারণ নির্ধারণ করা বেশ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং এরকম রোগীর, কোনো দ্বিধা ছাড়াই অনেকের অ্যাপেনডিক্স কেটে বাদ দেওয়া হয়। সাধারণত এইসব ব্যথার সাথে খাবারের কোনো সম্পর্ক থাকে না। রাতে এইসব ব্যথা থাকে। সাধারণত বমি বা বমির ভাব হয় না। পেটের গোলমাল দেখা যায় না বা তা থাকলেও রোগীর মনোযোগ অন্যদিকে নিয়ে গেলে ঠিক হয়ে যায়।

অনেক সময় শিশুদের পেট ব্যথার কোনো কারণই থাকে না। তবে ক্রিমি-জনিত কারণে এদের পেট ব্যথা তীব্র হতে পারে।

কিছু পেট ব্যথা আছে যাতে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার না করাতে পারলে রোগীর মৃত্যু ঘটে কিন্তু এইসব কেস খুবই কম ঘটে।

যে কোনো রোগের সঙ্গে যেমন আনুষঙ্গিকভাবে ভয় ভাবনা উদ্বিগ্নতা দুশ্চিন্তা থাকে, পেট ব্যথার ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণভাবে কী কারণের জন্য ব্যথা হচ্ছে এটা না জানতে পারায় এইসব উদ্বিগ্নতার রোগী কিছু কিছু অদ্ভুত আচরণও করে থাকে। ফলে রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাদেরই এ ব্যাপারে খুব বিভ্রান্ত হন এবং অসহায় বোধ করেন। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক-ভাবে রোগীকে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন এবং উদ্বিগ্নতা দুশ্চিন্তা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। তারপর দরকার পেট ব্যথার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রোগ নির্ণয়ে নেওয়া — যত কম সময়ে সম্ভব এবং রোগীকে কষ্ট না দিয়ে। এইসময় মুখে কোনো খাবার দেওয়া উচিত নয়। সব প্রাথমিক ব্যবস্থার পরও ব্যথা না কমলে রোগীকে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

ডা বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

পিভিসি (১৩০ পাতার পর)

নমনীয়তা আনার জন্য এবং তাপ নিবারণের জন্য। ক্যাডমিয়াম, টিন, বেরিয়াম প্রভৃতি ধাতু দায়িত্ব আনার জন্য যোগ করা হয় যার মধ্যে ক্যাডমিয়াম অত্যন্ত বিষাক্ত। নমনীয়তা আনার জন্য মূলত ব্যবহার করা হয় ডাই-২-ইথাইল হেক্সাইল থ্যালেট (DEHP), বিশেষ নষ্ট হলে যে সাবস্ট্যান্টি বর্তমানে নিষিদ্ধ — ক্ষতিকারক হওয়ার কারণে।

রাসায়নের সর্বত্র এখন পিভিসি। সংসারের সব দরজা থেকে অপরাধের সর্বত্র এর সাদর আপ্যায়ন। ক্রেডিট কার্ড থেকে নর্দমার নালী, খেলনা থেকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, দরজা জানালা থেকে পেনের রিফিল সর্বত্রই পিভিসি প্লাস্টিক। আর ঘরে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং তো আমরা ধরিই না। বলি পিভিসি ওয়্যারিং। আর এই পিভিসি মানেই ক্লোরিন। আর এই ক্লোরিন সম্পর্কে পরিবেশ সচেতন বিখ্যাত জার্মান বিশেষজ্ঞ পরিষদ (যাকে সরকারি বিজ্ঞান উপদেষ্টা বলা হয়) বলেছিলেন, 'Chemists and process engineers in industry and universities increasingly think that the dynamic growth of chlorine chemistry during 1950's and 1960's represents a decisive mistake in twentieth century industrial developement, which would not have occurred had our present knowledge of environment damage and health risks due chlorine chemistry then been available.'

এখন বলুন, আপনি কি আপনার শিশু সন্তানটিকে ক্লোরিনসমন্বিত যৌগের এমন খেলনা উপহার দেবেন যেখানে ক্যাডমিয়াম রয়েছে, DEHP নামক কিংবা আরো সব বিপজ্জনক বিষাক্ত উপাদানের সম্ভার রয়েছে। কারণ: আমাদের ছোটো ছোটো ডাক্তারদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং তাদের পেছে জার্মানি কিংবা সুইডেন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের মতো আমাদের সরকারকেও বাধ্য করবে পিভিসি উৎপাদন এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ জারি করতে।

তথ্যসূত্র: Toxic Trade Update 7·1 (1994)

পাচু রায়

আপনার দপ্তর আপনার মতামত

এই সংখ্যায় থাকছে ১২নং বিষয় 'টিভি কালচার' নিয়ে পাঠকদের মতামত। আগামী জুন '৯৫ সংখ্যায় থাকবে "…ব্ল্যাকে টিকিট" নিয়ে আলোচনা।

১১. টিভি কালচার নিয়ে:

খুব কম পড়ে থাকেন আপনি, খুব বেশি দেখেন না কী করেন? — একটা শব্দ — টিভি। আবার কোনো আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীর বাড়ি যান দেখা করতে বা আড্ডা মারতে, সেখানে বসার ঘরে সামনে আছে টিভি সেট। আর সেই পরিবারটির অবস্থা বলার নেই; [illegible] দিয়ে দিয়ে আলোচনা — সবই বন্ধ — এই টিভির দিকে তাকিয়ে। একদিকে চোখ, একদিকে মন, খুব বিশ্রী অস্থির অবস্থা। কেমন যেন হয়ে যায়, যার স্বাভাবিক একটা পরিস্থিতি নেই। …কিন্তু আপনারা কি তাহলে যাতায়াত বন্ধ করবেন? সামাজিক সম্পর্ক বা লৌকিকতা বজায় রেখে একলা ঘরে থাকবেন? নাকি এই দুর্বিষহ অবাঞ্ছিত অবস্থাকে মানিয়ে নেবেন — জোর করে খুব দামি [illegible] কাটিয়ে দেবেন অভ্যাসবশে। কোনটা করা উচিত বলুন তো!

ম তা ম ত

□ □

টিভিকে একসময় 'বোকা বাক্স' বলে অনেক হাসাহাসি হয়েছে। আজ আমরা পদে পদে বুঝতে পারছি সেটা সত্যিকারের 'বোকা বাক্স' নয়। সম্প্রতি দেশজুড়ে যে টিভি কালচার গড়ে উঠেছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা মনে করলে বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না যে, এর পেছনে সুপরিকল্পিত কোনো চাতুরি কাজ করে যাচ্ছে।

আত্মীয়বন্ধুদের বাড়িতে তো বটেই, এমনকি আমার নিজের বাড়িতেও এ-নিয়ে আমি বেশ বিব্রত। এবং আমাকে নিয়ে আমার বাড়ির লোকজনও বেশ বিরক্ত। সারাদিনের কাজ সেরে আমি যখন বাড়ি ফিরি টিভির সামনে বসে থাকা আমার আত্মীয়রা টিভির 'বিনোদন' উপভোগ করতে করতেই আমার সঙ্গে দু-একটা বাক্য বিনিময় করে যান। আমি সুযোগমতো মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হই। ব্যক্তিগত কোনো মান অভিমান না করে এই টিভি দর্শক হিসেবে আত্মীয়দের পাথরের মতো গুটিয়ে যাওয়া দেখলে আমার কষ্ট হয়। আমি বুঝতে পারি শুধু আমার আত্মীয়রা নন, সারা দেশ-জুড়ে হাজার-হাজার ভারতবাসী এই পড়ানো যাদুর পাঁকে যাচ্ছেন। না, এই অবস্থায় আমিও টিভির দর্শকের মতো প্রতিক্রিয়াহীন থাকলে অন্যান্যদের মতো অনুকরণ করতে পারি না। আমি সত্যিই এর বিরুদ্ধে সরব হই। আমার বিরোধিতা চাপা পড়ে যায় উচ্চ কলরবে বিনোদনের ব্যাপারে। শুধু আমি আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই।

আত্মীয়ের বাড়িতে গেলে টিভির সামনে সেই একই দৃশ্য। আমি হতবাক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা থেকেই আমি এর সমালোচনা করি। কোনো একদিন টিভির একটি 'খারাপ' অনুষ্ঠান আমাদের খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু একটানা এই গতানুগতিক প্রোগ্রাম দর্শকদের বিবেচনা ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, দর্শকের রুচি-বোধ-বিশ্বাসের ওপর সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব হয় না।

টিভি কালচারে অভ্যস্ত আত্মীয়-বন্ধুদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেই এই একতরফা [illegible] মধ্যে আমি আর রাজি নই। টিভির দিকে তাকিয়ে থেকে যাঁরা আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করেন, প্রয়োজনে যান্ত্রিক পুতুলের মতো হাসবার চেষ্টা করেন, আমি স্পষ্ট জানিয়ে দেব — টিভির নিয়মিত দর্শক হিসেবে ওঁদের এই বর্তমান অবস্থা। এ দৃশ্য মানিয়ে নেবার কোনো প্রশ্ন নেই। আর এদিকে এড়িয়ে যাওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। টিভির সামনে এই অবাঞ্ছিত দৃশ্যের কারণে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়দের বাড়ি যাতায়াত বন্ধ করলে আমাকে তো একা বাঁচতে হবে। আমার নিজের বাড়িতেও একই সমস্যা। সুতরাং পালিয়ে গিয়ে এর বাইরে থাকতে পারব না। থাকা সম্ভবও নয়। সবার বাড়ি যাব। টিভির সামনে বসে আমার অস্বস্তির কথা বলব। কারণ জানাব। কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করেও ভাবনার বিনিময় সম্ভব। বন্ধু-আত্মীয়রা আমার সঙ্গে একমত না হলেও খুব স্পষ্ট করে আমার কথা জানাব। ওঁদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করব না। খুব ভালো সম্পর্ক রাখবো আত্মীয়দের সামনে বিশেষ টিভি প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব। ওঁদের বোঝাব, আমরা প্রয়োজন বুঝে টিভি দেখব। এভাবেই প্রবল শক্তিশালী টিভি কালচারের সঙ্গে লড়ে যেতে হবে। মানিয়ে নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দশজনের কাছে

নাছোড় হয়ে দাঁড়িয়ে দেবে। যে-একজন বুঝবে সে তো তাদের জন্য অন্যকে বোঝাবে। উৎস মানুষ' এমন চেষ্টার অপরিহার্য। আমরা পাঠকরাও একমত, তাই না?

প্রবীণ সামন্ত

বড়িশা, কলকাতা

◻◻

আজকের দিনে টিভি মানুষের জীবনযাত্রার এক অপরিহার্য উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেডিও, সংবাদপত্রের মতো টিভিও একটা গণমাধ্যম। কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই, টিকিট-ধাক্কা নেই, দিব্যি সুইচ টিপলেই নানা অনুষ্ঠান ঘরে বসে দেখা যায়। তাই এটা ছাড়া এখনকার দিনের মানুষ বাঁচার কথা ভাবতেই পারে না।

মাঝে-মাঝে এসব নিয়ে আমি চিন্তা করি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি যেতাম কিছুটা আনন্দ পাওয়ার জন্য। পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা, গল্প গুজব করতাম। কারুর কোনো বিপদে, দিনে অথবা রাতে, ছুটে যেতাম। অথচ এখনকার জীবন এক অদ্ভুত ধাঁধায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করার কোনোরকম ফুরসৎ নেই। হাতে সময় থাকলে টিভির সামনে সবাই বসে যে-কোনো অনুষ্ঠান হাঁ করে দেখি। আর ভালো অনুষ্ঠান থাকলে তো কথাই নেই—লোকজন এলে চোখে-মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

আমার মতে কিন্তু এভাবে বাঁচা যায় না। টিভি যখন গণমাধ্যম এবং সকলেরই প্রিয়, তখন ভালো-ভালো অনুষ্ঠান দেখতে আমারও বেশ ভালো লাগে। বিশেষত খেলাধুলো—সমস্যার সব দিক বজায় রেখে যাইরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, সিনেমা দেখতে যাওয়া সবসময় তো সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেদিক থেকে টিভি আমাদের অনেকটা প্রত্যাশা পূরণ করে।

অন্যদিক থেকে দেখলে, মানুষের জীবনে শুধু টিভিই তো সব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই সামাজিকতা রক্ষায় পারিপ এবং ভদ্রতাবোধ সবারই থাকা উচিত। টিভি চলাকালীন আমার বাড়িতে কেউ এলে আমি টিভি বন্ধ করে প্রতিবেশীকে সঙ্গ দেব। আমি যতই ভালো অনুষ্ঠান দেখি না কেন, আমার কাছে সেই অভ্যাগত মানুষটির গুরুত্ব টিভির চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এখন কথাও বলা যায় না। তাও অবশ্য কাল মানুষের মনে একাকিত্ববোধ জাগাবেই।

আবার আমি যখন বন্ধুবান্ধব কারুর বাড়ি যাব, তখন টিভির সামনে বসে অনর্থক সময় নষ্ট করব না বা তাদের বিরক্তির কারণ হব না। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে ফিরে আসব। কারুর অসুবিধা সৃষ্টি করা আমার উচিত নয়। আবার কৃত্রিম হাসি মুখে টেনে সবার সঙ্গে সাজানো-বানানো কথায় সময় কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলার চেষ্টা আমি সবসময়ই করব। তবে নিজের সুবিধা, স্বার্থ ইত্যাদি দেখতে সামাজিকতা বজায় রাখা মাঝে-মাঝে অস্বস্তিজনক হয়ে ওঠে। সেদিকটা আমি সর্বদা মনে রাখার চেষ্টাই করব।

অনুরাধা মৈত্র

দমদম, কলকাতা

◻

আধুনিক 'টিভি কালচার'টি খুবই স্বল্প-বৌদ্ধিক। গ্রামীণ জনসংখ্যার অনেকাংশে আজ টিভি দেখার প্রচলন হয়েছে ঠিকই, তথাপি অবাধিত শহুরে মানুষের মতো এটি 'দৈনন্দিন' পরিণত হয় নি। বর্তমানে দূরদর্শনে পরিবেশিত অনুষ্ঠানগুলির (বিজ্ঞাপনসহ) কতিপয় বিষয়গুলি সঠিকভাবে যদি তুলে ধরা যায়, তবে আজকের লৌকিকতা, সামাজিকতা, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক এগুলি এখনও ধরে রাখা যাবে।

সন্ধ্যাগমের মুহূর্ত থেকে সন্ধ্যাবসানের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের 'চাহিদা'র ব্যক্তিত্ব বোঝানোর জন্য বিজ্ঞাপনের ডালি নিয়ে হাজির দূরদর্শন। আর এই 'চাহিদা' পূরণে ঘাটতি থাকলেই হতাশা দেখা দেয় এবং তখন হয় আত্মকেন্দ্রিকতা। বিকৃত মূল্যবোধের প্রতি পাওয়া যায় আচার-আচরণে। শিহরণ জাগানো ঘটনাগুলি ঘটে যায় কিন্তু, কিশোর-কিশোরীদের ঘিরে, যেগুলির অনুপ্রেরণা দূরদর্শন।

দূরদর্শনের ভূমিকাগুলি সম্বন্ধে মানুষকে বোঝানোর প্রয়াসটা যদি অব্যাহত না রাখা হয়, তবে চা-বিস্কুট, চানাচুর থেকে কৃত্রিম আত্মরিকতা ও টিভি দর্শন, এসবের কথোপকথনেই চলবে।

পরিবেশ পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী টিভির দর্শনীয় অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ কথোপকথনের মধ্যে রাখতে হবে। টিভি বন্ধ রেখে আড্ডার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। টিভির সম্প্রচারের ভালো অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ করতে হবে। মানুষকে বর্জন করে ভালো কিছু করা যাবে না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাতায়াত রাখতেই হবে। একেবারে হতাশ হবার কিছু নেই। অনেকেই দূরদর্শনের মন্দ দিকগুলির কথা বলতে শুরু করেছেন। যেসব পত্র-পত্রিকা দূরদর্শনের নেতিবাচক ভূমিকার বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানসম্মত লেখা বিভিন্ন সময় প্রকাশ করে থাকে, সেগুলি পাঠ করাতে হবে। সেরকম ক্ষেত্রে অন্তত পাঠের আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

বিদ্যুৎ নন্দী

(বিদ্যুৎ নন্দীনগর, ২৪ পরগনা)

◻◻

সীমান্ত উত্তাল একটি সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রায় অশোক মিত্র দু-দশক আগে ভারতবর্ষে টিভি-র অনুপ্রবেশ রোধে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: আমরা আজো-লিপির শিখরে বসে উৎসব করছি, মনোভাবনে মগ্ন হয়েছি। কোনার দিক তাঁর সেই উৎকণ্ঠা একটি বড় গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় নি। সেদিন তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে টিভির অনুপ্রবেশ একটি শ্রেণির স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে নয়। টিভি এনেছিল আধুনিক বিজ্ঞানের 'জাদুকাঠি' যে

উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য আজ সম্পূর্ণ সার্থক—হয়ে যায় টিভি-কালচার। টিভি-স্ট্যাটাস প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত, তার প্রবর্তনায় রুচির ক্ষেত্রে তাদের বাঞ্ছিত বদল ঘটে গেছে, এবং তারই নিট ফল দেশব্যাপী অনাবিল জাড্য। বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞান নয়—এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আধুনিকীকরণ বা পিছনমুখের প্রশ্নটি। বিজ্ঞান থেকেই প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ এবং এই প্রযুক্তিবিদ্যাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আসল সংকট এই জায়গাতেই। টিভিও তাই প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজজীবনের গভীরে আমরা যদি পৌঁছতে পারি, তাহলে দেখব এখনও পাহাড়প্রমাণ সমস্যা ভারতবর্ষ তথা সারা উপমহাদেশে—চিকিৎসা, শিক্ষা উপেক্ষিত। এইসব ভাবতে গেলে যে সংহত দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোযোগ প্রয়োজন তা কোথায়? আমরা যেখানে প্রতি মুহূর্তে বিনোদনের জন্যে তাজা ও অনর্থ রুচির অনুষ্ঠান দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। যেখানে আমাদের সমস্ত মূল্যবোধগুলিকেও নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে কোথায় আমাদের ভাববার সময় যে, আমরা কিছু শিখব? সময়ের, চিন্তার সময়ের আমাদের মানসিক ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে পারি। কাজ করতে পারি। টিভি এই সর্বনাশটি করেছে, এবং তারই ফলশ্রুতি আমরা 'অসামাজিক' 'অতন্দ্র' জীবে পরিণত হয়েছি। মস্তিষ্কের জায়গা দখল করে বসে সমস্ত নাড়ে। এই অবস্থায় যে কোনো সুস্থ, সচেতন ব্যক্তিই বোধহয় একটি সত্যি কথাই বলতে পারেন—মাঝে মাঝে যেমন শরীরের প্রয়োজনেও কোনো কোনো খাদ্য বাদ দিতে হয়। তেমনি আমাদেরও মানসিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনে এই টিভিকে বাদ দেওয়া উচিত। আর, না হলে বিকল্প টিভি গড়তে হয়—যে টিভি অন্য রুচি, অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা, অন্য দৃষ্টিভঙ্গি আনবে। সে কি সম্ভব আদৌ? তাই বোধহয় আমরা সবাই জনগণের নামেই সর্বকিছুকে মেনে নিচ্ছি, টিভিকেও। এটাই বোধহয় আমাদের দুঃখের ভবিতব্য। আত্মপ্রতারিত আনন্দে কিছু খেয়েতে শুরু করেছি।

মঞ্জরী ঘোষ
[illegible]

□□

না, আমি সেই প্রতিবেশী বন্ধু-প্রতিবেশীর কাছে যাতায়াত বন্ধ করব না এবং টিভির অবাঞ্ছিত অস্তিত্বকেও মানিয়ে নেব না। আমি তাকে প্রথমে অপসংস্কৃতি কি এবং কিভাবে তা সমাজে জাঁকিয়ে বসেছে ও সমাজকে প্রতিনিয়তই কলুষিত করে চলেছে—কিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। স্বাভাবিকভাবেই টিভির কথা আলোচনার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ অপসংস্কৃতি যে তার দীর্ঘ লালায়িত জিভ মানুষের সুস্থ আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে দ্রুত গ্রাস করে চলেছে তার পিছনে টিভির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তারপর পর পর দুবেলার ক্ষতিকারক দিকগুলি তার সামনে তুলে ধরব। টিভির সকাল আওয়াজ তার পরিবারের অথবা পাশের বাড়ির মানুষের—বিশেষ করে বৃদ্ধ, অসুস্থ, ছাত্র ও পড়ুয়া শিশুর অসুবিধা হতে পারে—এ ব্যাপারটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব। একবার নয় বারবার করে বোঝানোর প্রচেষ্টা চালাব।

তাছাড়া আজকের শিশুরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। আমাদের নিজেদের স্বার্থে সমাজের স্বার্থে তাদের উপযোগী সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা উচিত। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যে সমস্ত ছবি ও সিরিয়াল দেখানো হয় সেগুলোর অধিকাংশ অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ এবং বিকৃত রুচিসম্পন্ন, যা শিশুর অবচেতন মনে গভীরভাবে খারাপ ছাপ ফেলে। শুধু শিশুরা নয়, যুবক-যুবতীরাও টিভি উপভোগের মাধ্যমে অনেক অমূল্য সময় অপচয় করে থাকে যা কোনোদিনও ফিরে পাওয়া যায় না।

সুতরাং টিভি-প্রেমী আত্মহারা আমার প্রতিবেশী-বন্ধু আত্মীয়কে উপরোক্ত সমস্ত কথা বলার সচেতনতার সঙ্গে চিন্তা করতে বলব এবং টিভি চালানোর যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে এটা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করব যদি সে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করে।

দীপক ঘোষ
[illegible]

□□

'টিভি কালচার নিয়ে' কিছু লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে আমার এক প্রতিবেশী প্রয়াত আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুরের কথা। যিনি কথায় কথায় বলতেন: "কখনও নিজের মতো করে সব মানুষকে মিলিয়ে দেখো না; তাতে বিড়ম্বনা বাড়বে।—মনে রেখো, অপরের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংস্কার, অভ্যাস ও ভাবনাগুলো কখনই তোমার সাথে হুবহু মেলার কথা নয়।"

হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও তাই। প্রতিবেশী বা বন্ধুর বাড়িতে কোনো কারণে গিয়ে টিভি চলা নিয়ে যদি কোনরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়; এবং তার ফলে ওই-সব বাড়িতে যদি যাতায়াত বন্ধ করে দিই তবে তা হবে নিজের সাথে নিজেরই প্রতারণা। কারণ, মনে রাখতে হবে, রাস্তাঘাটে মাঠে-ময়দানে অফিস-আদালতে সর্বত্রই আমরা কোনো-না-কোনোভাবে আপস করে চলতে বাধ্য হচ্ছি; হাজার অন্যায়-অবিচার দেখেও সমস্ত প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে পারছি না। তার পারছি না বলেই সর্বকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে অভিমান ও হতাশায় একলা চলার নীতি গ্রহণ করতে হবে—এ কেমন কথা! এভাবে কি বাঁচা যায়?

তাই, প্রতিবেশী-বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে এ-ধরনের টিভির অত্যাচারকে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সর্বোপরি, মানিয়ে নেওয়াটা জরুরি এজন্যে যে, সামান্যতম সুযোগেও আমি যদি পর্দার দুনিয়ার বাইরে, দুজনে ভাল থেকে, মননশীলতায় সমৃদ্ধ করে সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে পারি—মানুষ হিসাবে এর চেয়ে বড় সার্থকতা।—শুধুই না বেঁচে থাকার আনন্দ!!

শক্তি শঙ্কর সামন্ত
[illegible]

(১০)

প্রথম প্রথম বেশ বিব্রত লাগত যখন দেখি আমার প্রিয় আত্মীয়টি পর হয়ে যাচ্ছে বোকা বাক্সের দৌলতে। ছোটবেলায় গরম মুখস্থ করা রচনা লিখতাম 'দূরদর্শন' বিষয়ে। শুধু করতাম বিরাট সেই 'দূরকে কাছে নিকট বন্ধু...' লাইনটা নিয়ে। এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি দূরকে নিকট বন্ধু করার পাশাপাশি দূরদর্শন 'আপন'কে পর করতেও পরোক্ষভাবে শিখেছে। অনুষ্ঠানটি যদি হয় প্রথম চ্যানেলের কোনো সামাজিক আলোচনা—অমুকের কথাবার্তা চাঁদকে যেতে কোনো অসুবিধাই হবে না আমার। কিন্তু হঠাৎ যদি আত্মীয়-পরিবারের কোনো জনপ্রিয় সংখ্যা এসে ঘটে করে নব ঘুরিয়ে চলে যায় অন্যকোন জগতে—মুশকিলটা সেইখানেই। হয়তো দারুণ হৃদয়গ্রাহক কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে—তাহলে আমার নিজেকে দোষী বলে মনে হবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন যদি বিদায়েই আত্মীয় পরিবারের কাছে নিজেকে যেন প্রতিপন্ন করতে পারব না—'ব্যাকডেটেড' আখ্যায় ভূষিত হব। গলা-খাঁকারি দিয়ে একবার হয় তো বলব—'তাহলে যাব চাঁদ'—অপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই উঠে চলে আসব। আমি সর্বান্তে—বিবাহিতে নিপত্রে থাকতে চাই। কারণ আমার একার প্রতিবাদে হয়তো আমার আত্মীয়টি নিরস্ত হবেন নিজের পরিবারকে বিকৃতির দিকে এগিয়ে দেওয়া থেকে। কিন্তু আরও হাজার-হাজার মানুষের ঘরে 'বোকা-বাক্স' নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের কুফল চট করে বোঝা যায় না। আমার নিজেরই গৃহ-শিক্ষকতা সূত্রে এমন বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য ঘটেছে—যাঁরা চাইতেন না আমি শনিবার বা রবিবার সন্ধ্যেবেলায় পড়াতে যাই। 'ফুল' দেখার সময় একটি ক্লাস টু-এর মেয়েকে প্রাণ পণে অন্য জগতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করার সময়—যখন প্রায় সফল হয়ে এসেছি—তার মা'র বিরক্তিতে মনসা পড়তে হয়েছে। সন্দেহ নেই সামাজিক ব্যাধির তালিকায় আবার একটি নতুন ধারার সংযোজন ঘটল। এই ব্যাধিকে দূর করতে গেলে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলনের যা একক প্রচেষ্টায় অসম্ভব। তাই আমি বোকা বাক্সে 'নির্বাসিত' আমার 'বোকা' আত্মীয়টির প্রতি খানিকটা করুণা বিশ্রুপ করে ফিরে আসব। তবে সম্মান বাঁচিয়ে। কারণ শত চেষ্টা করলেও পণপ্রথা যে দূর হয় নি—তা বাস্তব সত্য। ব্যাপারটা দাঁটোপ-সিম্বলে দাঁড়িয়ে গেছে। টিভি'র ক্ষেত্রেও তাই। পারতপক্ষে টিভি আক্রান্ত বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখারই চেষ্টা করব। আমার অনুরোধ তারা যাতে অনুভব করে—সেইরকম পদক্ষেপই নিতে হবে।

প্রসেনজিৎ রায়

বারুইপুর বাটুখ, কলকাতা

পরবর্তী সংখ্যার বিষয় :

১৪ কলের জলের অপচয়

গরম পড়ে গেছে দারুণ, সেইসঙ্গে নিয়মমাফিক এসে গেছে পানীয় জলের হাহাকার। গ্রামাঞ্চলের কথা ভাবতেও ভয় লাগে; শহরাঞ্চলে রাস্তার কলে কলসি-বালতি-ঘটি-বাটির কর্দম লাইন। অথচ গনগনে তপ্ত রোদ্রে রাস্তার কলে মুখ লাগায় দু'ফোঁটা জলের জন্য। আর এরই মধ্যে যখন চোখে পড়ে রাস্তার ধারের কোনো টাইম ভাঙা কল থেকে অবিরল ধারায় জল পড়ে যাচ্ছে, পথে গড়িয়ে যাচ্ছে দুর্মূল্য তৃষ্ণার জল, তখন কিরকম লাগে? আচ্ছা, এরকম নির্মম অপচয় নজরে পড়লে আপনার কি কিছুই করার নেই? জল তো জনসাধারণেরই সম্পদ, এভাবে নষ্ট হবে কেন! হলে সেই মুহূর্তে আপনি কী করবেন? দেখেও চুপ করে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া তো সহজ, কিন্তু সেটাই কি করবেন? নাকি অন্য কিছু করার আছে—কোনো প্র্যাকটিকাল, বাস্তব-সম্মত কিছু পদক্ষেপ কি নেওয়া যায়?

একার নিজস্ব মতামত, যুক্তিসঙ্গত বাস্তব-সম্মত হওয়া চাই। অনধিক ৪০০ শব্দ। ১ মাসের মধ্যে প্রাপ্ত জবাব থেকে ভালো চিঠি নির্বাচিত হবে।

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ : অবিবাহিতারা কি অসামাজিক ?

গত এপ্রিল '৯১ সংখ্যায় মিঠু দত্তের লেখাটা বারকতক পড়তে হলো। লেখার মধ্যে প্রতিবাদের ঝাঁঝ পাচ্ছি, কিন্তু প্রতিবাদের কামানের মুখ ঠিক কোনদিকে ঘোরানো তা বুঝতে অসুবিধে হলো। মহিলারা বিয়ের পর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেন এমন আশঙ্কা দিয়ে লেখা শুরু। তার পরেই অনেকটা শ্লেষোক্তির মতো শোনায় নারীর পক্ষে (পুরুষেরও) বিবাহ অপরিহার্য। দুটি কথা একসাথে জুড়ে নিয়ে বললে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম। নারীরা অপরিহার্য বিয়ের রাস্তায় এগিয়ে গিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। তাই বিবাহ না করার প্রস্তাব কি লেখিকা

দিতে চাইছেন ?

পরবর্তী অংশ পড়ে বোঝা গেল, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বহু নারী বিয়ে করতে পারেন না পাত্রপক্ষের দাবিমতো পণ দিতে না পারার কারণে। প্রেম করতে পণ লাগে না। বিয়ে করতে গেলে পণ ছাড়া চলে না। এ বিষয়ে নারী যদি অবিবাহিতা থাকতে চান সমাজ অহেতুক প্রশ্ন তুলে তাঁকে বিব্রত করে। এখানে এসেই লেখিকা প্রশ্ন তোলেন—'অবিবাহিতরা কি অসামাজিক?' লেখিকার বক্তব্য বিষয়ে বর্তমান পত্রলেখকের কিছু বলার আছে।

বিয়ের পর মেয়েরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবেই, এটা কিন্তু সত্যি নয়। কিন্তু সূত্রের মধ্যে এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে—বিয়ের আগে সমস্ত মেয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে, শুধু বিয়ের ঘটনার পরেই তা নষ্ট হয়ে যায়। লেখিকার সঙ্গে সহমত পোষণ করা গেল না। বিয়ের পর কোনো মেয়েকে 'অমুকের স্ত্রী' কিংবা 'অমুকের মা' বলে ডাকলেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাবে কেন? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য 'প্রতিষ্ঠা করার' ব্যাপার। এটি কেউ কাউকে অর্পণ করে না। বিবাহিত মহিলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব তাঁরই। সমাজ বা পুরুষতন্ত্র বাধা দিলে তার প্রতিবাদ করেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ রাখা যায়।

পণের টাকা লাগবে না বলেই যদি প্রেমকে বিয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তবে তা অত্যন্ত হেনস্থাকর। পুরুষের পণহীনতার কারণে প্রেমকে বরণীয় মনে করলে এক ধরনের সুবিধাবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ পায়। একে প্রগতিশীলতা বলা সম্ভব নয় কোনোভাবেই। আসলে প্রেম করে বিয়ে করার ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ অনেকসময় পণ নেওয়ার সুযোগ পায় না। না হলে কিন্তু প্রেম করার সঙ্গে পণ না নেওয়ার কোনো সরল সমীকরণ নেই। ব্যক্তিগতভাবে প্রেম করার শেষ পরিণতি বিয়ে—এই সরলীকরণে আমার আস্থা নেই। প্রেম একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যাতে নারী-পুরুষ পরস্পরকে বিশেষভাবে বুঝতে পারে। তাই এই প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হিসেবে বিয়ে হবে এমন পূর্বশর্তে আমি একটু বিশ্বাস করি না। তবে কোনো প্রেমিক বিয়ের ব্যাপারে যদি শুধুমাত্র পণের ব্যাপারটোকেই গুরুত্ব দেয় এবং উপযুক্ত পণ না পেলে পিছিয়ে আসে তবে তার 'প্রেম' সম্পর্কে নতুন কোনো সংজ্ঞা বানাতে হবে। তেমন 'প্রেমিক' আমার সমর্থন পাবে না।

বিবাহ করার জন্য সমাজ কাউকে কোনো আইনের ডর দেখিয়ে বাধ্য করতে পারে না। তাই বিয়ে না করার অধিকার সকলেরই থাকে। তিনি নারী হোন অথবা পুরুষ! অবিবাহিত থাকলে পুরুষদের সম্বন্ধেই বহু মানুষ কৌতূহলী হয়ে পড়েন। নারীদের ক্ষেত্রে কৌতূহলের মাত্রা আরো বাড়াবাড়ি। আসলে প্রচলিত রীতিপদ্ধতির স্রোতে যারা গা ভাসায় না তাদের তো সমাজ বক্রচোখে দেখবেই। এবং এটা খুব সোজা কথা, প্রচলিত স্রোতের প্রতিকূলে হাঁটতে গেলে বহু-বাধা প্রতিকূলতা এসব তো সহ্য করতেই হবে। বিয়ে না করে যে কেউ নিজের মতো বাঁচতে পারে। এজন্য তাকে 'অসামাজিক' মনে করার কী কারণ থাকে? তবে প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করলে যদি সমাজ কাউকে 'অসামাজিক' দেগেও দেয় সেটা নিয়ে তো অতটা নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আসল কথা হলো—এই সকল পরিস্থিতি সমাজে তার রীতি কৌশল চালিয়ে যাবার জন্য তৈরি করেছে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়ানো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলা হতো 'সন্ত্রাসবাদী'। এই নামকরণ তো শাসকদের নামকরণ। শুধু সেই 'সন্ত্রাসবাদী' সৈনিকেরা আমাদের চোখে তাঁরা হয়েছেন দেশপ্রেমিক। সুতরাং বিরুদ্ধ স্রোতে হাঁটতে গেলে কেউ যদি আমাকে 'অসামাজিক' বলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আকাঙ্ক্ষিত 'সামাজিক' হওয়া মানে যদি সমস্ত দুর্নীতি আর কুপ্রথা মেনে চলা অথবা মানিয়ে চলা বোঝায় তবে তো দুর্নীতি হচ্ছে না, অসামাজিক হচ্ছে হয়।

সমাজের কোনো রীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে নিজস্ব বিশ্বাসের ভিত্তিতে দৃঢ়তার ওপর দাঁড় করাতে হবে। নইলে বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা একটি বাগাড়ম্বরী প্রচেষ্টা। তাকে কেউ সমর্থন করবে না। কিন্তু নারীর লেখার অবিবাহিতা থাকবার স্পষ্ট কোনো কারণ না দেখিয়ে পরবর্তী কথা বলা হয়েছে। যদি কেউ বাবা হয় পণের টাকা জোগাড় না হওয়ায় বিয়ে না করতে—তবে সমাজের ঐ মহিলাকে 'অসামাজিক' বলার কোনো অধিকারই থাকে না। সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাঁরাই লড়াই করেন সমাজ তাঁদের ভালো চোখে দেখে না। যাঁরা লড়াই করেন তাঁরা এইসব অপবাদকে আমল দেন না। লড়াই মানেই বিদ্রোহ। বিদ্রোহ তো মিছিলের গান নয়—সে তো অর্জন প্রতিবাদ।

প্রদীপ মাস্কর

[illegible]

সংগঠন সংবাদ

দুর্গাপুর

'ডা. কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি', দুর্গাপুর শাখা তাদের পঞ্চম স্বাস্থ্যমেলা উদ্‌যাপন করল গত ২৩-২৬ জানুয়ারি '৯৫, তারিখে। মেলার প্রথম দিনটি বিজ্ঞানচেতনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছিল। দুর্গাপুরে লিপলস সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল ফোরাম'-এর সদস্যরা 'অলৌকিক নয় লৌকিক ম্যাজিক' অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন এবং 'উৎস মানুষ' পত্রিকার তরফ থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখা হয়। দ্বিতীয় দিনটি ছিল নারী দিবস। তৃতীয় দিন, পরিবেশ দিবসে পরিবেশ সুরক্ষায় দুর্গাপুরের দূষিত শিল্প; ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়। মেলার শেষ

দিন জনস্বাস্থ্য দিবসে জনস্বাস্থ্য সমস্যা ও নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এছাড়া প্রতিদিনই ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিতানুষ্ঠান। মেলা প্রাঙ্গণে 'কল্যাণী বিজ্ঞান বিকাশ'-র সদস্যরা এসেছিলেন গান নিয়ে, "যাদুকর" ভক্তর ছিলেন তাঁর কথা বলা পুতুল নিয়ে। ছিল 'চেতনা' (হাওয়াখান)-র গোপাল ভট্টাচার্যের ওপর প্রদর্শনী, হুগলির 'কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা'র উদ্ভব সংক্রান্ত প্রদর্শনী, দুর্গাপুরে PSCF-এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রদর্শনী, কোটাসুর কমিটির আকুপাংচার সম্পর্কিত প্রদর্শনী ইত্যাদি। মেলায় রোগী দেখার এবং স্বল্প খরচে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় ও প্রস্রাব পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। আর্থিকভাবে হলেও মেলার উদ্দেশ্য সফল হয়। তবে অনেকেই অনুভব করেছেন যে, এ ধরনের মেলা গ্রামাঞ্চলে করলেই তার উদ্দেশ্য আরো যথার্থভাবে সিদ্ধ হবে।

☐ 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি', মেদিনীপুর শাখা (মেদিনীপুর) সারাদিনব্যাপী 'বিজ্ঞান দিবস' উদ্‌যাপন করে গত ১১ মার্চ '৯৩ রবিবার। সকালে 'কুসংস্কার ও আমাদের জীবন' নিয়ে প্রশ্নোত্তরের আসর দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুপুরে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ও বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী। সন্ধ্যায় জনসভায় আলোচিত বিষয় ছিল 'ব্যবহারে বিজ্ঞান, বিশ্বাসে বিজ্ঞান'। রাতে অলৌকিক নয় লৌকিক প্রদর্শনী পরিবেশিত হয়। গোটা অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় শিক্ষক-সংগঠক মহানন্দ পাণ্ডা।

পুরুলিয়া (নদীয়া) অঞ্চলের ৩০টি ক্লাব সমন্বয়ে গঠিত 'পুরুলিয়া জনস্বার্থ সুরক্ষা কমিটি' গত দু'বছর ধরে পুরুলিয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উন্নয়নের দাবিতে লাগাতার কর্মসূচি চালিয়ে আসছেন। ২৭টি গ্রামের প্রায় ১ লক্ষ মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা পুরুলিয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রত্যেক বছরই ভোটের মুখে রাজনৈতিক দলের নেতারা স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন, অথচ নির্বাচনের পরে তবেই! গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো ওষুধ এমনকি তুলোটুকুও পাওয়া যেত না। সুরক্ষা কমিটির দীর্ঘদিনের দাবির ফলে ইদানিং জীবনদায়ী কিছু ওষুধসহ সামান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৬ মার্চ '৯৪ কমিটির ১ম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে জানা গেল কমিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সম্মেলনে উপস্থিত বহু সদস্য তাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন এবং আগামীদিনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সম্মেলনে ২৫০ জনের মতো প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনের সম্মেলনে যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়: এক, সর্বক্ষণ ডাক্তারের সরবরাহ, দুই, প্রসূতি বিভাগসহ সব বিভাগ আধুনিকীকরণ, তিন, সাপে কামড়ানো, কুকুরে কামড়ানোসহ জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ সহ অন্যান্য ব্যবস্থা। সম্মেলনের শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গত ৩০ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল '৯৩ পর্যন্ত 'বিজ্ঞান বীক্ষা'-র তৃতীয় বর্ষের বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হলো। উক্ত মেলায় মডেল, ভেজাল, কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী ছাড়াও ছিল ব্লাইন্ড শো ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পোস্টার প্রদর্শনী। 'ম্যালেরিয়ার' ওপর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং 'ম্যালেরিয়া বাহক' পরীক্ষার ব্যবস্থা, অবশ্যই স্বল্প খরচায়। এছাড়া যৌনকর্মীদের গড়া 'মহিলা সংঘ'র উপস্থিতি এবং তাদের আবেদনকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই মেলাকে কেন্দ্র করে গত ৫ মার্চ, '৯৩ বিকেল তিনটের ১২ বছর পর্যন্ত শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সকল প্রতিযোগীকেই পুরস্কৃত করা হয়।

যোগাযোগের সেতু ● মতামতের মঞ্চ চাপা খবর ছাপার কাগজ

বিসংবাদ

যে সংখ্যায় আকর্ষণ:
তেল ল্যাম্প খুন করেছে মালিকের দুই বোন। ● গোলবার গ্যাস দুর্গন্ধ ● CPM-এর পার্টি কর্মসূচী সংশোধনের কি হল? ● ভূতনীবন্দে নারীধাম ● কলকাতা কর্পোরেশনের অ্যাম্বুলেন্স গুলি কোথায় গেল? ● বিশ্বে উদ্বাস্তু সমস্যা

এপ্রিল সংখ্যার চিন: কিশোর নিবন্ধ—বকসর গুহ নিয়োগীর খনিজশ্রম আন্দোলনকে বিপথগামী করছে কারা? ● টি. এন. শেষন—কোন গণতন্ত্রের প্রহরী ● একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. এফ. আই পরাজয়। ● গার্ডেনরীচে মাধ্যমিক স্কুলের দাবিতে আন্দোলন ● বহুজাতিকের বিবেকনাশ বিমলদেশী ঐশ্বর্য ● রামকৃষ্ণ মিশনের বিতাড়িত ● মানুষের স্তূপে কুটোন ● কাদের জন্য কোম্পানিটি

পত্রিকার নিয়মাবলী: পত্রিকার প্রতি কপি ৩ টাকা। ৬টি সংখ্যার সহযোগী সদস্য চাঁদা ২০ টাকা (৩×৬+২ টাকা অনুদান)। সদস্যদের সাধারণ ডাকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্টদের V. P.-তে পত্রিকা পাঠানো হয়। এজেন্সি জমা (ফেরতযোগ্য) নগদে ২০ টাকা। কমিশন—২৫% (১০০ কপি নিলে ৩৩⅓%)। তবে অগ্রিম অর্থের এজেন্টকে বহন করতে হয়। টাকা M. O. করে পাঠান। M. O. ফর্মের নিচের কুপনে নাম ঠিকানা অবশ্যই লিখবেন। যদি কার্যালয়ের ঠিকানা: বাসুদেব ঘটক: ৩/২৪ মহেন্দ্র রোড কলোনি, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৩৩।

পত্রিকাটি: জেরোক্স কেনের দিলীপ মজুমদার। মুক্তধারা হাওড়া, শিয়ালদা ও হাওড়া প্ল্যাটফর্মের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।